বাংলার বহুরূপী





বলাকা
৮সি ট্যামার লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৯

BANGLAR BAHURUPI

প্রকাশনা
শ্রীঅণীক পাল
এ. ডি. ৩৭১ রবীন্দ্রপল্লী, কৃষ্ণপুর
কলকাতা—৭০০ ১০১

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০০০

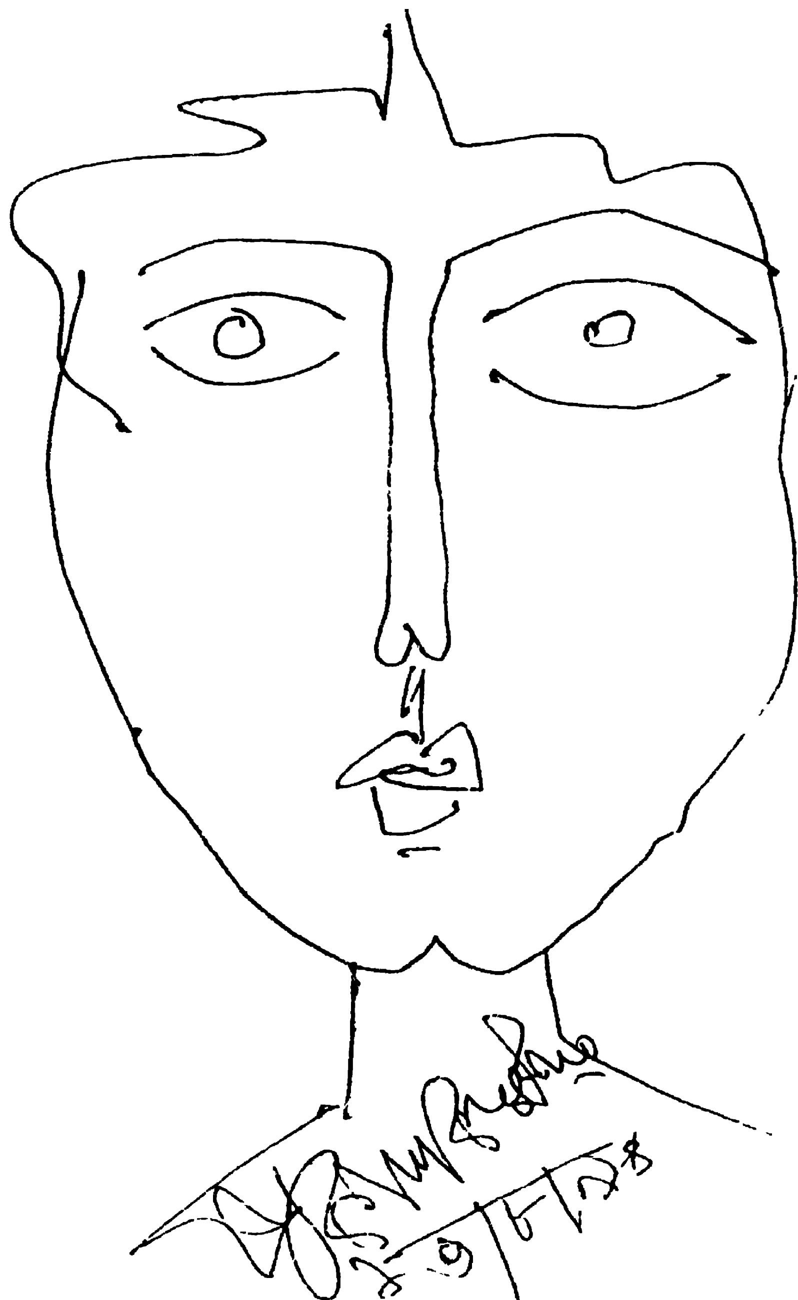
অক্ষর বিন্যাস
ডিজাইনার
৮সি ট্যামার লেন,
কলকাতা—৭০০ ০০৯

ছবি
অনির্বাণ সেন ও লেখক

অলংকরণ
প্রকাশ কর্মকার, সঞ্জয় সেনগুপ্ত, পর্ণিকা মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা—৭০০ ০০৬

বীরভূমের স্বপ্ন, সম্মান ও সাহস
কাঞ্চন সরকার
আত্মজনেষু
এবং
লোকসংস্কৃতিবিদ্
ড. পল্লব সেনগুপ্ত
শ্রদ্ধাভাজনেষু



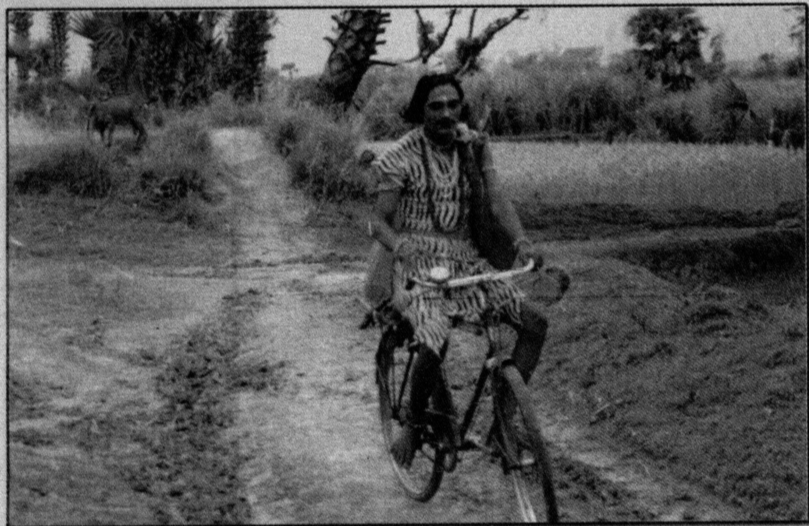
স্কেচ : প্রকাশ কর্মকার



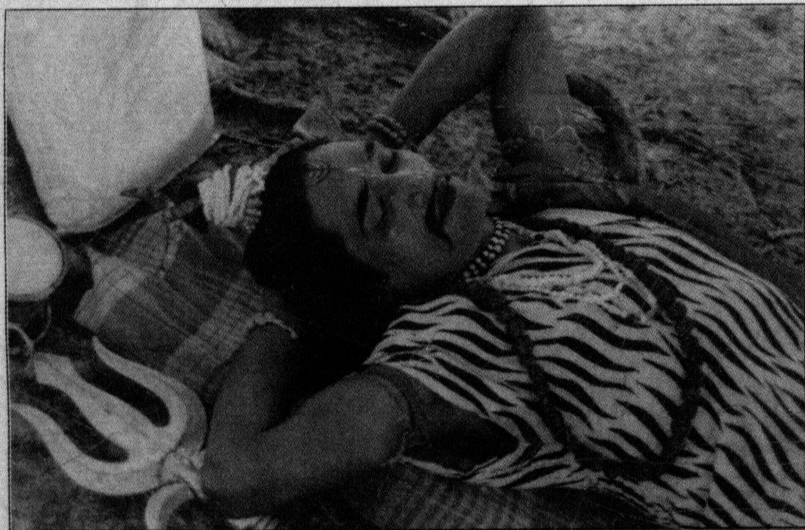
বিষয়সূচি



স্কেচ . সঞ্জয় সেনগুপ্ত, অসম



● শিব চলেছেন কাজে : দিলীপ ব্যাধ



● শিব রয়েছেন শয়ানে : দিলীপ ব্যাধ



● রাক্ষসী



● জীবিকার সন্ধানে



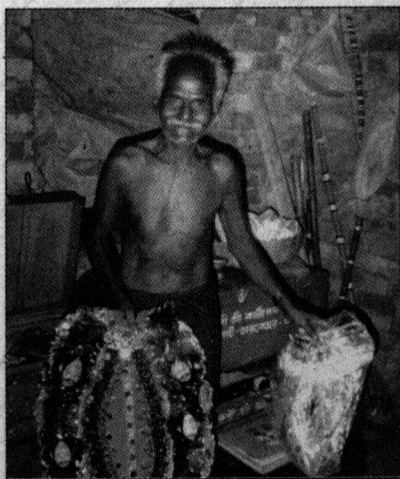
● বাড়ির পথে



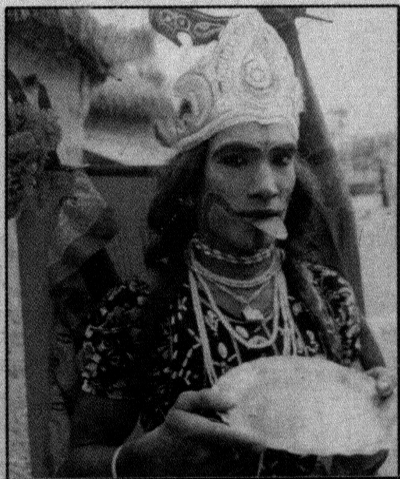
● রাম : শ্যামলী ব্যাধ



● জীবনযুদ্ধে বহুরূপী



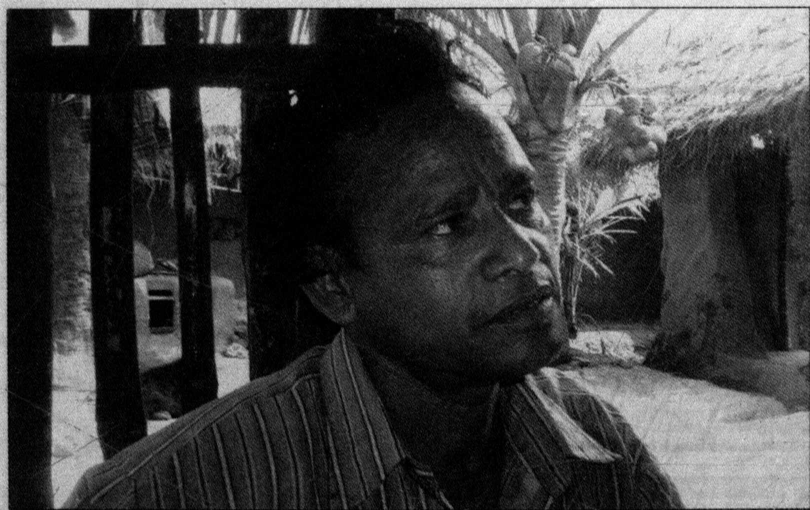
● কালীপদ ও তাঁর পোশাক-সামগ্রী



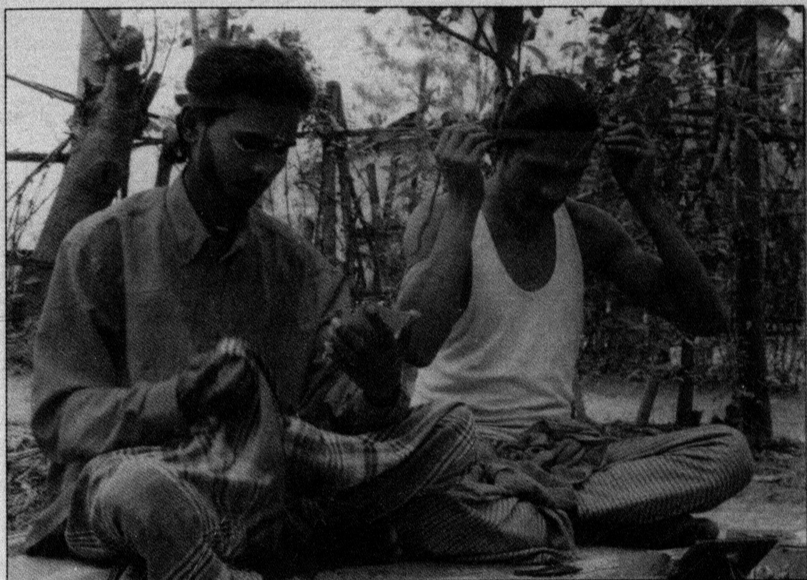
● পথে নেমেছে কালী



● বাণী ব্যাধ : প্রথম গ্রাজুয়েট



● বহুরূপী : সুকুমার



● বহুরূপীর সাজ



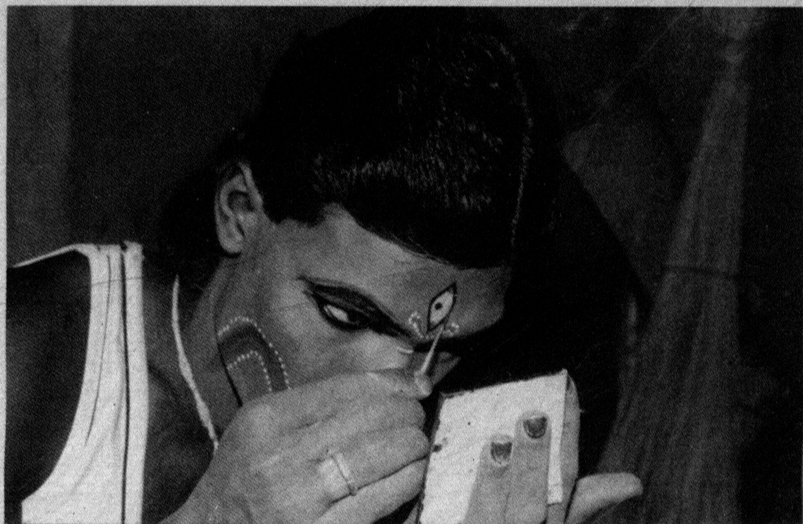
● দিলীপ ও রাজেন্দ্র (বামে)



● শিবের জলখাবার



● শিবের ধূমপান



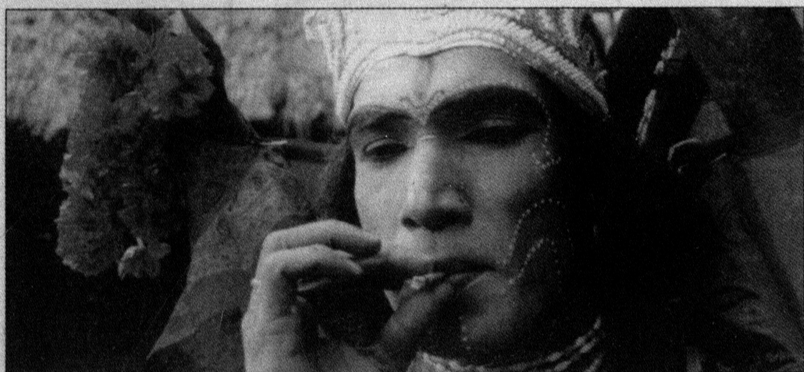
● কালীর সাজ



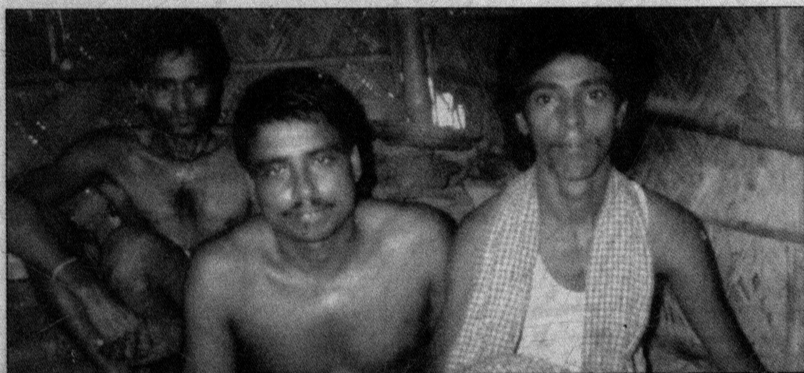
● ডাকুর সাজ



● হনুমান



● বিশ্রামে মা-কালী



● বসন্ততলার বহুরূপী



● তারকা সুন্দরী



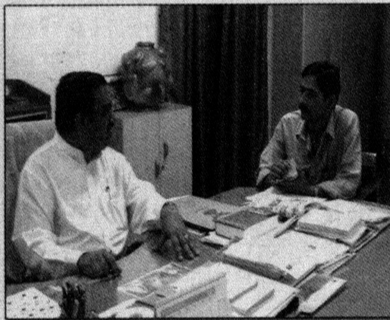
● ড. ভবতোষ দত্তের সঙ্গে আলোচনায় লেখক



● কালীপদ বহুরূপীর সঙ্গে লেখক



● ড. সুধীর করণের সঙ্গে বহুরূপী বিষয়ে আলোচনারত লেখক



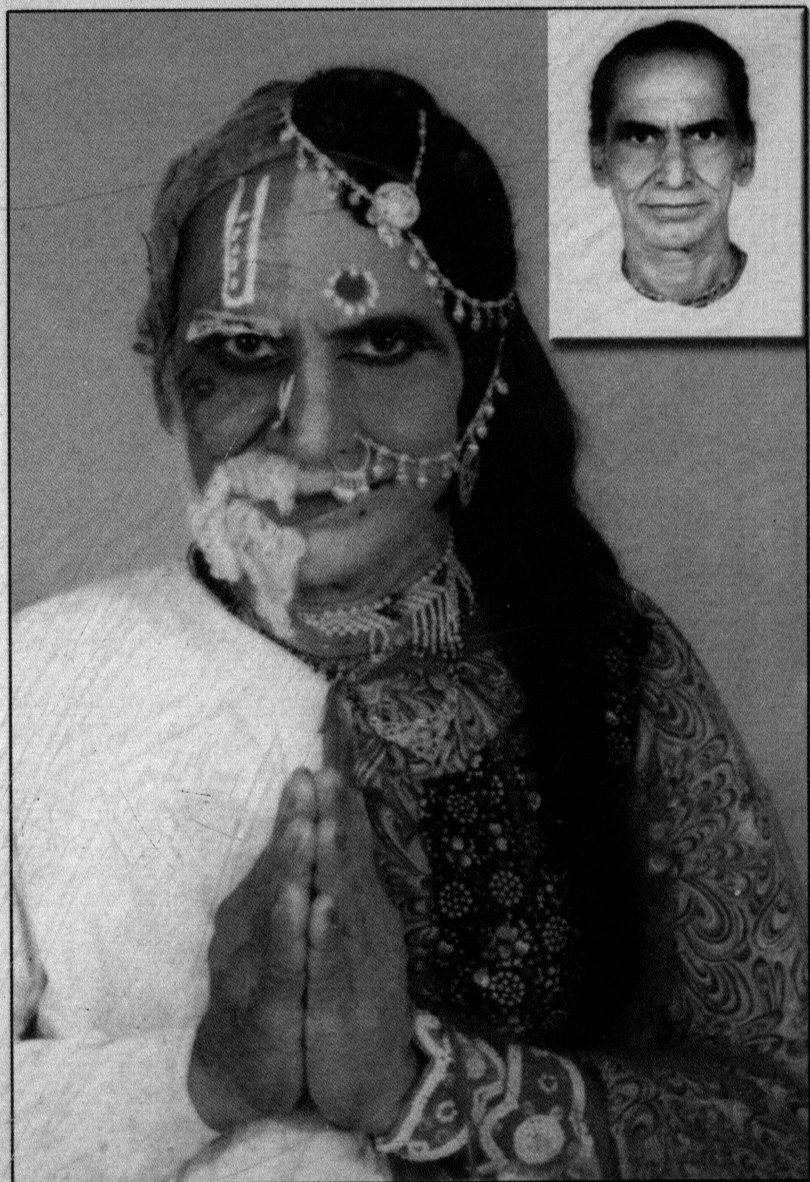
● বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ড. সুজিত বসুর সঙ্গে বহুরূপীর প্রসঙ্গে আলোচনারত লেখক



● শিল্পী যোগেন চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনারত লেখক



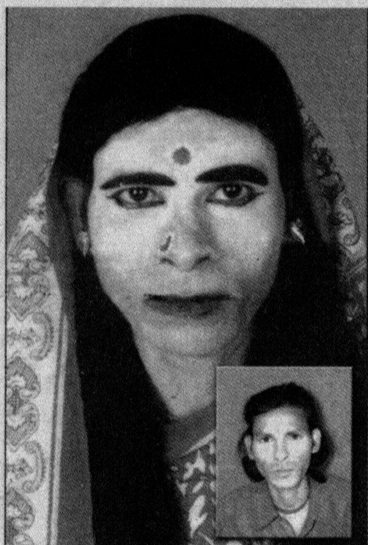
● ড. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনারত লেখক



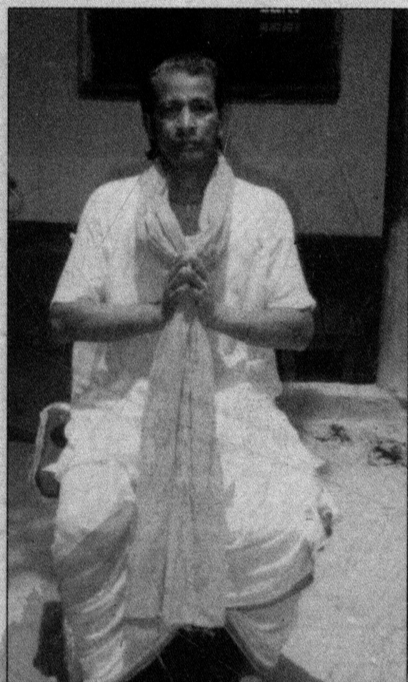
● অর্ধনারীশ্বর : সুবলদাস বৈরাগ্য



● বসুদেব : বিদ্যাধর সূত্রধর



● গোয়ালিনী : বিশ্বনাথ দাস



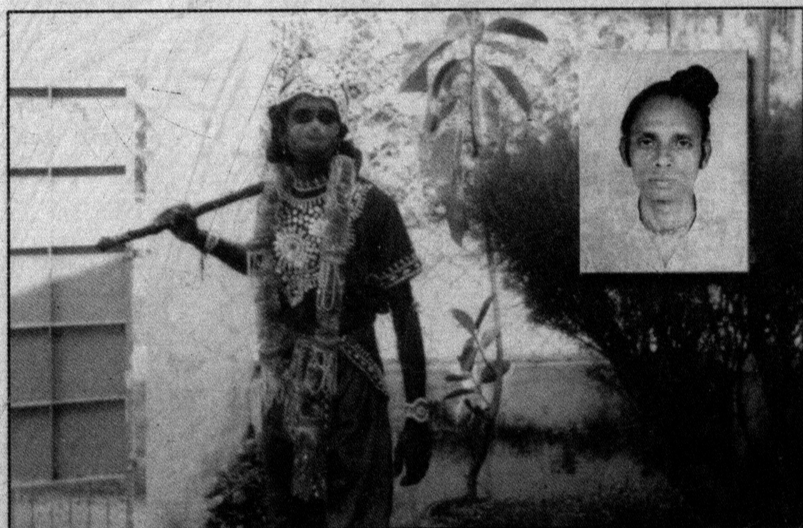
● নিত্যানন্দ মহন্ত



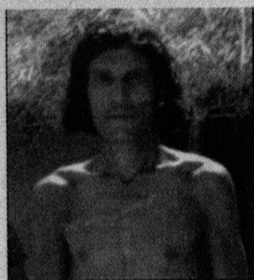
● উচিৎ বেদ



● পাগল : হরিচরণ দাস



● বজরঙ্গাবলী : রবীন্দ্রনাথ সাহা



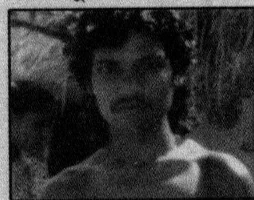
● সেন্টু ব্যাধ



● হনুমান



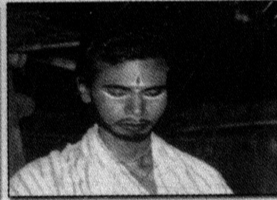
● লোকনাথ বাবা



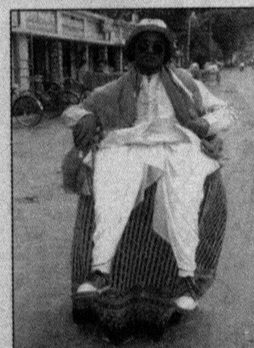
● প্রশান্ত ব্যাধ



● রামরতন ব্যাধ



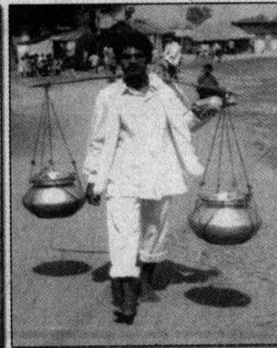
● রাজেন্দ্র ব্যাধ



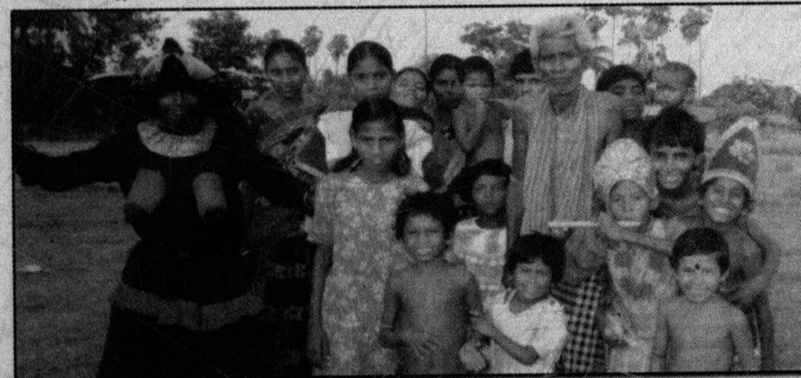
● হঠাৎবাবু



● কালনায় বহুরূপী শিক্ষা



● দইওয়ালা



● কালনায় নাড়ু বহুরূপী ও তাঁর বংশধরেরা

জঙ্গলভূমের মিলন মেলা

কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।

অগণিত জাতির মিলনক্ষেত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ভারততীর্থকে গৌরবের আসনে বসিয়েছেন। ভারতের প্রান্তিক রাজ্য বঙ্গদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধেও এই তথ্য সমান গ্রাহ্য। সমস্ত নদীস্রোতের সম্মিলনেই সীমাহীন সমুদ্র গঠিত হয়। যুগে যুগে তেমনই নদীর ধারার মতো এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে দাঁড়িয়ে মানব-প্রেমিক মানুষের দল 'নর-দেবতা'কে প্রণাম জানিয়েছে। এখানে পবিত্র ধাত্রী-ধরিত্রীমাতা কাউকে ফিরিয়ে দেননি, আশ্রয় দিয়েছেন সকলকে। কোল্ দিয়েছেন আপনার। কিন্তু কার ডাকে, কার আহ্বানে এই নানান বর্ণের মানুষের স্রোত এই ভারতভূমিকে 'ভারততীর্থে' পরিণত করে তুলেছে? আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়-চিন-শক্-হুন-পাঠান-মোগল কতো মানুষের স্রোত এই ভূখণ্ডকে 'মানব সমুদ্রে' পরিণত করেছে, সে ইতিহাস সর্বাংশে জানা নয় ভারতীয়দের। তথাপি বলা যায়, এই ভারতভূমেই সেই সব মানুষের সারি 'এক দেহে হল লীন' তথা মেলবন্ধনের মাটিতে রাখি-বন্ধনের ঐশ্বর্য নিয়ে মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে। সে জনবিন্যাসের আর কোনো জনতাত্ত্বিক ভূমিকা আজ স্পষ্ট করা অসম্ভব। একদা যারা সেখান থেকে এসেছিল, তারা সবাই এই ভারতের মাটিতে মিশে গেছে—এক হয়ে গেছে। বাঙালির রক্তেও সেইসব অতিথি জাতির সন্ধান মিলবে। বাংলাদেশ এবং বাঙালির সঙ্গে তাদেরও নানান মেলবন্ধন ঘটে গেছে।

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল হ'তে তুর্কি আক্রমণের সময় পর্যন্ত নানান জাতি কত তাদের বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা বহন ক'রে এনেছে, তারপর কীভাবে মিশে গেছে বাঙালির সঙ্গে, তার সঠিক হিসেব ইতিহাস রাখেনি। বাঙালি এখন এক 'মিশ্রিত' জন (People), এই বাঙালির জন্মরহস্য উন্মোচন আজ অসম্ভব।

প্রাচীন বাংলাদেশ বিভক্ত ছিল চারটি জনপদে—১. রাঢ়, ২. পুন্ড্র, ৩. বঙ্গ, ৪. সমতট। এখন পশ্চিমবঙ্গ ১৯টি জেলায় বিভক্ত—১. দার্জিলিং, ২. জলপাইগুড়ি, ৩. দক্ষিণ দিনাজপুর, ৪. উত্তর দিনাজপুর, ৫. কোচবিহার, ৬. মালদহ, ৭. মুর্শিদাবাদ, ৮. বীরভূম, ৯. বর্ধমান, ১০. বাঁকুড়া, ১১. পুরুলিয়া, ১২. পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩. পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪. নদিয়া, ১৫. হুগলি, ১৬. হাওড়া, ১৭. কলকাতা, ১৮. উত্তর চব্বিশ পরগণা, ১৯. দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।

বৌদ্ধদের চেয়ে জৈনরাই আবার বাংলাদেশের খবর নিয়েছেন বেশি। যদিও বৌদ্ধ প্রভাবেই বেশি প্রভাবিত প্রাচীন বাংলাদেশ। 'আয়ারঙ্গ' বা 'আচারঙ্গ' সূত্র মতে মহাবীর ও তাঁর শিষ্যদের রাঢ়দেশ তথা বজ্রভূমি পরিভ্রমণকালে সেখানের দুঃখ-দুর্দশা ও লাঞ্ছনা ভোগের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে তাঁদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল রাঢ়ের

আদিবাসিন্দারা। সুতরাং বিষয়টি বেশ স্পষ্ট যে, রাঢ়দেশে আর্য ধর্মের প্রসার খুব সহজে হয়নি। মানভূম-বীরভূম-সিংভূম এবং বর্ধমান এই চারটি জায়গায় কমপক্ষে ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্কর এসেছিলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে, যাঁদের মধ্যে ২০ জনেরই মহানির্বাণ অন্তে সমাধি হয়েছে সুখ্যাত ও পরিচিত পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ পাহাড়ের সমাধিশিখরে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকেই পুন্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গে জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল, এমন অনুমান করেছেন 'বাঙালির ইতিহাস' রচয়িতা নীহাররঞ্জন রায়। জৈন সূত্র-গ্রন্থগুলিতে বাংলার নামও পাওয়া গেছে বারবার।

রাজ-রাজরা-নবাব-বাদশারা অনেক সময় ভিন্‌প্রদেশিয় রাজকুমারীদের বিয়ে ক'রে নিয়ে আসতেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও সেই নারীর রক্ত মিশে থাকতো। তাদেরও কোনো জাতি-বর্ণ নেই। বাঙালি পাল-সেন-বর্মন রাজাদের ক্ষেত্রেও এমন সংকরায়ন দেখতে পাওয়া যায়। আসলে বিশাল জনপ্রবাহের একই প্রাকৃতিক নিয়ম।

রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন গঙ্গাসাগর-সঙ্গম থেকে পঞ্চনদের পূর্বসীমা পর্যন্ত এক অখণ্ড রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগেই বাংলাদেশে আর্যসভ্যতা প্রবেশ ক'রে গেছে। কিন্তু 'বৌধায়ণের ধর্মসূত্র' সন্দেহ প্রকাশ করেছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্য সভ্যতা প্রসার সম্পর্কে। কারণ, এর ঠিক আগেই উত্তর ভারতের বহু জায়গার সঙ্গে বাংলাদেশেও 'দ্রাবিড়' সভ্যতা প্রবেশ করেছে এবং তার পরেপরেই 'আলপীয়' মানবগোষ্ঠী প্রবেশ ক'রে এ রাজ্য জুড়ে গড়ে তুলেছে একটি মিশ্র সংস্কৃতি।

উত্তর ভারতে বসবাসকারী 'নর্ডিক' গোষ্ঠীর আর্যরা বাংলাদেশে যখনই প্রবেশ করুন, তাঁদের গড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঙ্গা-ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলেই সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময়ে বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সন্নিহিত ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূ-ভাগ এবং বৃহত্তর রাঢ়-জনপদ অরণ্য-পর্বতে পূর্ণ ছিল। এই জঙ্গলভূমিই তখন পরিচিত ছিল বজ্রভূমি বা বজ্জভূমি নামে। জঙ্গলভূমে তখন যে জনগোষ্ঠী বসবাস করতো তাঁরা পরবর্তীকালে 'নেগ্রিটো' বা 'প্রোটো-অস্ট্রলয়েড' নামে পরিচিত হয়েছে এবং এদের ভাষাই ছিল 'অস্ট্রিক' ভাষা। এই মানবগোষ্ঠী একসময় সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। তবে জঙ্গল মহলেই ছিল তাদের আদি বাসস্থান। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় জাতির সংস্পর্শে এসে এদেরই কোনো কোনো দল চাষের কাজে আত্মনিয়োগ করে, আর কোনো কোনো দল আদিম বৃত্তি পশুপাখি শিকার করেই জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে।

আর্যদের চোখে এরাই প্রান্তজন, অনার্য। ধর্ম-কর্মহীন মানবগোষ্ঠী মাত্র। তবে কিছু লোক বিষ্ণুর পুজো করতো। কিছু লোক শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির আর বাকীরা সবাই ধনুর্বিদ্যায় ছিল নিপুণ—তারাই পশুপাখি শিকার ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতো। জঙ্গল মহলের সামান্য অংশের ভূমিই ছিল চাষযোগ্য, বাকী সবই এবড়ো-খেবড়ো ভূমিখণ্ড মাত্র। বিশেষভাবে বীরভূম জেলায় দ্রাবিড় সভ্যতা প্রবেশের আগে যে সমস্ত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষজন বসবাস করতো তাদের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাঁও, মাহালি, কোড়া, মালপাহাড়ি প্রভৃতি উপজাতিই

প্রধান। এরা সবাই পশু-পাখি-পাহাড়-পর্বত-নদী-গাছ-প্রভৃতির মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখে শক্তির পুজো করতো। অলৌকিক-ভূত-প্রেত-ডাইনি-বোঙার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতো। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষজনের প্রধান জীবিকা বলতেই ছিল পশুপাখি শিকার।

বীরভূম-মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমানের কোনো কোনো এলাকায় দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর আগমনের অল্পকালের মধ্যেই আর এক জনগোষ্ঠী এসেছিল, যারা 'অসুর' নামে পরিচিত। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে মিশে গিয়ে আর্যদের আসবার আগেই বাংলাদেশে তারা 'অসুর' সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে বীরভূম-মুর্শিদাবাদের কিছু জনশ্রুতি এবং স্থাননাম স্মরণ করা যেতে পারে। বকাসুরের 'কোট' দুর্গ বা রাজধানী ছিল কোটাসুর, অর্সুলা বা অসুরালয়ে ছিল অসুরদের বসবাসের জায়গা, কলেশ্বরে কলাসুর-কলাবতী, বিল্বগ্রাম বা বেলগ্রামে বিল্বাসুর, হিড়িম্বা উল্লেখযোগ্য। অসুরেরা কেমন ছিল? মায়া বা ইন্দ্রজাল ছিল তাদের আয়ত্বে, আর তারা প্রায়ই দেবতাদের বিরুধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতো। দেবদ্বেষী অসুরেরা অনেক সময় স্বর্গরাজ্যও দখল করে নিতো। মহিষাসুর ও দেবীদুর্গার যুদ্ধকথা তো দেবী মূর্তিতেই প্রতিভাত। এখান থেকে ধারণা হ'তে পারে যে দেবতারা 'আর্য' আর অসুরেরা 'অনার্য'। বেদে অসুরদের 'ভাই' বলা হয়েছে। 'দেবাসুর' উচ্চারণও তেমন সম্প্রীতিকে সহজেই স্মরণ করায়। সম্ভবত অসুরেরা ছিল 'অ্যাসিরিয়ান' গোষ্ঠীর এবং তারা আর্যদেরই একটি শাখা। এরাই প্রথম ভারতে এবং বাংলাদেশেও প্রবেশ ক'রে এদেশের আদিবাসিন্দা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষজনের সঙ্গে মিশে যায়। সম্ভবত খ্রিস্ট্রপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগেই এই অসুর সম্প্রদায় সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এরাই 'আল্পীয়' জাতি নামে পরিচিত এবং আর্য ভাষাভাষী মানুষ। 'নর্ডিক' গোষ্ঠীর আর্যদের সঙ্গে এই 'আলপীয়' গোষ্ঠীর অসুরদের যুদ্ধ-বিরোধ প্রায় লেগেই থাকতো। সেই-ই হয়তো দেবাসুরের সংগ্রাম। 'নর্ডিক' আর্যরা ছিলো বেদপন্থি আর 'আলপীয় অসুরেরা ছিলো বেদ বিরোধী।' অসুরেরা শিবের উপাসনা করতো বেশি। পরে কৃষি দেবতা শিবের সঙ্গে ব্রহ্মাও যুক্ত হয়েছেন উপাসনায়। অসুরেরা ছিল আদি-অস্ট্রেলিয় পরিবারের মানুষ।

অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার বিস্তৃতি এক সময় উত্তর ভারতের বহু স্থানেই লক্ষ্য করা গেছে। সমগ্র সাঁওতালভূমি, অসম, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মালদহ জেলা পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই অস্ট্রিক ভাষা প্রচলিত ছিল। সে প্রভাব থেকে বঙ্গদেশের মানুষ আজও মুক্ত নয়। 'এক কুড়ি, দু' কুড়ি, তিন কুড়ি' বিশ বা বিংশ নয়, ৮০টায় এক 'পণ', ৪টায় এক 'গোণ্ডা' প্রভৃতি গণনার রীতি-পদ্ধতি অস্ট্রিক গোষ্ঠীজাত। বাংলা 'খাঁ-খাঁ', 'বাঁখারি', 'বাদুর', 'কানি', 'জাং', 'ছাঁচ', 'চোঙ্', 'বোয়াল', 'পগার', 'গড়', 'বরজ', 'লাউ', 'লেবু' প্রভৃতি অজস্র শব্দ অস্ট্রিক শব্দ জাত। জৈন 'আচারাঙ্গ সূত্র' হতেই জানা যায় খ্রিস্ট্রপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর যখন পথহীন লাঢ় (রাঢ়দেশ) দেশে জৈনধর্ম প্রচারের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এখানের লোকেরা সেই জৈন ভিক্ষুকে আঘাত করে এবং 'চু-চু' বা 'তু-তু' বা 'ছু-ছু' ক'রে কুকুর ডেকে লেলিয়ে দেয়। কুকুর ডাকার ভাষাটি দেশজ বাংলা তথা অস্ট্রিক ভাষা। বীরভূমের সাঁইথিয়াকে কেন্দ্র করে ময়ূরাক্ষী ও দ্বারকা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে জৈন-ভিক্ষুরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন। ভোগপুর গ্রামে ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীর এসেছিলেন ব'লে এলাকার মানুষজন উল্লেখ

ক'রে থাকেন। মারকোলা-আবাভাঙা-নন্দীগ্রাম অঞ্চল থেকে মহাবীরের দিগম্বর মূর্তিও পাওয়া গেছে। শিব হিসেবে কোনো কোনো জায়গায় সেইসব মূর্তি পুজোও পাচ্ছেন। জৈনরাও পরবর্তীকালে এইসব অঞ্চলে 'শৈব' হ'য়ে গিয়েছিলেন, তেমন প্রমাণও অমিল নয়।

বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যবদান' থেকে জানা যায় স্বয়ং গৌতমবুদ্ধ একবার বঙ্গভূমি তথা বীরভূম অঞ্চল অতিক্রম করেই পুন্ড্রবর্ধন গিয়েছিলেন। ঘটনাটি খ্রিস্টপূর্বাব্দের। বজ্রযান ও সহজযান বৌদ্ধধর্মমত বীরভূমে বিস্তৃত হ'তে শুরু করে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে। খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চিন দেশিয় পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙ বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি বজ্জভূমিতে তথা বীরভূম-মুর্শিদাবাদ এলাকায় বহু বৌদ্ধ-বিহার দেখেছিলেন। আনুমানিক খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বৌদ্ধ পাল রাজারা ধর্মটির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে সেন রাজাদের রাজত্বকালে হিন্দু ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হলে বৌদ্ধদেবদেবী হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। যেমন ভদ্রপুরের বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর শিব হিসেবে পুজো পাচ্ছেন, তেমনই বারার আর্য তারা হয়েছেন ভুবনেশ্বরী, দেবগ্রামের বজ্রবারাহি হয়ে উঠেছেন শক্তি, তিলোরার বৌদ্ধদেবী পূজিতা হচ্ছেন গঙ্গা হিসেবে। আসলে বৌদ্ধ ধর্মমত আর হিন্দু ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য তত প্রকট ছিল না সাধারণের কাছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে (সম্ভবত ১২০২ সালে তুর্কি আক্রমণ) তুর্কি আক্রমণ শুরু হ'লে বহু বৌদ্ধ-বিহার এবং হিন্দু মঠ-মন্দির ধ্বংস হয়, প্রচুর মূর্তি ধ্বংস হয়। তখনই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অনেকেই নেপাল-তিব্বত অঞ্চলে পালিয়ে যান। চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'লে বৌদ্ধ দেবদেবীরা সকলেই (অবশিষ্ট) হিন্দু দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয়ে পুজো পেতে থাকেন।

কৃষি প্রধান দেশ ভারতবর্ষ। 'লাঙ্গল' শব্দটি অস্ট্রিক ভাষাজাত, পরে এই শব্দটি আর্য ভাষায় 'লাঙ্গল' হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। আসলে আর্যরা চাষ জানতো না, অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলিয় মানুষজনই এদেশে কৃষি ব্যবস্থা চালু করে ছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়দের কয়েকটি শাখা অরণ্যচারীও ছিল, যাদের প্রধান জীবিকাই ছিল শিকার। শিকারজীবী ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শি সেইসব অরণ্যচারী নিষাদ-ভিল—কোল শ্রেণির শবর-মুণ্ডা-হো-সাঁওতালেরাই ছিল এই বিস্তৃত বাংলার আদি বাসিন্দা। আর্যদের প্রবল চাপে অরণ্য-উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে তারা, জঙ্গল মহলের সেইসব স্থায়ী এবং আদি বাসিন্দারা পাহাড়ে-পর্বতে চলে গিয়েছে এই অঞ্চল ছেড়ে। আজ নিজবাসভূমে পরবাসী যাযাবর হিসেবে গণ্য হচ্ছে তারাই। এতে অবশ্য তাদের কোনো খেদ নেই, ক্ষোভ নেই। অভিমানও বোধহয় আজ আর নেই।

অস্ট্রিকেরা যাতায়াতের জন্য নদীপথ বা জলপথই ব্যবহার করতো, তাদের যানবাহনের মধ্যে ডোঙ্গা-ভেলা-গুঁড়িকাঠ এসবই ছিল প্রধান। অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলিয়দের তৈরি করা সভ্যতা মূলত গ্রামীণ সভ্যতা, গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘমুণ্ড বিশিষ্ট দ্রাবিড় ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী সিন্ধুনদের উপত্যকা হ'তে আরম্ভ ক'রে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই উন্নত একটি সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। হরপ্পা, মহেন্-জো-দাড়ো, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ কাহিনিতে যে সভ্যতার ধ্বংস চিহ্নের বিবরণ পাওয়া যায় তা দ্রাবিড় ভাষাভাষী দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীরই রচনা। মূলত তারাই ভারতবর্ষে নগর-সভ্যতার সূচনা করেছে। এই গোষ্ঠীর লোকেরা সোনা-রুপো-সীসা-ব্রোঞ্জ এবং টিনের ব্যবহার জানতো।

তাম্র-প্রস্তর যুগের চিত্রকলা, জ্যামিতিক রেখাঙ্কন, মাটিতে গড়া পুতুল, নানান মুখ বিশিষ্ট খেল্‌না তা এই দ্রাবিড়ভাষী দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীরই সৃষ্টি।

বৈদিক আর্য ভাষাভাষীদের প্রাথমিক স্তরের সভ্যতায় ছিল যাযাবরত্ব ত্যাগ। খড়-বাঁশ-লতাপাতা দিয়ে খুবই অস্থায়ী কুঁড়েঘর নির্মাণ অথবা পশুর চামড়া দিয়ে নির্মিত তাঁবুতে তারা বাস করতো। তারা গো-পালন করতো, পশুর মাংস পুড়িয়ে খেতো, দলবদ্ধভাবে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। যাযাবরত্ব ত্যাগ ক'রে এদেশে এসে তারা কৃষিকাজের সঙ্গে পরিচিত হলো, গ্রামীণ সভ্যতা এবং নগর-সভ্যতার সঙ্গে তাদের ধীরে ধীরে পরিচয় গড়ে উঠ্‌লো। তারা অস্ট্রেলিয় এবং দ্রাবিড়িয় সভ্যতাকে একান্তভাবে আত্মসাৎ ক'রে নিজস্ব এক নতুন সভ্যতাও গড়ে তুলতে সমর্থ হলো। দুই সভ্যতার সমন্বিত আর্যীকরণই হলো আর্য ভাষা বহনকারী মানুষজনের উন্নত সভ্যতা।

বাংলাদেশ ও বাঙালির বাস্তব সভ্যতার রূপ সেই প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামের সীমানায় বাঁধা। সেকারণেই সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালির ইতিহাসে নগরের প্রাধান্য নেই। এখানে উন্নত নগরের সংখ্যা কম। বাঙালির সমাজ-বিন্যাসেও নগরের প্রাধান্য কম। এর কারণ বাংলাদেশ চিরকালই ভারতের প্রত্যন্ত প্রান্তে নিজস্ব কৃষি এবং গ্রামীণ সভ্যতা নিয়েই সুখে থেকেছে। সেজন্যই মূল অস্ট্রিক উপাদানকে সার্বিকভাবে বিলোপ করতে পারেনি বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

অস্ট্রিক, মিশ্র-অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো; দ্রাবিড়, মিশ্র-দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক, মিশ্র-নেগ্রিটো ও দ্রাবিড় এবং মিশ্র অস্ট্রিক-নেগ্রিটো-দ্রাবিড়, এইসব জনগণ যখন উত্তর ভারতের অনার্যজন রূপে মিশ্রধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে বাস করছিল, যখন দেশ ছিল খণ্ড-ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত, দেশে ঐক্য-সৃষ্টিকারী কোনো কেন্দ্রাভিমুখি শক্তিও ছিল না, তেমন সময়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তি শালী-কর্মী-শৃঙ্খলাবদ্ধ-বস্তু উপযোগী আর্যজাতি (আর্যভাষী) ভারতে দেখা দিল। একভাষা ও এক সংস্কৃতিতে তারা ভারতকে বেঁধে ফেলতে সচেষ্ট হলো। তারাই ভারতে বৈদিকধর্ম, দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু মন্ত্র বা সুক্ত নিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতি সৃষ্টি করে তুললো।

শতাব্দীর পর শতাব্দীর সংঘাত ও সমন্বয়ের ফলে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বুকে আর্যভাষী আদি-নর্ডিকেরা এক সমন্বিত জন-ধর্ম-সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুললো, কিন্তু তখন আর সে জনের মধ্যে 'রক্ত বিশুদ্ধতা' রইলো না। এই সমন্বিত জনের নাম 'ভারতীয় জন'। সে ধর্মও আর 'বেদ-ব্রাহ্মণে' সীমাবদ্ধ থাকলো না। এই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা নতুন সমন্বিত সভ্যতায় এসে 'ভারতীয় সভ্যতা' নামে পরিচিত হ'তে থাকলো। বিশিষ্ঠ ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ও এই মত সমর্থন করেছেন তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস (আদি পর্ব)' গ্রন্থে।

প্রাচীন রাঢ়দেশের কেন্দ্রভূমি বর্তমান বীরভূম এবং বর্ধমান জেলা। এই দুই জেলার প্রাণ-প্রবাহিনী নদীগুলি হলো ময়ূরাক্ষী-অজয়-বক্রেশ্বর-কোপাই-ব্রাহ্মণী-দ্বারকা-কুন্নুর প্রভৃতি। এই সমস্ত নদনদীমালাই বছরের পর বছর ধরে ছোটনাগপুর ও ওড়িশার পাহাড়গুলি থেকে ছোটো-বড়ো কাঁকর মেশানো মাটিকে ঠেলে নিয়ে গেছে দূরে-দূরান্তরে। সুবর্ণরেখা-শিলাবতী-কংসাবতী বিধৌত মেদিনীপুর বাঁকুড়া-পুরুলিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। নদীগুলির প্লাবনের স্রোত যতো দূরে ততো কম, যতো কাছে ততো বেশি। রুক্ষ-কঠিন-প্রান্তর জুড়ে কাঁকর-

লালমাটির ঢেউ, কোথাও ছোটোবড়ো পাহাড়ের স্তূপ, জলা-জংলা ভূমি। এই-ই বীরভূম-বর্ধমান-পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূ-প্রকৃতি। পশ্চিমবঙ্গের এই-ই পুরাভূমি। মহাবীর জিন রাঢ়দেশের যে অঞ্চলে এসে অঞ্চলের নাম দিয়েছিলেন 'বজ্রভূমি', সে এই বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ভূমি। এ ভূমি যথার্থই 'বজ্রভূমি', বজ্রকঠিন ভূমি।

বৃহৎ বাংলাদেশের সীমানা নির্দেশ করার ক্ষেত্রে বলা যায়—উত্তরে হিমালয় এবং নেপাল-সিকিম-ভুটান রাজ্য, উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ (দ্বারভাঙা), পূর্ব দিকে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মালভূম-ধলভূম-ময়ূরভঞ্জ-কেওনঝড়ের অরণ্য ও প্রস্তরময় মালভূমি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমানায় ঘেরা ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুন্ড্র-বরেন্দ্রী-রাঢ়-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল প্রভৃতি জনপদ অবস্থিত। ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদীবিধৌত বাংলার গ্রাম, বাঙালির কর্মকৃতির উৎসস্থল। যদিও সমস্ত ক্ষেত্রেই নদনদী মানব-সভ্যতার বাহন হয়ে উঠেছে এবং তারই তীরবর্তী অঞ্চল জুড়েই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে সিধল গ্রামের (শীতল গ্রামের) ভট্ট ভবদেব, যিনি একাদশ শতকে রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন তিনি তাঁর ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে রাঢ়দেশের 'অজলা-জাঙ্গলময় প্রদেশের' উল্লেখ করেছেন। ভবিষ্যপুরাণেও 'রাঢ়ী খণ্ড জাঙ্গল' নামে এক দেশের কথা আছে। বৈদ্যনাথ-বক্রেশ্বর-বীরভূম এবং অজয় নদ এই দেশের অন্তর্গত। এখানের তিনভাগই তখন জঙ্গল-উষর ও অনুর্বর ভূমি দিয়ে পূর্ণ, একভাগে মাত্র গ্রাম ও জনপদ ছিল। চিনা পরিব্রাজক যুয়ান-চোয়াঙ চম্পা বা ভাগলপুর হ'তে 'কজঙ্গল' তথা দামোদর-অজয়-ভাগীরথীর সমতল উপত্যকাতেই এসেছিলেন। তিনি বৈদ্যনাথ-বক্রেশ্বর বা বীরভূমের কথা বলেননি। যুয়ান-চোয়াঙ তাম্রলিপ্তি এবং কর্নসুবর্ণ রাজ্যও গিয়েছিলেন, সেখানেও তিনি প্রায় সমভূমি অঞ্চলেই ঘুরে ছিলেন। রাঙ্গামাটির বিবরণ তেমন মন্তব্যেরই সমর্থক করে। এই পরিব্রাজক পশ্চিমবঙ্গের সমতল ভূমিখণ্ডের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন, উষর-জঙ্গলময়-রাঢ়ী ভূ-খণ্ডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল ব'লে ইতিহাসবিদ্ নীহাররঞ্জন রায়ও মনে করেন না। আসলে তিনি এসেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী হিসেবে বৌদ্ধবিহার দর্শন এবং বৌদ্ধধর্মগুরুদের সঙ্গে পরিচিত লাভের উদ্দেশ্যেই। আর বৌদ্ধবিহার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রগুলি সাধারণত সহজগম্য এবং মোটামুটি লোকালয়েই অবস্থিত ছিল। কাজেই সুপরিচিত, বহুজনপদচিহ্নিত পথ ধরেই তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। উষর-অনুর্বর-জনবিরল-জঙ্গলময় এলাকায় তাঁর যাবার কোনো প্রয়োজনই পড়েনি। তথাপি তাঁর বিবরণ হতেই জানা যায় রাঢ়-পুন্ড্রের সঙ্গে বরেন্দ্রভূমির একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমানের আংশিক ভূ-প্রকৃতি এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও উত্তরবঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। এই সমস্ত এলাকাতেই বাংলার পুরাভূমিগুলি রয়েছে। মধ্য বা দক্ষিণ বঙ্গের পদ্মা-ভাগীরথী-মধুমতীর নির্মিত নবভূমিতে বাংলার পুরাভূমির অস্তিত্ব কোথাও নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী পলিমাটি জমে জমে সেই ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি।

মুকুন্দরাম 'চণ্ডিমঙ্গল' কাব্যে রাঢ়দেশের অধিবাসীদের একটু রূঢ় এবং হিংস্র প্রকৃতিব হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। ঘনরাম তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—

অক্ষটি হিংশক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়।
কৃতাঞ্জলি বীর কহে হই গ চোয়াড়।
লোকে না পরস করে সভে বলে রাড় ॥

মুঘল আমলে 'সুবা বাংলা' নামে পরিচিত ছিল যে দেশটি, সেটিই আমাদের দেশ। বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'-তে 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত 'আলি' বা পূর্ববঙ্গীয় 'আইল' যুক্ত থাকার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। এই আমাদের 'বাংলা দেশ'। 'বঙ্গ' খুবই প্রাচীন দেশ। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থেই বোধহয় সর্বপ্রথম এই দেশের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে ভীম দিগ্বিজয়ে বের হ'য়ে মুঙ্গেরের (মুদ্‌গিরি) রাজাকে হত্যা ক'রে কোশীনদীর তীরবর্তী পুন্ড্ররাজকে পরাজিত করেন, তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি বঙ্গ-তাম্রলিপ্ত-কর্বট-সুম্ভ-প্রসুম্ভ প্রভৃতি রাজাদের এবং ম্লেচ্ছ কোমদের পরাভূত করেন। অসুর বিজয় তেমনই কোনো ঘটনা নিশ্চয়। মহাভারতের আদিপর্বে এবং রামায়ণেও বঙ্গজনপদের সঙ্গে বঙ্গজনদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সিংহলী 'মহাবংশ' এবং 'প্রজ্ঞাপনা' নামের জৈন গ্রন্থেও বঙ্গজনেরা রাঢ় (লাঢ়) জনদের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন। সপ্তম শতকের প্রথম পাদে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ-মালদহ-মুর্শিদাবাদ হ'তে একেবারে উৎকল তথা ওড়িশা পর্যন্ত এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই ঐক্যের সূচনা প্রথম দেখা গেছে খ্রিস্টিয় ষষ্ঠশতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। শশাঙ্ক তাকে পূর্ণতা দান করেছেন। শশাঙ্কের পর হতেই মোটামুটিভাবে তিনটি জনপদ পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ), গৌড় এবং বঙ্গ মিলেই 'বাংলাদেশ' হয়ে উঠেছে। পরে আরও স্পষ্ট হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ-রাঢ়বঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ মিলেই বাংলাদেশ। পূর্ববঙ্গ নিজেই এখন একটি দেশ। অবশ্য এমন একটি সময় ছিল যখন 'গৌড়' বলতেই সমগ্র বাংলা দেশকেই বোঝাতো। চৈতন্যের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' তো তেমন কথাই বলতে চেয়েছে। ঊনবিংশ শতকে কবি মধুসূদনও 'গৌড়জন' বলতে সারা বাংলাদেশের অধিবাসীকেই বিবেচনা করে ছিলেন তাঁর কবিতায়।

রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ॥

বাঙালির ইতিহাসের যে অস্পষ্ট ঊষাকালের কথা জানা গিয়েছে তাতে বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, আর্যীকরণের আগে বাংলাদেশে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী এবং খুব অল্প সংখ্যক কৃষি-অরণ্যচারী-শিকারজীবী মানুষজন এখানে থাকতো। সবচেয়ে বেশি সংখ্যকই ছিল অস্ট্রিয় লোকজনেরা। পরবর্তী সময়ে মৌর্য ও শুঙ্গাধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে আর্যসংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটে। আর্য-বৌধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে অবশ্য গুপ্তযুগে।

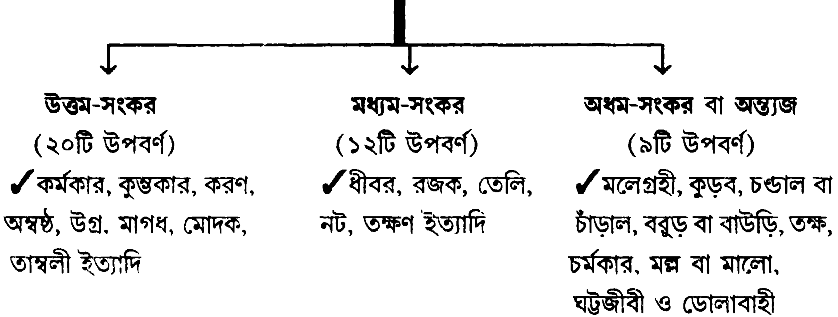
নিম্নবর্গের বা বর্ণের বাঙালির এবং বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভেতর যে জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, নরতত্ত্ববিদেরা তাদের নামকরণ করেছেন আদি-অস্ট্রেলিয় (Proto Austroloid)।

পালরাজাদের লিপিতে তৎকালীন বর্ণসমাজের নিম্নতর স্তরের কিছু পরোক্ষসংবাদ পাওয়া যায়। চণ্ডালরাই সেই সমাজের সবচেয়ে নীচের স্তরে ছিল। ভবদেব ভট্টের স্মৃতিশাসনে চণ্ডাল এবং অন্ত্যজ দুই-ই সমার্থক। পাল রাজাদের বেতনভুক সৈন্যদলে যে সমস্ত বিদেশি ও ভিনপ্রদেশি লোকজন ছিল, তারাও হেয় বা নীচ্ হিসেবেই পরিগণিত হতো। তাদের স্থানও বাঙালি সমাজের নিম্নস্তরেই ছিল। চর্যাপদ বা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' গ্রন্থে আরও কয়েকটি তথাকথিত নীচ্ জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। ডোম্ব বা ডোম, চণ্ডাল, শবর ও কাপালি। ডোমেরা সাধারণত নগরের বাইরে কুঁড়েতে বাস করত। ব্রাহ্মণস্পর্শ তাদের নিষিদ্ধ ছিল। তারা বাঁশের চাঙারি তৈরি করে। ডোমেদের নারী ও পুরুষেরাও নাচে-গানে যথেষ্ট দক্ষ ছিল।

১. নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ ॥
২. উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥

'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' ব্রাহ্মণেতর বর্ণ বিভাগে ৪১টি জাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে যতো জাত আছে (ব্রাহ্মণ ছাড়া) সবাইকেই সংকর বা মিশ্রবর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। চতুর্বর্ণের যথেচ্ছ যৌনাচারই এই মিশ্রবর্ণের উৎপত্তির কারণ।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণবিভাগ



এই ৪১টি জাত ছাড়াও ম্লেচ্ছ পর্যায়ের আরও কয়েকটি দেশি ও ভিনপ্রদেশি কোমের নাম পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'ও ওইরকম বর্ণবিন্যাস রয়েছে। সেখানেও অসৎ শূদ্রেরও নিম্নপর্যায়ে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য হিসেবে-ব্যাধ, ভড়, কাপালি, কোল, কোঞ্চ, হাড়ি, ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগ্দি?), শরাক, ব্যালগ্রাহী, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির মানুষজনকে রাখা হয়েছে। অন্ত্যজ পর্যায়ের আর একটি বর্ণের খবর পাওয়া যায় বন্দ্যঘটীয় আর্তিহর পুত্র সর্বানন্দের (১১৬০) লেখায়। এরা বেদে বা বাদিয়া, এরা সাপ খেলা দেখিয়ে অল্পমন্ত্র-তন্ত্র ব'লে—তাবিজ মাদুলি দিয়ে বেড়ায়। পশুপাখি শিকার-নাচগান-জাদুবিদ্যা তথা ভোজবাজি দেখানো-সাপ নাচানো এইসবই ছিল এদের বৃত্তি। কোনোভাবেই এরা কৃষিকাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে চাইতো না। আশ্চর্যের বিষয়, সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিকেরাই সে যুগে চিহ্নিত হয়েছিল ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ হিসেবে। এদের অধিকাংশই আদিবাসী 'কোম'।

অন্ত্যজ-অপাংক্তেয়-ম্লেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী 'কোমদের' প্রধান উপজীব্য বিষয়ই ছিল শিকার আর বিহার। এদের কিছু কিছু শিকার-চিত্র পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর ফলকগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে কুস্তি-মল্লযুদ্ধ এবং নানারকমের কষ্টসাধ্য শারীর-ক্রিয়ার সন্ধান মেলে, যা কিনা শুধুমাত্র নিম্নকোটির মানুষজনেরই অন্যতম 'বিহার' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। 'পবনদূতে' নারীদের জলক্রীড়া, উদ্যান রচনার কথা আছে। দাবা খেলা-পাশা খেলাও ছিল, তবে তা কায়িকশ্রম নির্ভর প্রান্তবাসীদের তেমনভাবে আকর্ষণ করেছিল ব'লে মনে হয় না। তারা বরং কড়ি, গুঁটি, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশ পঁচিশ, আড়াইঘর প্রভৃতি খেলা খেলেছে। তবে উচ্চ ও নিম্ন কোটির উভয় স্তরেই বাররামা-দেবদাসীদের সকলেই ছিল নৃত্যগীতবাদ্য পটীয়সী, নানা কলায় নিপুণা। পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং অসংখ্য ধাতু ও প্রস্তর মূর্তিতে নানান ভঙ্গির নৃত্যরত নারীপুরুষের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। এখনও বাংলাদেশে সমাজের নিম্নস্তরে বহু গায়ক-গায়িকার দেখা মেলে, যারা নাচ-গান করেই জীবিকা নির্বাহ করে। পুরুলিয়ার 'নাচ্‌নি', বীরভূমের 'ঝুমুর' তেমন সংস্কৃতিরই ধারক। জয়দেব-ঘরনী পদ্মাবতী কুমারী জীবনে প্রখ্যাত নটী ছিলেন ব'লে জানা যায়, তাঁর সঙ্গীতের খ্যাতিও ছিল খুব। লাউ-এর খোল্ এবং বাঁশের ডাঁট্ বা দণ্ডে তার লাগিয়ে বীণা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত ক'রে গ্রামে-গ্রামান্তরে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ানোর কথাও রয়েছে চর্যাপদে। ডোম্বী বা অন্যান্য নীচ জাতীয় নৃত্যগীত পটিয়সী রমনীদের সামাজিক নীতিবন্ধন অনেকটা চঞ্চল এবং শিথিল ছিল বলেই মনে হয়। তারা অনেকসময় উচ্চ কোটির পুরুষদের মনোহরণেও সমর্থ হতো এবং সাধকের সাধন-সঙ্গিনী হিসেবেও তাদের উল্লেখ আছে। উচ্ছলিত কাহ্নপাদ ডোম্বীকে বিয়ে ক'রে ভালো যৌতুক নিয়ে জাত খুইয়েছেন বলেও উল্লেখ আছে চর্যাপদে। জনকোলাহল ও বসতি থেকে দূরে পাহাড় টিলায় শবর-শবরীদের অরণ্য-আশ্রিত জীবনেও শবরী গুঞ্জা ফুলের মালা, ময়ূরের পাখা আর কানের কুণ্ডল দিয়ে নিজেকে নগ্ন-অঙ্গনার মতো সাজিয়ে তোলে। অরণ্যকন্যার এই অনুপম রূপ দেখে শবরপাদের মতো অনেকেই মুগ্ধ হ'তে হয়। বাংলাদেশের নানা জায়গাতেই এমন যাযাবর নিম্নকোটির নরনারীর দেখা মেলা আজও অসম্ভব নয়।

অন্ত্যজ বর্ণের যাযাবর ডোম-শবর-পুলিন্দ-নিষাদ-বেদে প্রভৃতিদেরই অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ-খেলানো, জাদুবিদ্যার নানা খেলা তথা ভোজবাজি দেখানো। ওঝা বা বিষবৈদ্যদের একটি শ্রেণি সাপখেলা দেখাতো, তারাই ছিল 'সাপুড়ে'। পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর লোকায়ত মৃৎ বা দারুশিল্পে মূলত দেবদেবীর মূর্তি ও সৌন্দর্য বোধের প্রেরণায় সপ্তম-অষ্টম শতকে প্রতিমা লক্ষণাক্রান্ত কিছু মুখ ও মুখের মতো রচনা বিন্যাসের সূত্র-সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তর-তক্ষণ বাংলাদেশে কম ছিল। মৃৎশিল্প ছিল। অবশ্য মগধী তক্ষণ শিল্পের শৈলীতে নির্মিত বিষ্ণুপ্রতিমা সহ কয়েকটি মূর্তি বর্ধমান জেলার বরাকরে পাওয়া গিয়েছিল, যা কিনা অষ্টম শতাব্দীর রচনা বলেই মনে করেছেন ঐতিহাসিকেরা। কাজেই অনুমান করা যায় যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো প্রাচীন বাংলাদেশেও অনেক বিহার-মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে নানান চিত্র আঁকা হতো। নীহাররঞ্জন রায় বাংলার চিত্রকলার প্রাচীনত্ব বিষয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীটিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি।

আজ আমরা যাদের বাঙালি ব'লে জানি, তারা সবাই কিন্তু একই নরগোষ্ঠীর মানুষ নন্। বিচিত্র নর্গোষ্ঠীর লোকের সমন্বয়েই বৃহৎ-বাঙালি-জনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশে বহুদিন পর্যন্ত মানুষ কোমবন্ধ গোষ্ঠী জীবনযাপন করেছে। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একান্তভাবে কৌমজীবন-কৌমচেতনা-কৌমসত্তা-কৌমস্মৃতি-কৌমসংস্কৃতিতে লালিত হ'য়ে এসে তাকে আর বর্জন ক'রে উঠতে পারেনি। তাই অন্তরে সেই বৈরাগীর-লাউ আজও বাজে। আবার পরবর্তী রাষ্ট্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই কৌমতন্ত্রই ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের রাজা-জমিদারেরা সেভাবেই পৃথক কৌম-অঞ্চলের জননায়ক-অধিনায়ক হ'য়ে উঠেছেন, যদিও তা একই সময়ে—একই সঙ্গে হয়নি। রাজতন্ত্রের পদানুসরণেই বাংলাদেশে এসে হাজির হয়েছে সামন্ততন্ত্র। আজকের যে হিন্দু সংস্কৃতি, তার অনেকটাই প্রাক্-আর্য বা অনার্য সংস্কৃতির ধারানুসারী। বাংলাদেশ ভারতের পূর্বপ্রত্যন্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম, এখানে আদিবাসী কৌমসমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রাবল্য ছিল প্রাচীনকাল হতেই বেশি। তাই আর্য-ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাকে বর্জন করা কখনোই সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি। ব্যাপকভাবে সে চেষ্টাও কখনো হয়েছে ব'লে মনে হয় না।

বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র ভারতেরই আবহমান কাল থেকেই প্রতিচ্ছবি। সেই তার বিশেষত্ব, সেই তার বৈচিত্র। তাই জঙ্গলভূমের মিলন মেলায় খুব স্পষ্ট করেই বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমাবধ্ধ অঞ্চলের সংস্কৃতি নয়। আবার আর্য কিংবা আদি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিও নয়, বাংলাদেশের সংস্কৃতিও নয়, বাংলাদেশের সংস্কৃতি 'সর্বজনগোষ্ঠীর' সংস্কৃতি। ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক 'মিলনের সংস্কৃতি'। মানুষের নিজেদের মধ্যে যখন শ্রেণিভেদ দেখা দিতে থাকে, তখন প্রকৃতির প্রতীকের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে একটি সীমারেখা টানার চেষ্টা করেছে মানুষ। সেই সীমা অবশ্যই বিভেদের সীমা। সেই প্রতীক হলো 'টোটেম'। তোমরা বাজপাখি, আমরা ময়ূর-পায়রা। তোমরা বাঘ, আমরা খরগোস-হরিণ, এইরকম অসংখ্য বৈষম্য। সেই বিভেদ-পার্থক্য থেকেই, 'টোটেম' বিশ্বাস থেকেই বর্ণবৈষম্য (caste) এসে প্রবেশ ক'রে গেল সংস্কৃতিতে (culture)। প্রকৃতি থেকে পার্থক্য এসে সংযুক্ত হলো সংস্কৃতিতে। এই বর্ণবিভেদগত সাংস্কৃতিক বৈষম্য এখনো বাংলাদেশে দেখা যায়, রাঢ়বঙ্গের জীবনবৃত্তে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই বাংলার সংস্কৃতি বলতেই বোঝায় 'বহুজনের-সংস্কৃতি'।

ঠিক্ একই কারণে ভারত সংস্কৃতির মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপ নির্মাণ অসম্ভব। বহু জাতি-উপজাতির দানে মিলনে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। তাই বাঙালি একজাতি ব'লে দাবী করলেও, বহু উপজাতি-জাতির রক্ত-কৌম-বর্ণ-সংস্কৃতির সার্বিক সম্মিলনেই সংমিশ্রণেই তার উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। জাতিশুদ্ধতা বিজ্ঞানীদের কাছে কল্পনা আর আত্মসন্তুষ্টি ভিন্ন আর কিছু নয়। সুতরাং বাংলার সংস্কৃতিকে 'মিশ্র-সংস্কৃতি' বা 'যৌগ-সংস্কৃতি' বলা যেতে পারে।

পশ্চিবঙ্গের জঙ্গলমহলে, বনময় গৈরিক মৃত্তিকা জুড়ে সুন্দরবন পর্যন্ত এলাকা ঘিরে বনদেবতার পুজোর প্রচলন ছিল। প্রাচীনকাল থেকে সেইসব বনদেবতার পুজো-উৎসবের

সঙ্গে স্থানীয় বনবাসী মানুষজনের সংযোগ ছিল প্রত্যক্ষ। এইসব উৎসব-পার্বন-ধ্যান-ধারণা-নিয়ম-আচার আর্য-বৈদিক নয়। উত্তর ও মধ্যভারত (আর্যাবর্ত) থেকে ধীরে ধীরে পূর্বভারতে আর্য-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে। আবার পূর্ব ভারতের বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলেই যে একই সঙ্গে এই ভিন্‌প্রদেশাগত সংস্কৃতি এসে হাজির হয়েছে, তাও নয়। উত্তর-বিহারের 'বিদেহ' বা মিথিলা অঞ্চলেই সর্বপ্রথম পূর্ব-ভারতের আর্য বসতি গড়ে ওঠে, সেখান থেকে বাসুদেবের পুন্ড্রবর্ধন তথা উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণ-বিহার তথা জরাসন্ধ রাজার মগধ দেশের ভেতর দিয়ে রাজা ভগদত্তের প্রাগ্‌জ্যোতিষ তথা অসম রাজ্যে আর্য-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। এরপর অরণ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাত ও সমন্বয়ের ফলেই ক্রমে একটি মেলবন্ধন গড়ে ওঠে বাংলার সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। পাটলিপুত্র তথা পাটনা থেকে নন্দবংশ ও মৌর্যবংশের রাজারা একসময় বঙ্গদেশও শাসন করেছেন। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী) উত্তরবঙ্গের পুন্ড্রজনদের 'দস্যু' বলা হয়েছে এবং 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ ও মগধ দেশের মানুষকে 'অসুর' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। বাঁকুড়া-বীরভূম জেলায় অসুর নামাঙ্কিত বহু গ্রামের সন্ধান আজও মেলে। অসুরগড়, বনঅসুরিয়া, কোটাসুর, অর্সুলা প্রভৃতি তেমনই উদাহরণ। সপ্তম (খ্রিস্টপূর্ব) শতাব্দীর আগে কোনোভাবেই বঙ্গদেশ আর্যসান্নিধ্য লাভ করেনি বলেই অনুমান। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে লেখা 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে' বঙ্গদেশকে আর্যবহির্ভূত উপেক্ষিত অঞ্চল বলেই গণ্য করা হয়েছে। আসলে, বাংলায় আর্যীকরণ দীর্ঘকাল সম্ভব হয়নি। সেখানেও আবার উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অনেক পরে পশ্চিম ও দক্ষিণ-বঙ্গে আর্যীকরণ আরম্ভ হয়েছে বলেই মনে করেন 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের গ্রন্থকার বিনয় ঘোষ।

বাংলায় আর্যসংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে অনার্য সংস্কৃতির বা অরণ্যসংস্কৃতির একটা সুদীর্ঘ ঐতিহ্যময় অধ্যায় ছিল। ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগণার বিস্তৃত বঙ্গের পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে সম্ভবত আদি-অস্ট্রেলিয় (Proto-Australoid) বা নিষাদ জাতির বিভিন্ন শাখা-সমূহের সাংস্কৃতিক আধিপত্য ছিল। শিকার-পশুপালন-সামান্য কৃষি ছিল এই সংস্কৃতির প্রাণ। শিকার ও পশুপালনের ঐতিহ্য আজও পশ্চিমবঙ্গের উপজাতিদের মধ্যে জীবন্ত। এই কারণেই তারা কখনো 'পাখমারা', কখনো 'শিয়ালমারা' নামে বিবেচিত। এখনো 'শিকার উৎসব' সাঁওতালদের একটি বড়ো 'পরব' বা উৎসব। আবার আর্যসংস্কৃতির প্রসার বঙ্গদেশে ঘটলেও জঙ্গলমহলগুলি বহুদিনই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো রয়ে গেছে, অনার্য রাজারাই সেখানে আধিপত্য করেছে। 'জঙ্গল-মহল' বলতে বাঁকুড়া-বীরভূম-পুরুলিয়া-বর্ধমান—উভয় মেদিনীপুর—হুগলি-দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কথা অবশ্যই বলা যায়। স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীপতিরা কখনো-সখনো সামান্য আনুগত্যের বিনিময়েও নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সেকারণেই বাংলায় অনার্য-সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন মেলে। বনবিবি চণ্ডি-ভৈরব-মনসা-গাজন- শিব-দক্ষিণারায়-কালুরায়-কুদ্রা-বড়ম প্রভৃতি বনদেবতা আব লোকদেবতাদের উৎসব-অনুষ্ঠান আজও বাংলার অন্যতম লোকোৎসব। 'বাগ্‌দিরাজা', 'গোপরাজা' একদিন এ অঞ্চলেই রাজত্ব করেছে। বৃক্ষ-জন্তু-পক্ষিপুজোও অনার্য-আশ্রিতই।

পরবর্তী পর্যায়ে এই জঙ্গলমহলের বহু আদিবাসীন্দা অরণ্য-জঙ্গল পাহাড়ের অভাবে এবং অত্যধিক মানুষের চাপে দূরদেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। সবাই গিয়েছে এমনও নয়। আবার কেউ কেউ ফিরে এসেছে এটাও সম্ভব। আসলে যাযাবরত্ব যাদের রক্তে তাদেরকে একজায়গায় থিতু ক'রে রাখাও অসম্ভব।

বীরভূমের লাভপুর থানার হাতিয়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিষয়পুর গ্রামের তিরিশ-বত্রিশ ঘর মানুষ নিজেদের পরিচয় দেয় 'ব্যাধ' হিসেবে। আগে নামের উপাধি 'ব্যাধ'ই লিখ্‌তো, এখন তিনপুরুষ থেকে লিখ্‌ছে 'চৌধুরী'। অবশ্য বন্ধনীর মধ্যে আজও 'ব্যাধ' লিখে তপশীল জাতি'উপজাতির তক্‌মা বজায় রেখেছে। বহুরূপী দেখানো ওদের পুরুষানুক্রমিক পেশা। তবে আগে ওদের অনেকেই জরি-বুটি-তাবিজ-খুপি বিক্রি করেছে, ধনেশ পাখি-বাঁদর-ভালুক নিয়ে খেলা দেখিয়েছে। ওদের প্রাচীনেরা বলেন—শ্রীকৃষ্ণের নাকি ওদের পূর্বপুরুষের তীরেই মৃত্যু হয়েছে। শিকারজীবী-যাযাবর জনগোষ্ঠী হয়তো কখনো সমতলে এসে জীবিকার সন্ধান খুঁজে পেয়েছে। চেহারার ছাঁদ দেখে মনে হয় ওরা কোনো মঙ্গল জাতীয় জনগোষ্ঠী তথা 'কিরাত' জন। হিমালয়ের সানু-অঞ্চলে কিরাত-কিন্নর-গান্ধর্ব জনগোষ্ঠী আজও রয়ে গেছে। বিষয়পুর গ্রামের মানুষেরা ওই বহুরূপীদের পাড়াটিকে এখনও 'পাখ্‌মারাদের পাড়া' হিসেবেই গণ্য ক'রে থাকে। পাখি মারা থেকেই যে 'পাখ্‌মারা' শব্দটি এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ-ই নেই। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে আর-ডি-হাইম লাভপুর থানার বিবরণে হিন্দু-সমাজের অন্ত্যজ ব'লে এই থানার ৩,৬১৮টি পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে মাত্র তিনটি পরিবার তখন ছিল 'ব্যাধ' পর্যায়ভুক্ত। বীরভূমে 'ব্যাধ' সম্প্রদায়ভুক্ত জনজাতির বাস রয়েছে ইলামবাজারের দেবীপুর, নানুরের খুজুটিপাড়া, নলহাটির সরধা, ময়ূরেশ্বরের ষাটপলশা প্রভৃতি অঞ্চলে। এরা নিজেদের 'কাশ্যপ' গোত্রের লোক মনে করে। এদের মৃতদেহ ময়ূরাক্ষী নদীতে দাহ এবং অস্থি বিসর্জিত হয়, কোথাও কোথাও কবর দেওয়ার প্রথাও রয়েছে।

লাভপুর থানায় আর একটি গ্রাম আছে, বর্তমানে তার নাম 'শীতলগ্রাম'। রাজা শ্যামল বর্মার সময়ে এবং হরিবর্মার সময়ে এই গ্রামের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। রাজা ভোজ বর্মার 'বেলাব-লিপি'তে উত্তর-রাঢ়ের এই সিদ্ধল > সিধল > শীতল গ্রামের উল্লেখ আছে। এই গ্রাম-ই পণ্ডিত-মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের জন্মভূমি। অজলা-জঙ্গলময় এই অঞ্চলের কথা ভট্ট-ভবদের তাঁর 'ভুবনেশ্বর লিপি'তে উল্লেখ করেছেন। ভবদেবের বাবার নাম গোবর্ধন, মা-সাঙ্গোকা। বর্মনরাজ হরিবর্মার এবং তার পুত্র শ্যামল বর্মারও তিনি মহাসন্ধি-বিগ্রহিক-মন্ত্রী ছিলেন ভবদেব। যুগন্ধর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং বৌদ্ধধর্ম বিরোধী ভবদেব এলাকায় বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি কয়েকটি শাস্ত্রের বইও লিখেছিলেন এবং কৃষি কাজে জল সেচনের জন্য বড় বড় দিঘি খনন করিয়েছিলেন। লাভপুরের ফুল্লরাতলার কাছে 'দেবিদহ' তাঁর উজ্জ্বল ও অক্ষয় কীর্তি। এই ভবদেব-ই উৎকল বা ওড়িশা থেকে রাজার গুপ্তচর বৃত্তির কাজে লাগানোর জন্য বাজিকর বা বাজকরদের এনেছিলেন। এরা দিনের বেলায় খেলা দেখিয়ে, এদের মেয়েরা হাবু দেখিয়ে নানান খবর নিয়ে আসতো দেশের। তারপর তা ভবদেবের মাধ্যমে রাজার কাছে পৌঁছে যেতো। রাজা সচেতন হবার সুযোগ পেতেন। এই

যাযাবর জনগোষ্ঠী একদা আরণ্যক-ই ছিল। পাখি শিকার ছিল তখন তাদের অন্যতম উপজীবিকা। তাই তারা 'পাখমারা' নামেই সর্বত্র পরিচিত। শীতল গ্রামের কাছেই বিশাল লাঙ্গলহাটার বিল, একসময় সেখানে নানান পাখির মেলা বসতো। সেই পাখিদের টানেই এবং ভবদেবের আমন্ত্রণে ওদের পূর্বপুরুষদের একটি গোষ্ঠী এখানে এসে থেকেই গেছে। তাদের আর বেরিয়ে পড়া সম্ভবপর হয়নি। এরা কৃষিকাজে আগ্রহী নয়। পাখি শিকার আর ভোজবাজি দেখানোই এদের কাজ। এরা শরৎকালে দুর্গাপুজো ক'রে, দুর্গা প্রতিমায় এদের 'অসুর' থাকে না। এদের গোত্র, ওরা বলে 'কাশ্যপ'। স্বগোত্রেই এদের বিয়ে হয়। মৃতদেহ আগে কবর দেবার নিয়ম থাকলেও এখন দাহ-ই করা হয়। দুর্গাপুজো ভিন্ন এরা বিরাট প্রস্তরময় শিব-লিঙ্গেরও পুজো ক'রে থাকে। এদের জাতিগত পরিচয় সেভাবে নির্দ্ধারিত না হলেও এরা যে উপজাতিয় বেদিয়া যাযাবর সম্প্রদায় সে সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই।

শীতল গ্রামেই একমাত্র এই বাজিকর তথা বাজকরেরা থাকে। 'বীরভূম বিবরণে' এই গ্রামে তিনটি রাজপরিবারের অবস্থানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। হরিবর্মা, ভোজবর্মা এবং শ্যামল বর্মা। এই ভোজবর্মার কন্যাই নাকি কিংবদন্তীর ইতিহাস প্রসিধ্বা 'ভানুমতী'। এই ভানুমতীরই বিয়ে হয়েছিল মঙ্গলকোটের রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে। ভানুমতী ছিলেন সুখ্যাত জাদুকরী। তাই আজও তাঁকে স্মরণ করেই নাকি শীতলগ্রামের হাবু গায়িকারা জয় দেয়, দোহায় পাড়ে। জাদুর নাম-ও সেই থেকেই নাকি 'ভানুমতীর খেল্'। শীতলগ্রামের সম্মানিত জাদুকর শশাঙ্ক বাজিকরের স্ত্রী রূপবতী অশীতিপর বৃধ্বা, তাদের ছেলে উত্তম বাজিকর ভোজবাজি দেখানোর ফাঁকে বহুরূপীও সাজতেন। এই বাজিকর সম্প্রদায়ের আরও দু'একজন বহুরূপী সাজে। কৃষ্ণবর্ণ আর খর্বাকৃতি চেহারার মানুষ এই বাজিকর সম্প্রদায়টি শীতলগ্রামে এখন ধুঁক্‌ছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এদের নিয়ে 'বাজিকর' গল্প লিখেছেন। বয়স্কদের মুখে জানা যায় এক সময় ৩৫-৪০ ঘর বাজিকর থাকতো এখানে, এখন তা ৬-৮ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন ওদের পুরুষদের সংখ্যা মাত্র ১৫ জন। প্রায় জনই যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। এদের বংশেরই পূর্বপুরুষ ভাণ্ডর বাজিকর নাকি শত্রু নিধনের জন্য 'বিষকন্যা' তৈরি করেছিলেন। সেই বিষকন্যার সংস্পর্শে এসে নাকি এক কামুক উচ্ছৃঙ্খল রাজার মৃত্যুও হয়েছিল!

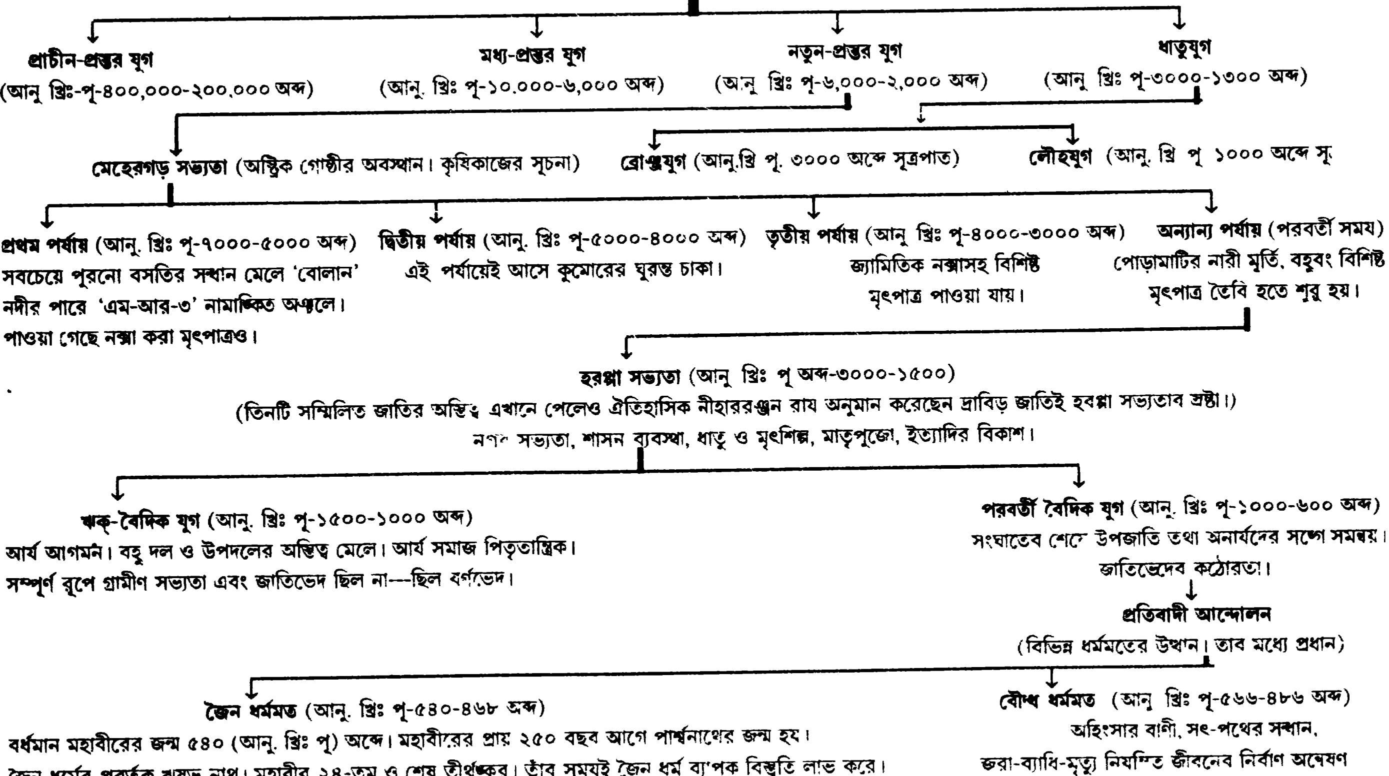
এই যাযাবর শ্রেণির 'বেদিয়া > বেদে' এবং 'ব্যাধ' সম্প্রদায় প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড গোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত। ভারতের এবং বাংলা দেশেরও বিভিন্ন স্থানে এরা সাপুড়ে-বেদে-পাখ্‌মারা-শিয়ালমারা-বেদিয়া-বাইদ্যা-ব্যাধ-বাজিকর প্রভৃতি জাতি নামে পরিচিত।

ইংল্যান্ড-জিপসী, ফ্রান্সে-গিতম, সরাজিন, সুর, স্পেনে-গীতানো, ইটালিতে-জিঙ্গাবো, জার্মানীতে-জাইগুনায়, গ্রীসে-গাপ্তোস, প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এদের বিভিন্ন নাম। নিরক্ষর ভবঘুরে এই 'বেদিয়া' সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা সাপ খেলা যেমন দেখায়, তেমনই-শিকড়-মাদুলি-তাবিজ-কবচ-মালিশ তেল-জড়ি-বুটি-পাথর ইত্যাদি বিক্রীও ক'রে থাকে। কোথাও কোথাও বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজের সঙ্গেও এদের জড়িয়ে পড়ার খবরও পাওয়া যায়। তামিলনাড়ুতে 'ইরুলা' উপজাতির মানুষেরাই শ্রেষ্ঠ সাপুড়ে হয়। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি-

বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-মেদিনীপুর-২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। উভয় ২৪-পরগণা জেলাতেও বেদে-ওঝাদের বসতি বেশি। এরা কোথাও বেশিদিন থেকে বাসা বাঁধে না সাধারণত, তবে বারুইপুরে এবং বহরমপুরে বেশ কয়েক ঘর বেদে-বহুরূপী-ব্যাধেরা পাকা বাড়ি বানিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। বেদেদের মধ্যে বহু মুসলমান-ও রয়েছে। ওঝা-গুনিন এখনো আদিবাসী সমাজে সম্মানের যোগ্য জায়গায় রয়েছেন। অবশ্য পৃথিবীর অন্যত্রও ওঝাদের দেখা মেলে। উত্তর-আমেরিকায় 'চিয়েনি', দক্ষিণ-আমেরিকায় 'জিভারো', অস্ট্রেলিয়ায় 'আরন্টা', কানাডায় 'এস্কিমো', আফ্রিকায় 'নুয়ের', পেরুতে 'ইনকা' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ওঝাবৃত্তি দেখা যায়।

ভারতবর্ষে অবশ্য এই ওঝা যাযাবর-পাখমারা-বেদিয়া-ব্যাধদের মতো আদিবাসীদের অবস্থা কিন্তু মোটেও ভালো নয়। ওরা নিজেদের কালকেতু-ফুল্লরা-একলব্যের বংশধর হিসেবে প্রতিপন্ন করলেও, দিন্‌দিন্ সভ্যসমাজের অবজ্ঞা আর অর্থ ও অন্নাভাবে যথেষ্ট কষ্টের মধ্যেই দিনাতিপাত চলছে কায়ক্লেশে। ১৯৭৩ সালে পশুর চামড়া-বিষ-পশু নিয়ে খেলা দেখানো সব নিষিদ্ধ হ'য়ে গেছে। ভালুক-বাঁদর-সাপ-ধনেশপাখি নিয়ে খেলা দেখানো এবং টোট্‌কা চিকিৎসা তাই চল্‌লেও, খুব গোপনে পল্লি গ্রামেই চলে। অনেক সময় এইসব পশুপাখি হারিয়ে, পুলিশের ঝক্কি সামলে বাড়ি আসতে গিয়েও নিঃস্ব হ'তে হয়। কিন্তু পেট তো মানবে না, তাকে ভরানোর পথ ও পদ্ধতি সেভাবে এখনো আবিষ্কার ক'রে উঠতে পারেনি বাংলাদেশের এইসব যাযাবর সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা। তাই কোথাও কোথাও পেটের টানেই লিপ্ত হ'তে হচ্ছে অসামাজিক কাজকর্মে। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমাব বহু যাযাবর আদিবাসী-বহুরূপী-বেদিয়া-ব্যাধেরা কয়লার কালো ব্যবসাতেও ঢুকে পড়েছে এভাবেই। তারা অনেকেই আর 'বহুরূপী' সাজে না। যাযাবরত্বেও আর বিশ্বাস থাকছে না তাদের। অনেকেই ওই কয়লা তোলা ও চালানের কাজে যুক্ত হ'য়ে এখন পাকা বাড়িও ক'রে ফেলেছে। উন্নতি হয়েছে অবস্থারও ।

অভাবে স্বভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে নষ্ট হলেও, যাযাবব ব্যাধ বা বেদিয়া সম্প্রদায়ের বংশ-গৌরব কিন্তু যথেষ্টই উজ্জ্বল। কালকেতু-ফুল্লরায় কথা যেভাবে 'চণ্ডিমঙ্গল' কাব্যে লেখা হয়েছে, সেখানে আদর্শবাদ এবং চরিত্র গৌরবে চরিত্র দুটি যথেষ্ট উজ্জ্বল। একইভাবে ব্রাত্য একলব্য যেভাবে আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিয়েছে, তাতেও তার—ব্যাধ সমাজের চারিত্রিক-ঐশ্বর্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার সভ্যসমাজের অবহেলা-অবজ্ঞা যে কতো নগ্নভাবে একলব্যদের হজম করতে হয়েছে, তারও নিদর্শন রয়েছে মহাভারতেই। পশ্চিমবঙ্গের যে কয়েকটি জেলাতে এই ব্যাধ-যাযাবব-বেদিয়াদের দেখা মেলে, অতীত অনুসন্ধানে জানা যায় সেইসব এলাকা প্রাচীন যুগে তাদেরই বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেইসব জঙ্গল-মহল ক্রমশ মানুষের চাপে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে অরণ্যচারী জঙ্গলভূমের সত্যিকার বাসীন্দারা দূরে-পাহাড়ে জঙ্গলের টানে নিজেরাই চলে যায়। যারা থেকে যান, তারা জঙ্গলভূমে মিলনমেলার অংশীদার হ'য়ে কোথাও কোথাও নিজেদের জীবিকাও বদ্‌লে ফেলে দিব্যি সাধারণ হ'য়ে ওঠার চেষ্টায় মানুষের সমদ্রে মিশে যেতে থাকেন। অন্তত মিশে যাওয়ার চেষ্টা একটা থাকেই।


ভারতের আদিম সভ্যত
প্রাচীন-প্রস্তর যুগ
(আনু খ্রিঃ-পূ-৪০০,০০০-২০০,০০০ অব্দ)
মধ্য-প্রস্তর যুগ
(আনু. খ্রিঃ পূ-১০.০০০-৬,০০০ অব্দ)
নতুন-প্রস্তর যুগ
(আনু খ্রিঃ পূ-৬,০০০-২,০০০ অব্দ)
ধাতুযুগ
(আনু খ্রিঃ পূ-৩০০০-১৩০০ অব্দ)
মেহেরগড় সভ্যতা (অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অবস্থান। কৃষিকাজের সূচনা)
ব্রোঞ্জযুগ (আনু.খ্রি পূ. ৩০০০ অব্দে সূত্রপাত)
লৌহযুগ (আনু. খ্রি পূ ১০০০ অব্দে সূ
প্রথম পর্যায় (আনু. খ্রিঃ পূ-৭০০০-৫০০০ অব্দ)
সবচেয়ে পুরনো বসতির সন্ধান মেলে 'বোলান'
নদীর পারে 'এম-আর-৩' নামাঙ্কিত অঞ্চলে।
পাওয়া গেছে নক্সা করা মৃৎপাত্রও।
দ্বিতীয় পর্যায় (আনু. খ্রিঃ পূ-৫০০০-৪০০০ অব্দ)
এই পর্যায়েই আসে কুমোরের ঘুরন্ত চাকা।
তৃতীয় পর্যায় (আনু খ্রিঃ পূ-৪০০০-৩০০০ অব্দ)
জ্যামিতিক নক্সাসহ বিশিষ্ট
মৃৎপাত্র পাওয়া যায়।
অন্যান্য পর্যায় (পরবর্তী সময়)
পোড়ামাটির নারী মূর্তি, বহুবং বিশিষ্ট
মৃৎপাত্র তৈরি হতে শুরু হয়।
হরপ্পা সভ্যতা (আনু খ্রিঃ পূ অব্দ-৩০০০-১৫০০)
(তিনটি সম্মিলিত জাতির অস্তিত্ব এখানে পেলেও ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেছেন দ্রাবিড় জাতিই হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা।)
নগর সভ্যতা, শাসন ব্যবস্থা, ধাতু ও মৃৎশিল্প, মাতৃপুজো, ইত্যাদির বিকাশ।
ঋক্-বৈদিক যুগ (আনু. খ্রিঃ পূ-১৫০০-১০০০ অব্দ)
আর্য আগমন। বহু দল ও উপদলের অস্তিত্ব মেলে। আর্য সমাজ পিতৃতান্ত্রিক।
সম্পূর্ণ রূপে গ্রামীণ সভ্যতা এবং জাতিভেদ ছিল না—ছিল বর্ণভেদ।
পরবর্তী বৈদিক যুগ (আনু. খ্রিঃ পূ-১০০০-৬০০ অব্দ)
সংঘাতের শেষে উপজাতি তথা অনার্যদের সঙ্গে সমন্বয়।
জাতিভেদের কঠোরতা।
প্রতিবাদী আন্দোলন
(বিভিন্ন ধর্মমতের উত্থান। তার মধ্যে প্রধান)
জৈন ধর্মমত (আনু. খ্রিঃ পূ-৫৪০-৪৬৮ অব্দ)
বর্ধমান মহাবীরের জন্ম ৫৪০ (আনু. খ্রিঃ পূ) অব্দে। মহাবীরের প্রায় ২৫০ বছর আগে পার্শ্বনাথের জন্ম হয়।
জৈন ধর্মের প্রবর্তক ঋষভ নাথ। মহাবীর ২৪-তম ও শেষ তীর্থঙ্কর। তাঁর সময়ই জৈন ধর্ম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।
বৌদ্ধ ধর্মমত (আনু খ্রিঃ পূ-৫৬৬-৪৮৬ অব্দ)
অহিংসার বাণী, সৎ-পথের সন্ধান,
জরা-ব্যাধি-মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত জীবনের নির্বাণ অন্বেষণ

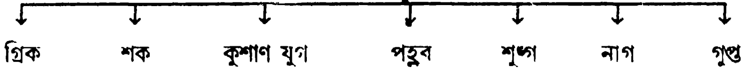
মৌর্য সাম্রাজ্য

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (আনু. খ্রিঃ পূ. অব্দ-৩২৪-৩০০)

এই চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। সেলুকাসের দূত হিসেবে এই রাজার রাজসভাতেই আসেন গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস। চন্দ্রগুপ্তের প্রধান পরামর্শদাতা চানক্যপণ্ডিত 'কৌটিল্য' নাম দিয়ে 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন। মগধের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর তার ছেলে বিন্দুসার (৩০০-২৭৩ খ্রি. পূ.) এবং তাঁর পর তাঁর দ্বিতীয় ছেলে অশোক (২৭৩-২৩২ খ্রি. পূ.) রাজা হ'য়ে ব'সে রাজত্ব করেন। অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন্।

মৌর্য সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগ

খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে গ্রিক আক্রমণ। নানান আঞ্চলিক দলের উদ্ভব।



গ্রিক | শক | কুশাণ যুগ (৬৫—৭৮ খ্রিঃ আনুঃ) | পহ্লব | শুঙ্গ | নাগ | গুপ্ত

কুশানরা ছিল মধ্য-এশিয়ার 'ইউ-চি' নামক যাযাবর জাতির একটি শাখা।



কণিষ্কের কাল (৭৮—১০২ খ্রিস্টাব্দ)

৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি 'শকাব্দ' নামক গণনাবর্ষ চালু করেন। এই সময়ই গান্ধার শিল্প গড়ে ওঠে।



সাতবাহন রাজবংশ (১০৬—১৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

প্রতিষ্ঠাতা-শিমুক। বিভিন্ন বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প এবং পাথর ও পাহাড় কেটে গুহা-শিল্পের নির্মাণ ও অগ্রগতি এই রাজবংশেরই অমূল্য কীর্তি। পুরাণ গ্রন্থের সম্পাদনা। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী (১৬৫—১৯৪ খ্রিঃ)-র মৃত্যুর পরই সাতবাহন রাজ্যের পতন ঘটে।



অন্ধকার যুগ



গুপ্ত রাজবংশ (৩২০—৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ)

প্রতিষ্ঠাতা-শ্রীগুপ্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (আনুঃ ৩৭৬—৪১৩ খ্রিঃ) চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন। স্কন্ধ গুপ্তের রাজত্বকালে (৪৫৫-৪৬৭ খ্রিঃ) দুর্ধর্ষ হূনজাতি ভারত আক্রমণ করে (৪৫৮খ্রিঃ)।



গুপ্ত বংশের অবক্ষয়।

আঞ্চলিক শক্তির আত্মপ্রকাশ। পুনরায় হূনদের ভারত আক্রমণ এবং তোরমান ও তার ছেলে মিহিরকুলের রাজ্যলাভ।



শশাঙ্করাজ (৬০৬ খ্রিস্টাব্দের আগে : গুপ্ত অধিনতা ছিন্ন ক'রে)

শশাঙ্ক ছিলেন বাংলার প্রথম সার্বভৌম রাজা (রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে)। তাঁর রাজধানী ছিল কর্নসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলায়)। হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে।

হর্ষবর্ধনের সময়কালেই চিনা পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙ (৬৩০—৬৪৩ খ্রিঃ) ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যু হয় ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে। য়ুয়ান-চোয়াঙ শশাঙ্ককে বৌদ্ধ ধর্মের 'শত্রু ও সংহারক' বলে বর্ণনা করেছেন। জীবদ্দশায় শশাঙ্ক স্বাধীন ছিলেন ব'লেই অনুমান। শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয় ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে।



বিশৃঙ্খল বাংলা (শতবর্ষের বেশি সময়)



পাল রাজবংশ (৭৫০—১১৩০ খ্রিস্টাব্দ)

সূচনা—গোপাল। অবসানে—রাম পাল (১০৮৪—১১৩০)



গজনীর সুলতান মামুদ (১০০০—১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে)

১৭বার ভারত আক্রমণ করেন এবং লুণ্ঠন চালান।



সেন রাজবংশ (১০৯৫—১২৬০ খ্রিস্টাব্দ)

প্রবর্তক, হেমন্ত সেনের ছেলে বিজয় সেন (১০৯৫—১১৫৮)। লক্ষ্মণ সেনের আমলে (১১৭৯—১২০৫ খ্রিঃ) সম্ভবত ১২০২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি আক্রমণ হয় বাংলা ও নদিয়ার উপরে।



সুলতানি আমল (১২০৪—১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বখতিয়ার উত্তর বঙ্গের দেবকোটে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। ইসলামি প্রভাবের বিস্তার ঘটে।

সুলতান বংশ (১২০৬—১২৯০),

খলজি বংশ (১২৯০—১৩২০),

তুঘলক বংশ (১৩২০—১৪১৩),

সৈয়দ বংশ (১৪১৪—১৪৫১)।



লোদি বংশ (১৪৫১—১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ)



হোসেন শাহ'র আমল (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রিঃ)

আসামের 'হাজো' পর্যন্ত ভূভাগ তিনি দখল করেন। ১৪৮৬তে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীচৈতন্যদেব।



মোগল যুগ (১৫২৬—১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ)

গৌরবময় যুগ (১৫২৬—'৩৯ ও ১৫৫৪—'৮৫ খ্রিঃ) আফগান শাসক ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত ক'রে বাবর ভারতে মোগল যুগের সূচনা করেন। আকবর (১৫৫৬—১৬০৫ খ্রিঃ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ নবাব। ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮—১৭০৭ খ্রিঃ)-এর সময়ই রাজপুতদের শত্রুতা

বৃদ্ধি পায়। ইংরেজদের বাণিজ্য শুরু। ফারুক শিয়ার বিনা শুল্কে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র বার্ষিক ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার দেন।



মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। ঔরঙ্গজেবের পৌত্র নবাব আজিম-উস্-শানের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বাঁধে। ঔরঙ্গজেবের অনুমতি ও অনুগ্রহ পুষ্ট হ'য়ে তিনি দেওয়ানী বিভাগ ঢাকা থেকে মুক্সুদাবাদে (মুর্শিদাবাদে) নিয়ে আসেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার সুবাদার (নবাব) পদে উন্নীত হন।



নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭১৭—'২৭ খ্রিঃ) মুর্শিদাবাদে বাংলার শাসক।

নবাব সুজাউদ্দিন (১৭২৭—'৩৯ খ্রিঃ),

সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯—'৪০ খ্রিঃ),

আলিবর্দি (১৭৪০--'৫৬ খ্রিঃ),

সিরাজ-উদ্-দৌলা (১৭৫৬—১৭৫৭ খ্রিঃ) কর্তৃক ৪ জুন ১৭৫৬ কাশিমবাজারে ইংরেজকুঠি দখল।

২৩শে জুন, ১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ। সিরাজকে খুন করা হয় ২রা জুলাই ১৭৫৭।

মীরজাফর ইত্যাদির পর নবাব মীরকাসিম (১৭৬০—'৬৪ খ্রিঃ) ১৭৬৪খ্রিঃ বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে পলাতক হন।



ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভ, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলায় ইংরেজ শক্তির অভ্যুত্থান।

১৮৮৫—১৯০৫ স্বদেশি আন্দোলন।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।



ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (১৭৬৫—১৯৪৭ খ্রিঃ)

ইংরেজ যুগ

১৮০৪ 'ফরাজী' ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা। ১৭৬৩—১৮০০ খ্রিঃ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ।

১৮৩১ খ্রিঃ কোল বিদ্রোহ। সিংভূম-মানভূম-ছোটনাগপুরের আদিম উপজাতি 'কোল'রা 'হো'-'মুন্ডা'-'ওঁরাও' প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫—'৫৬ খ্রিঃ) রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীরা বীরভূম পর্যন্ত এসেছিল।

'চুয়াড় বিদ্রোহ' ১৭৬৯—'৯৯ খ্রিঃ, মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল-মহলের আদিবাসী সম্প্রদায়। চাষবাস-পশু শিকার-যুদ্ধ ছিল তাদের পেশা। সাধারণত মেদিনীপুর-বাঁকুড়া ও ধলভূমের স্থানীয় জমিদারদের অধীনে চুয়াড়েরা রক্ষী বা পাইকের কাজ করতো।



স্বাধীন যুগ (১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ অগস্ট থেকে)

প্রাচীন সাহিত্যে অ-সুর সংস্কৃতি

কিরাত-অসুর-রাক্ষস প্রভৃতি শ্রেণি চরিত্রের কথা প্রায় সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যেরই অন্যতম উপাদান। গীতা-চণ্ডী-ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এই গোষ্ঠীর মানুষজন এসেছেন আপনার উজ্জ্বল অস্তিত্ব নিয়েই। তবে লেখকেরা প্রায় সর্বত্রই এদের প্রতি করেছেন অবিচার। ন্যায়-সত্য ও দুর্বলতার প্রতি সবসময়ই তাঁদের প্রশ্রয় থেকে গেছে। একারণেই নিয়তি-তাড়িত চরিত্রের ভিড় জমেছে সমগ্র মধ্যযুগ জুড়েই। শ্রধা-ভক্তির ব্যাপারটিও উৎকোচের মতো এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। যথার্থ শক্তিমানকে সঠিক গুরুত্ব না দিয়ে লেখকেরা ভক্তিমানের প্রতি সদয় থেকেছেন সবসময়। আর ঠিক্ এরই কারণে চরিত্রগুলির সর্বাংশে মানবায়ন আসেনি, তারা অনেক সময়ই পুতুল অথবা ঈশ্বর-দেবতা হ'য়ে উঠেছেন, যথার্থ মানুষ হ'য়ে উঠ্তে পারেননি। তীর-ধনুক সম্বল ক'রে রামের, রাবণ-মহাবীরকে পরাজিত করার ক্ষেত্রটিও অনেকটাই দেবতা-নির্ভর। আসলে সমস্তের ভেতরই আর্যদের বিজয়গাথা রচনা করার একটা চেষ্টা দেখা যায়। যদিও সাঁওতালি-সাহিত্য এবং বহু সমীক্ষক-ই এখন আব আর্যদেরকে বাইরে থেকে আসা মানুষজন ব'লে গ্রহণ করেন না। বীর কালকেতু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অবশ্য প্রবল শক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও দেবতা-নির্ভর, দেবীর আশ্রয়ে প্রশ্রয়পুষ্ট। এখানেও ব্যাধ জনগণকে একটু উঁচুতে, অন্তত সামাজিক প্রতিষ্ঠার সমগোত্রে আসন ক'রে দেওয়ার একটি চেষ্টা আছে। সম্মিলন-ই সে চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য বলেই মনে হয়। এমন উদাহবণ অবশ্য সংস্কৃত ও প্রাচীন সাহিত্যে অনেক। তবে কোনো ক্ষেত্রেই আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে এ মেলবন্ধন ঘটেছে ব'লে মনে হয় না। সেখানে দৈহিক-কায়িক-শ্রমসাধ্য শক্তির কাছেই পরাজিত হ'য়ে বা পরাজিত হবার আশংকাতেই ব্যাধ-অসুর-রাক্ষসদের কাছে অত্যন্ত কপটতার ছলেই মিলনের নাটক করা হয়েছে। অন্তত মধ্যযুগ পর্যন্ত তাই হয়েছে। তখনও দেবতা-পুতুল-ঐশ্বর্য-অহংকার এদের ভিত্তিতেই জাতির ভিত্তি প্রস্তরটি নির্মিত হয়েছে। আর্য বা উন্নতর দাবীদারদের হাতে যে সমস্ত সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছে, তার সবখানেই এই অসুর-রাক্ষস-কিরাতদের পরাজয় দেখানোই লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের নির্মাণে অন্যরা অনার্য, অচ্ছুৎ, অসুর, রাক্ষস, ব্যাধ, যাযাবর, ...অনেক কিছু।

'গীতা'র ষোড়শ অধ্যায়ে দেবাসুর সম্পদ বিভাগের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই পৃথিবীর সংসার জীবনের গূঢ়-রহস্য কথা বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন—'এই সংসারে দুই প্রকৃতির মানুষ আছে। এক প্রকার মানুষ দেবপ্রকৃতি সম্পন্ন, অন্যপ্রকার অসুর প্রকৃতির।' কিন্তু অসুর প্রকৃতির সব মানুষই যে হীন বা নীচ অথবা পরিত্যজ্য হিসেবে বিবেচিত, এমন বলার বা ধ'বে নেওয়ার তো কোনো কারণ নেই। কিন্তু দীর্ঘকাল সেই মতোই অবিচার চলে

আসছে ওই শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিত 'অসুর' বা সুর (দেবতা) বহির্ভূত আমজনতার উপরে। অথচ তারাই এই অচল পৃথিবীর রথটিকে টেনে টেনে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে, অগ্রগতির দিকে। এই বঞ্চনার কারণেই হয়তো চিরকাল ধরেই চলে আসছে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ কথা। দেবতারা যেমন অসুরদের গ্রহণ করতে পারেনি, তেমনি একইভাবে অসুরেরাও আন্তরিক বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে কোনোদিনই দেবতাদের বরণ করেনি। এটিই তো স্বাভাবিক। তাই তাদের তথা দেবাসুরের যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব কথা প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন-সাহিত্যের সর্বত্র।

তথাপি 'দেবাসুর' কথাটি প্রচলিত ছিলই। দেবতারা অন্য গ্রহের জীব ব'লে কিন্তু আমাদের কোনো বিশ্বাস নেই। হয়তো এক সময় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রাই নিজেদের উঁচু-আর্য-শিক্ষিত-দেব হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, আর অন্যদের তথা শূদ্র-বৈশ্যদের নীচু-অনার্য-অশিক্ষিত-অসুর হিসেবেই দেখতে বিবেচনা করতে ভালোবেসেছিলেন। তাই বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র রাবণ শুধুমাত্র মাতুলদোষে রাক্ষস-অসুর হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। মাতা নিকষা ছিল নাকি রাক্ষস। যে কারণে রাবণ মহাযোগী তথা আর্য রামের অকালবোধনের দেবিপুজোয় শ্রেষ্ঠ পুরোহিত হয়েও সে ছিল রাক্ষস, মায়াবী, দশানন। কোথাও যে একটা 'চালাকি' ছিল তাতে কোনো সন্দেহই নেই। আসলে আমার মনে হয়েছে এই-ই হলো দেবাসুর, উঁচু-নীচু, আর্য-অনার্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রভৃতি রূপকল্পগুলির আত্মীক মেলবন্ধন। কারণ উৎসমূলে তো বাইবেলের কথানুসারে আদম আর ঈভ্ ভিন্ন কেউ ছিল না। তবে অবশ্যই উন্নত সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগেছে কোথাও একটু আগে আর কোথাও একটু পরে। তাই 'দেবাসুর'-কে বাদ দিয়ে ভাবতে পারেনি প্রাচীন সাহিত্যের লেখককুল।

'চণ্ডী'তে প্রথম অধ্যায় 'মধুকৈটভ বধ' বিবরণে একটি সুন্দর কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে। সেখানে রাজা সুরথ, যাঁর রাজধানী ছিল 'কোলা' তিনি যবনরাজ কর্তৃক পরাভূত হ'য়ে ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়ার জন্য এক বনের মধ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে দেখতে পান সুন্দর একটি আশ্রম। পরে জেনেছিলেন এই অতি রমনীয় আশ্রমটি মেধস মুনির। সেখানেই সর্বস্বান্ত বণিক সমাধির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। দু'জনেই তখন নিঃস্ব, দু'জনেই ভাগ্য-বিড়ম্বিত। দু'জনেই রাজ্য সংসার থেকে বিতাড়িত। ঠিক্ এই অবস্থায় মেধস মুনির স্মরণাপন্ন হ'লে তিনি তাঁদের মহামায়ার আরাধনা করতে নির্দেশ দেন। দু'জনেই সমস্বরে তখন মহামায়ার পরিচয় জিজ্ঞেস করেছেন মেধস মুনিকে। তিনিও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ঋষি বলেছেন—তিনি নিত্যা, তাঁহার জন্মাদি কিছুই নেই, তথাপি তাঁর লীলা ও রূপ আছে। প্রলয়কালে পৃথিবী যখন জলময়, তখন কারনার্ণবে ভাসমান বিষ্ণুর কর্ণমল হ'তে মধু ও কৈটভ নামে দু'জন পরাক্রান্ত অসুর উৎপন্ন হ'য়ে দেবতাদের অহেতুক উৎপীড়ন করতে থাকে। সেইসময় দেবতারা অসুর বধের জন্য মহাদেবী মহামায়ার আরাধনা করেছিলেন। পরে বিষ্ণু নিজের জংঘাদেশে জলশূন্য জায়গায় অসুরদ্বয়কে নিধন করেন।

পুরাকালে মহিষাসুর নামে এক দৈত্যও ইন্দ্রত্ব কেড়ে নিয়েছিল দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে। পরে সিংহের কাঁধে চেপে জগন্মোহিনী শক্তিমূর্তি দেবী মহামায়া দুর্গা সেই অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অসংখ্য অসুরের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁর দশটি হাতে দশজন দেবতাব দশ রকমের অস্ত্র ছিল। মহিষাসুরও দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমে

মহিষাকার, তারপর সিংহাকার, তারও পর মহাগজাকার এবং অবশেষে আবার মহিষরূপ ধারণ ক'রে যুদ্ধ করেছিলেন। মায়াবী অসুর মহিষাসুর দেবীর সঙ্গে মহাযুদ্ধ ক'রে অবশেষে মর্ত্যধামে দেবীর সঙ্গে দেবীরই পদতলে ব'সে পুজো পাচ্ছেন মর্ত্যবাসীর। 'চণ্ডী' বলেছে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে মহিষাসুরের মৃত্যু হয়েছিল। অবশ্যই পরাজিত হয়েছিলেন মহিষাসুর। কিন্তু সেই অসুর যদি এতটাই অধম হ'য়ে থাকে, তাহলে মহাদেবী দুর্গার সন্নিবেশিত মাতৃমূর্তির মাঝে তাঁর স্থান হলো কেন? দেবী প্রতিমার আটচালিতে অসুর কিন্তু নিজস্ব অস্তিত্বেই বর্তমান। আর এই মূর্তির পরিকল্পনা কোনোভাবেই অনার্যদের করা নয়। তবে একটি সূত্র এখান থেকেই স্পষ্ট যে, দেবতা এবং অসুরেরা উভয়েই রূপ বদলে পারদর্শী ছিলেন। বহুরূপে যেমন মহাদেবী মাহামায়া দুর্গার কল্পনা করেছে 'চণ্ডী', তেমনই অসুরদেরও বলা হয়েছে 'মায়াবী অসুর'। বহুরূপ ধারণে মহিষাসুরকে যথেষ্টই দক্ষ দেখানো হয়েছে। আবার দেবাসুরের মেলবন্ধনেই সার্বজনীন দুর্গা প্রতিমার মূর্তি কল্পিত হয়েছে আর্যদের চিন্তা ও চেতনাতেই। তাই দেবাসুরের এক সঙ্গেই ঠাঁয় হয়েছে সেখানে।

পুরাকালের শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দু'জন দৈত্যের কথাও বলা হয়েছে চণ্ডীতেই। তারাও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কেড়ে নিয়ে স্বর্গ-রাজ্য দখল করেছিলেন। সেখানেও মহাদেবী মহামায়া যুদ্ধ ক'রে চণ্ড-মুণ্ড-শুম্ভ-নিশুম্ভকে পরাজিত এবং নিহত করেই রক্ষা করেছিলেন দেবতাদের। দেবী নারী কিন্তু মহাশক্তি রূপিনী। যিনি কিনা মহাশক্তিধর অসুরদেরও অনায়াসে পরাজিত এবং নিহত করতে পারেন। সেখানে এটি তো স্পষ্ট হয় যে, দেবতারা অসুরদের চেয়ে বেশ দুর্বল জাতি এবং তাঁরা অসুর-নিধনের জন্য মহামায়ার স্মরণাপন্ন হন। আবার মহামায়া একক ক্ষমতায় অসুরদের অনেক সময়ই নিধন করতে পারেন না, তাঁকে মহিষাসুরকে বধ করার জন্য দশপ্রহরণ ধারণ করতে হয় এবং মায়া ও ছলনার আশ্রয়ও নিতে হয়। তাহলে বহুরূপ গ্রহণ পুরাকাল হতেই চলে আসছে। দৈত্য-অসুর-রাক্ষসেরাও মায়াবী ছিলেন। আসলে এই অর্জিত বিদ্যাটি উভয়েরই প্রয়োজন সাধন করেছে, এটি কারো একক সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি।

'রামায়ণ' 'মহাভারতের' যুগেও এমন দেবাসুর, আর্য-অনার্য, উঁচু-নীচু, ক্ষত্রিয়-শূদ্রের দ্বন্দ্ব বেঁধেছে এবং সম্মিলনও ঘটেছে। এই সংঘাত ও সমন্বয়কথাই মানুষের কথা। ক্রমশ এক পংক্তিতে উঠে আসার অস্পষ্ট দরোজা। রম্ভাসুরের ছেলে মহিষাসুর যেমন পিতামহ ব্রহ্মার বরে দেবতা-দানব-মানব সবার অবধ্য হ'য়ে উঠেছিলেন, তেমনই পেয়েছিলেন 'বহুরূপ' গ্রহণের ক্ষমতাও। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সৃজিত দেবী দুর্গা মহামায়াও 'বহুরূপ' গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন সময়। দেবতারাই অসুরদের বরদান করছেন, আবার তাদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর পথও তৈরি ক'রে দিচ্ছেন। আসলে শক্তিধর অসুর-রাক্ষস-দৈত্যদের পরাজিত করতে কৌশল-চালাকি-বহুরূপ ধারন করেছেন দেবতারা। ইন্দ্রও ছলনা করেই মহিষাসুরের বাবা রম্ভাসুরকে মেরেছিলেন। একারণেই চণ্ডীতে মহিষাসুর দেবতাদের 'কাপুরুষ' পর্যন্ত বলেছেন। দেবতারাও আবার নাচ-গান বেশ ভালোবাসতেন, তাঁদের উর্বশী-রম্ভা-মেনকা ইত্যাদি নর্তকীরা মনোরঞ্জন করতেন। মহিষাসুর পর্যন্ত তাঁদের দুর্বলতার কারণে স্বর্গ ছাড়াও করেছেন। তখন 'বহুরূপ' ধারণে সক্ষম নারী দুর্গা-মহামায়াকে আবাহন জানানো হয়েছে, তাঁর দশটি হাতে দেবতাদের তেজঃদীপ্ত দশটি অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। মোট কথা

একত্রিত করা হয়েছে শক্তিকে। **একতাবদ্ধ শক্তির আরাধনাই দুর্গার আরাধনা, সে ভিন্ন অশুভ-অসুরকে পরাজিতও করা যায় না।** আবার মানুষের মনের মধ্যেই শুভ-অশুভ তথা দেবাসুরকে কল্পনা করা হয়ে থাকে। এই মনের অসুরকে নাশ করার জন্য অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। আর তাকে নাশ না করতে পারলে মানুষের উন্নতি নেই। মা দুর্গার দশ হাতে অস্ত্র সেই সম্মিলিত শক্তিরই প্রতীক, বহুরূপের সংযুক্তিতে অপরূপ এক রূপ-কল্পনা। 'রামায়ণে' রাবণেরও দশটি মাথা ছিলো, তাই সে দশানন। প্রত্যেকটি প্রতীকের আড়ালে বহুরূপ গ্রহণের একটি প্রয়োজনের কথা প্রাচীন সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে যথাযোগ্যভাবেই মর্যাদা পেয়ে এসেছে। তাহলে প্রাথমিকভাবে এমন ভাবলে মন্দ হয় না, মানুষের দুটি শ্রেণিই ছিল বহু বহু প্রাচীনযুগে—১. দেবগুণ বিশিষ্ট মানুষ, ২, অসুরগুণ বিশিষ্ট মানুষ। উভয়ক্ষেত্রেই দোষ ও গুণের সমাহারে তাঁরা তৈরি। তাই দোষেগুণে তারা মানুষ।

বীরপুজোর উৎস লুকিয়ে আছে মানব সভ্যতার ইতিহাসের গহনে। নানা দেশেই উপাসিতা হয়েছে মাতৃকাদেবী। আমাদের সিংহবাহিনী অসুরনাশিনী দেবী দুর্গার সঙ্গে নানা অস্ত্রে ভূষিতা মেসোপটেমিয়ার দেবী 'ইশতার' অনেক মিল আছে। আমাদের দেশে সিন্ধু সভ্যতার সিলমোহরেও মহিষমর্দিনী রূপে শক্তি দেবীর ছবি পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের শ্রীসূক্ত বা ব্রাহ্মণই হোক, দেবী বিভিন্ন নামে ও রূপে পূজিতা হয়েছেন সর্বত্র। আর্য উপাসনায় মিশেছে অনার্য উপাসনা। যার জট রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণেও ছড়ানো। তথাপি যে মহাপুরাণে দেবীর কথা বর্ণিত হয়েছে, তা হলো 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'। মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'চণ্ডী' অংশটিই দুর্গাপুজোর মূল ভিত্তি, অসুর নাশের অন্যতম উদ্ভাবন। বাঙালি সুরথ রাজার গল্প ব'লে আপনার একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি হিসেবে অসুরনাশিনীকে বিবেচনা করলেও, অন্যপ্রদেশে মহিষাসুরমর্দিনীর পুজোর চল্ দেখে বাঙালি-সংস্কৃতির প্রভাব ধরলেও সুরথের রাজ্য কোল বা কোলা কিন্তু কলকাতা বা বাংলায় নয়। অবশ্য ঘরের মেয়ের ঘরে ফেরার গল্পটি কিন্তু একান্তভাবে বাঙালিরই। কর্ণাটকের কোলাপুরি, কেলহাপুর বা কলুর-ই সম্ভবত কোল বা কোলা (আ. বা. প. ১২-১০-'০৫), দাক্ষিণাত্যের এইসব জায়গাতেই আছে মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দির। এইসব অঞ্চলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসুর হননের কাহিনিও, এমনকী মহিষাসুর হননের কাহিনিও আছে। মহীশূর শহরে এখনো দাঁড়িয়ে আছে মহিষাসুরের প্রকাণ্ড মূর্তি, জনমানসের বিশ্বাস—মহিষাসুর থেকেই মহীশূর শহরের নামটি এসেছে। তামিলনাড়ুর আমানকুড়িতে নাকি দেবী মহিষাসুরকে নিধনের পর পাপ স্খালনের জন্য স্নান করেছিলেন। কেরলে আছে 'শবরী' মন্দির, মহিষাসুরের বোন শীলা দাদার মৃত্যুর পর দেবতাদের প্রতি প্রতিহিংসায় নাকি এই স্থানেই প্রতিশোধের চেষ্টা করেছিল।

অসুরনাশিনী দেবী দুর্গার পুজোর সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য। শাক্তদের উপপুবাণ অনুসারে পাল বা সেন রাজাদের আমলেও এমন পুজোর প্রচলন ছিল, মুসলমান আমলেও চল্‌তো এমন পুজো, তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ এবং নদিয়ার ভবানন্দ মজুমদার-ও দেবী পুজোর সঙ্গে জড়িত। অন্নদামঙ্গল ও মনসামঙ্গলেও দেবীকথা আছে। তবে ইংরেজ আমলে 'বাবু'দের কলকাতায় দুর্গাপুজো ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়োৎসব পালনের জন্য পায়রা উড়িয়ে, বাজি পুড়িয়ে, প্রসাদ ছড়িয়ে

দুর্গাপুজো হয়েছিল। ১৭৫৭-তে শুরু হয়েছে শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো। তখন মূলত রাজারাজড়া এবং বড় বড় জমিদারেরাই এই পুজো করতেন। পরে পুজোর চরিত্র বদল হলো। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে হুগলির গুপ্তিপাড়ায় শুরু হয়েছিল বারো-ইয়ারি বা বারোয়ারি দুর্গাপুজো, যার রকমফের হলো সার্বজনীন পুজোগুলি। মেধস মুনির বলা গল্পে মহিষাসুর সর্বত্র গুরুত্ব পেয়েছে। সার্বিকভাবে শুম্ভ-নিশুম্ভ-রক্তবীজ সেখানে অবহেলিত হলেও কালীপুজোয় তাদের গুরুত্ব আছে যথেষ্ট। আসলে বার্ধক্যের বারাণসীতে শ্মশানভূমির কাছাকাছি এসেই আর্য বা উন্নতরা অনার্য বা অনুন্নতদের কাছাকাছি আসতে এবং সঙ্গে নিতে বাধ্য হয়েছে। ঘরের মেয়ে উমার শ্বশুরালয় হ'তে পিতৃ গৃহে ফেরার গল্প যেমন বাঙালির নিজস্ব, তেমনি তার পুজোর আড়ালেও লুকিয়ে আছে রসদ বা ফসল সংগ্রহের আনন্দ। 'অকালবোধন কথা' হয়তো রবি ফসলের তুলনায় খরিফ ফসলের আপেক্ষিক প্রাধান্য। যেখানে শ্রমজীবী কৃষিজীবী মানুষেরই জয়গান গীত হয়েছে নিধন কথার আড়ালে।

মহাভারতের*আদি পর্বে মা কুন্তি সহ ছ'জন যখন অজ্ঞাতবাস কালে এক বটবৃক্ষের নীচে ঘুমিয়েছিলেন আর পাহারা দিচ্ছিলেন ভীম। সেই এলাকাটি ছিল হিড়িম্ব রাক্ষসের। দাদার মুখে পঞ্চপাণ্ডব এবং বিশেষভাবে ভীমের বর্ণনা শুনে বোন হিড়িম্বা সেখানে গিয়ে ভীমকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। ভীমের সুন্দর বলশালী রূপে দেখে হিড়িম্বা তাঁকে মনে মনে স্বামীত্বে বরণ ক'রে নিয়ে পালিয়ে যাবার কথা বলে। রাক্ষসী হিড়িম্বা তখন রাক্ষসরূপ পরিত্যাগ ক'রে দিব্যরূপা-নিতম্বিনী-সুন্দরী কামিনীর রূপ গ্রহণ করেছিল। তারপব বোন হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের আলাপ দেখে হিড়িম্ব রাক্ষস ঝাঁপিয়ে পড়ে ভীমের উপর, যুদ্ধে ভীম হিড়িম্বকে বধ করে এবং কুন্তির নির্দেশে হিড়িম্বাকে বিয়েও করে। ভীম-হিড়িম্বার সন্তানই ঘটোৎকচ। বিয়ের পর হিড়িম্বা ভীমের সঙ্গে নানান জায়গায় ভ্রমণ করেছিল এবং নানান লোভনীয় মূর্তি ধ'রে ভীমের সঙ্গে রমনে নিযুক্ত হয়েছিল। আবার সেখান থেকে তপস্বী-ব্রাহ্মণ-নারী প্রভৃতি রূপসজ্জা ক'রে পাণ্ডবেরা চলেও গিয়েছিল দূরে, বনে-বনান্তরে।

রাক্ষস আর অসুর সমতুল। হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের অসবর্ণ বিয়েই হয়েছিল। যা আর্য সমাজ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। তবে এও আর্যীকরণেরই একটি নমুনা। বহুরূপ গ্রহণ এখানে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গেই স্বীকৃত।

মহাভারতের আদিপর্বেই রয়েছে—

তবে একদিন তথা দ্রোণ-গুরু-স্থানে।
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে ॥
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম ॥
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমাব সদন ॥
দ্রোণ বলিলেন তুই হোস্ নিচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি ॥

—মহাভারত ॥ আদিপর্ব ॥ কাশীরাম দাস

এর পরের ঘটনা বেশ মর্মান্তিক। অপমানিত একলব্য নিষাদের বেশ ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ ক'রে মাটি দিয়ে নির্মিত দ্রোণ-মূর্তির সামনে অস্ত্রশিক্ষা করতে লাগলো। তারপর বনের মধ্যে মৃগয়ায় এসে ধ্যান ভঙ্গকারী কুকুরের মুখে স্তব্ধবান মারা দেখে পঞ্চপাণ্ডবরা বিস্মিত হয়েছে, অর্জুনের অহংকারেও আঘাত লেগেছে অনেকটাই। তারপর যখন অর্জুন জানতে পেরেছেন এই ব্রহ্মচারীরূপী একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন দ্রোণাচার্য নিজেই। তখন দ্রোণের কাছে গিয়ে অর্জুন জানিয়েছে সেই যদি তার শ্রেষ্ঠ শিষ্য হয় তাহলে এই 'স্তব্ধবাণ' শিক্ষা তার হয়নি কেন? দ্রোণাচার্যও অবাক হ'য়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং আপনার মৃত্তিকামূর্তি দর্শনের পর চাতুরির আশ্রয় নিয়ে নিষাদ একলব্যকে গুরুদক্ষিণা দেবার ছলনায় তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে নিয়েছে। এতে একলব্যকে শর নিক্ষেপে নিশ্চয়ই অর্জুনের থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে নীচে। তথাপি ব্যাধ একলব্যের মহানুভবতা এবং শরসংযোগের ক্ষমতা এর মধ্যেই প্রতিভাত। দ্রোণাদি আর্যপ্রতিভূর অনার্যদের প্রতি অবিচার কথাও এরই মধ্যে স্পষ্ট, প্রতিভাত।

আবার হরিণীযূথের মধ্যে মৃগরূপী ঋষিকুমার যখন শৃঙ্গারে মত্ত ছিল, তখন কুন্তি ও মাদ্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে ভ্রমণে এসে পাণ্ডুরাজা সেই মৃগরূপী ঋষিকুমারকে শরাঘাতে বধ করেছিল। এই ঋষিকুমারই পাণ্ডুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, 'মৈথুন সময়ে হবে তোমার মরণ'। বলা বাহুল্য পাণ্ডুর জীবনে তাই-ই ঘটেছিল। বহুরূপ গ্রহণের প্রবণতা সারা মহাভারত জুড়েই প্রশ্রয় পেয়েছে। যদিও আপনাদের নিজস্ব প্রয়োজনেই তারা বহুরূপ পরিগ্রহ করেছে সবখানে, তথাপি তারই ভেতর রয়ে গেছে বহুরূপীর জন্মবীজ। হিমালয়ে শিবের ধ্যানরত অর্জুনের সামনে এসেছিলেন কিরাত এবং কিরাত গৃহিনীর রূপ ধারণ ক'রে শিব আর দুর্গা, যুদ্ধ শেষে দিয়েছিলেন 'পাশুপত' অস্ত্র। 'বনপর্বে' আবার ব্যাধের কথা এসেছে। বনের মধ্যে নল বিহীন দময়ন্তী যখন এক বিশাল সাপের সামনে পড়েছিল, তখন এক ব্যাধ তীর দিয়ে সাপকে মেরে সুন্দরী দময়ন্তীকে রক্ষা করেছিল। পরে সুন্দরী দময়ন্তীকে দেখে তার কামভাব জাগে এবং সে দময়ন্তীকে নাকি ধরতে যায়। ফল ফলেছিল অন্যরকম। সুন্দরী সতী দময়ন্তীর অভিশাপে সেই ব্যাধ ভস্ম হ'য়ে গিয়েছিল। ব্যাধ-কিরাতদের এমন অজস্র উদাহরণ মেলে সারা মহাভারত জুড়েই। সুরাসুরের দ্বন্দ্বে মোহিনী রূপ ধারণ ক'রে অমৃতভাগ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ম, সেই মোহিনীরূপী হরিই মিলিত হয়েছিলেন হরের সঙ্গে। অসুরদের প্রতি বঞ্চনার কথাও বড়ো কম নেই এই মহাগ্রন্থে। সুভদ্রারও গান্ধর্ব বিবাহ হয়েছে এই গ্রন্থেই। নাগকন্যা উলুপির সঙ্গেও বিয়ে হয়েছে আর্যতনয় অর্জুনের। কৌরব্য নাগের কন্যা উলুপি নাকি গঙ্গায় তর্পন করার সময়ই কামের বশে অর্জুনকে ধরেছিল। উলুপির প্রার্থনা ছিল অর্জুনের ঔরসে একটি পুত্র সন্তান। নাগকন্যা উলুপির সে প্রার্থনা পূরণ করেছিল অর্জুন। এভাবেই সম্ভবত আর্যায়ন ঘটে গেছে সর্বত্র। আর্যীকরণের মাধ্যমেই রাক্ষস-অসুর-নাগ সব উঠে এসেছে, তাদের সংস্কৃতিও স্পর্শ করেছে আর্যসংস্কৃতির আঙন। 'উদ্যোগপর্বে'ই কশ্যপনন্দন নামুচি দানবকে ইন্দ্রের বৈমাত্র ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছে মহাভারত। তপস্যায় সফল হ'য়ে এই নামুচিই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণ করেছিল এবং দেবরাজকে পরাজিত করে অমরাবতীর দখল নিয়েছিল। দেবতা এবং দানব সেদিনও ছিল পাশাপাশি। গুরু গৌতমের

স্ত্রীকে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের ছদ্মবেশে সম্ভোগ করেছিল, এই কু-কর্মের কথা বৃত্রাসুর উচ্চস্বরে বলেছে গদাপর্বে এবং ইন্দ্রের হাতেই গদার আঘাতে তার মৃত্যুও হয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রের বহুরূপ গ্রহণের কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে সর্বত্র। নানারূপ ধারণের ক্ষমতা ধর্মপরায়ণ পরম বৈষ্ণব বৃত্রাসুরেরও ছিল। আসলে রূপ বদলের অধিকার সুরাসুর আর্যানার্য দেবদানব উভয়েরই ছিল। উভয়েই নিজস্ব প্রয়োজনে রূপ বদল করেছে, তথাপি মায়াবি-নিশাচর-বহুরূপী বলা হয়েছে শুধু অসুর-রাক্ষস-নাগ-দৈত্য-দানব-অনার্যদেরকেই। বহুরূপ ধারণ তখন পর্যন্ত বিবেচিত হয়েছে একটি কৌশল হিসেবেই।

মহাভারতের সর্বনিয়ন্তা যে, সৃজন-পালন যার কটাক্ষের খেলা মাত্র, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজের যদুবংশ নিঃশেষে ক্ষয় ক'রে প্রভাস তীর্থের তীরে একটি গাছের শাখায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর একটি পা শাখা থেকে ঝুলছিল নীচে। এমন সময় জরা ব্যাধ সেখানে আসে এবং হরিণ মারার দিব্য শরাঘাতে বিদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের চরণ। এরপর দিব্যকান্তি শ্রীকৃষ্ণ নেমে এলে জরা ব্যাধ তার অপরাধ স্বীকার করে এবং ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করতে থাকে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন---তোমার কোনো দোষ নয়, রাম অবতারে বিনা দোষে বালিকে বধ ক'রে আমি সুগ্রীবে রাজা করেছিলাম, তখন তুমি ছিলে বালির কুমার অঙ্গদ। সেই সময় সীতা উদ্ধারের পর আমি নিজেই তোমাকে বর দিয়েছিলাম তোমার প্রার্থনা মতো পিতৃশত্রুকে হত্যার। সেই প্রয়োজনের ফলেই ব্যাধকুলে তোমার জন্ম এবং সত্য পালনের জন্যই তোমার উপলক্ষ্যে আমার মৃত্যু। মহাভারতের 'মুষলপর্বে' এই মর্মে কাশীরাম দাস লিখেছেন---

সৃজন করেন যিনি, বিনাশ করেন তিনি,
তাঁর লীলা বুঝা বড় ভার।
মৃত্যু নাহি আছে যাঁর, জরা হস্তে মৃত্যু তাঁর,
কাশী কহে সৌভাগ্য জরার ॥

বর্ধমান জেলার ফরিদপুরের বহুরূপী চমৎকার ব্যাধ আমাকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন'তাঁরা কৃষ্ণ হন্তা জরা ব্যাধেরই বংশধর'। আবার বহরমপুরের সুদাম ব্যাধ এবং সাঁইথিয়ার রতন বহুরূপী নিজেদের একলব্যের বংশধর বলেই বিবেচনা করে। ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর এলাকার নেতারহাটের পাখুড়িয়া অঞ্চলে বসবাসকারী একটি সম্প্রদায় আজও নিজেদের 'অসুর' পদবিতে পরিচয় দেন, নদিয়া জেলাতেও এদের অস্তিত্ব আছে। তবে 'অসুর' শব্দটি 'হীন' বিবেচিত হওয়ায় অনেকে পদবি বদলেও ফেলছেন। বেদে খুব সামান্য কয়েকবার 'বেদ-বিদ্বেষী' অর্থে 'অসুর' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও প্রশংসাসূচক অর্থে 'অসুর' শব্দের ব্যবহার রয়েছে শতাধিকবার। অসুরেরা অবশ্যই কোনো শক্তিশালী অনার্যজাতি। রাক্ষসেরাও তার অন্যথা নয়। রামের বাহন ও সহকারী বানরেরাও অনার্য। সব মিলিয়ে প্রাচীন ভূ-খণ্ডটির অনেকখানিই শাসিত ছিল অনার্যদের দ্বারাই। পরে পরে তার আর্যায়ন হয়েছে, ক্ষমতা কমে এসেছে কোথাও কোথাও অনার্যদের। কিন্তু একথা সত্য যে মায়াবলে বলীয়ান ছিল দেবতাদের মতো অসুরেরাও, আর্যদের মতো অনার্যরাও। বরং বলা ভালো সেই বহুরূপ গ্রহণের ক্ষমতা হয়তো কোথাও কোথাও দেব বলেই অসুরদের বেশি, অনার্যদেরও আয়ত্বাধীন।

অমৃতের ভাগ নিয়ে সুরাসুরের দ্বন্দ্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মোহিনীরূপ ধারণ করেছিলেন এবং ছলনা করেছিলেন অসুরদের। ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ রূপবতী মোহিনীর মূর্তিতে তিনি যখন সুধা বণ্টনের দায়িত্ব নেন, তখন তাঁকে দেখে অসুরেরা মুগ্ধ হয়েছিল। এতে দোষের কিছু নেই। কারণ শিব নিজেও কামান্ধ হ'য়ে প্রার্থনা করেছিলেন সেই নারীকে, মোহিনীকে। পরে হরি ও হরের মিলনও হয়েছিল। অবশ্যই মোহিনীকে বিশ্বাস ক'রে ঠকেছিল অসুরেরা। অসুরদের চক্রান্ত করেই ঠকানো হয়েছিল। অমৃতের ভাগও দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে মায়াবী নিশাচরী হিড়িম্বা ভীমকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল এবং রূপসী কামিনীতে রূপান্তরিত হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা করেছিল ঠিকই, কিন্তু পরিবর্তে তাকে দাম দিতে হয়েছিল অনেক। দাদা হিড়িম্বকে বধ করেছিলেন ভীম। তারপর তাঁদের মিলন হয়েছিল, যার ফলে জন্ম হয়েছিল ঘটোৎকচের। আসলে আর্য-অনার্যের মিলনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতেই এমন অসবর্ণ বিবাহকে মেনে নিয়েছিল মহাভারত। মানুষের মানবত্ব ও মনুষ্যত্বকেই গুরুত্ব দিয়ে মধ্যযুগ এবং উত্তর-মধ্যযুগেব লেখক-কবিরা সম্মিলনের গান গাইতে প্রয়াসী হ'য়ে উঠেছিলেন। যার পরম পরিণতি ঘটেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। দ্বিজ চণ্ডীদাস সেই সূত্র ধরেই দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপবে নাই।'

রামায়ণ বা রামরসায়ণের 'অরণ্যকাণ্ডে' পঞ্চবটির মুনিরা রামকে জানিয়েছেন—এই বনে বহু রাক্ষস আছে এবং তারা মুনিদের সাধনভজনে বিঘ্ন ঘটায় আর নানান দুঃখ-কষ্ট দেয় মুনিঋষিদের। গন্ধর্ব কশেরু এক সময় দেবতাদের সভাতে নাচগান করতো। নর্তকী রম্ভাকে দেখে যেদিন তার কাম জেগেছিল, সেদিনই কুবের তাঁকে অভিশাপ দিযে রাক্ষস বানিয়ে দিয়েছিলেন। আবার রাক্ষসেরা যত দুষ্ট হিসেবেই কবিদের কলমে বর্ণিত হোক না কেন, পঞ্চবটি বনে বিরাধ নামের রাক্ষস সীতাকে কোলে নিয়ে রামকে নানান সুপরামর্শ দিয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা যে রাবণকে পরাজিত করার মানসে রামের অকালবোধন, মহাদেবী মহামায়ার অকালে আরাধনা, সেই দেবীপুজো ক'রে তাতে পূর্ণাহুতি দিয়েছেন রাবণ নিজেই। নিজের মৃত্যুও তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি পিছন দিকে। এ আত্মদানে অসুর-রাক্ষস রাবণের গৌরবই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভীষণ পুত্র তরণীসেনের রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দৃশ্যটিও অপূব সম্প্রীতির মেলবন্ধনে ধ'রে দিয়েছেন বাঙালি কবি কৃত্তিবাস। তরণীসেনের পোশাকে-পাতাকায়-বথে সর্বত্র 'রামনাম' লেখা, প্রথম শরাঘাতেও রামের চরণে পুষ্প আর পুষ্পমাল্যের সমাহার। এসবের মধ্য দিয়ে বিরোধ নয়, বিভেদ-বিভাজনের মধ্য দিয়ে বাজন্যপ্রীতি-দেশপ্রেম জ্যেষ্ঠজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যেমন প্রকাশিত হয় তেমনই স্বজাতিপ্রীতি এবং আপনার নিজস্বতা অস্তিত্ববোধও প্রকটিত হ'তে পাবে। বলা বাহুল্য রাম-রাবণের যুদ্ধকথা তেমনই চিত্র ও চিত্রকল্পের সামনে পাঠককে হাজির করে। রাবণ নাকি সীতাকে লক্ষ্মী ভেবেই জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন অশোক বনে, তাঁকে অসম্মানের কথা কৃত্তিবাস কোথাও বলেননি। লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা চেয়েই তিনি নররূপী নারায়ণের নিকটস্থ হ'য়ে উঠতে চেয়েছিলেন : এমন বক্তব্য রামায়ণের কবিদের। সীতা যে শুদ্ধ ছিলেন, অগ্নি পরীক্ষার কালে সে সত্যও প্রমাণিত। কিন্তু রাক্ষস মারীচ যে সোনার হরিণ সেজে সীতা-রাম এবং লক্ষ্মণের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়েছিল, সে তথ্যের ভিত্তিভূমিতেই দাঁড়িয়ে আছে রাম-রাবণ কথা। আর্য রাম গুহক চণ্ডালে কোল দান

করেছেন এই রামায়ণেই। অহল্যা-উদ্ধারও হয়েছে। আবার সুগ্রীব-অঙ্গদ-হনুমান প্রভৃতি বানর সেনাদেব মাধ্যমেই রামচন্দ্র, বিভীষণের সহায়তায় প্রবল শক্তিধর রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত করতে পেরেছেন। রামায়ণের মাটিতেও আর্য-অনার্যের সম্মিলন গানই গীত হয়েছে বাঙালি কবির কণ্ঠে। উত্তরকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনেব কবি মধুসূদন প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যে—অনার্য-অসুরেরাই ছিল আর্যদের চেয়ে শক্তিবান এবং কোথাও কোথাও উন্নতও। মধুসূদন দত্তের মানসপুত্র ইন্দ্রজিৎ এই সমস্ত সমস্যার সমাধান একাই ক'রে দিয়েছেন এই অমূল্য কাব্যে।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি পুরাণাশ্রিত মঙ্গলকাব্যেও বহুরূপ গ্রহণের বহু কথা বিবৃত হয়েছে। পার্বতী-অন্নপূর্ণা সবাই রূপ বদল করেছেন এইসব কাব্যে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে পুজো প্রচারের কাহিনি-কথাই থেকে গেছে আড়ালে। তথাপি তারই মাধ্যমে মঙ্গলদেবতা তথা লৌকিক দেবদেবীর প্রথম চরণধ্বনি শোনা গেছে আর্যদের আঙনে। সবখানেই নাগ-ব্যাধ-বাগ্‌দি-বাউড়ি-মুচিদের কথা দিয়েই পূর্ণ হ'য়ে আছে মঙ্গলকাব্য, লৌকিক দেব ও দেবতার উৎসস্থল।

আর্যরা বাইরে থেকে আসুন আর নাই আসুন, নানান বিষয়েই তাঁরা ছিলেন অনার্যদের চেয়ে দুর্বল। কায়িক শ্রম ও শক্তির ক্ষেত্রে একথা এক'শ ভাগ সত্য। আর্যরা প্রথমেই তাদের বরণ ক'রে নেয়নি, ব্যাধ-বণিক-ব্রাহ্মণের মিলনও হয়েছে অনেক পরে। নানান কাজের ফাঁকে যখন আর্যরা উপলব্ধি কবেছেন যে, ওদের-অনার্যদের ছাড়া চলবেনা তখনই বাধ্য হ'য়ে মেনে নিয়েছেন। গল্প ফেঁদেছেন। মেলবন্ধনের কথা শুনিয়েছেন। সাহিত্য রচিত হয়েছে সেই মেলবন্ধনের সংস্কৃতিকে মূল্য দিয়েই। তা সে চাঁদবণিকের বাঁ-হাতের অবহেলার পুষ্পই হোক আর কালকেতু-লাউসেনের অসম শক্তির অর্জিত অধিকারই হোক। মানুষের থেকে মানুষকে খুব বেশিদিন পৃথক ক'রে—আলাদা ক'রে রাখা সম্ভব নয়। তবে পৃথক ক'রে রাখার রাজনীতি মানুষের সংস্কৃতিতে একেবারেই অমিল নয়। দেবাসুরের চক্রান্তের মতোই এখানেও চিরদিন সে চক্রান্ত চলে আসছে। তথাপি মানুষের অন্তবের অন্দর-মহলে যে বহুরূপীর বাস—তার মুখোশ-তার সাজপোশাক খুলে পড়লেই 'মানুষ' ভিন্ন আর কিছু নেই, আর কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার করাও যায় না। সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্নায় জারিত 'মানুষ', তা বৈ আর কিছু নেই, কখনোই আর কিছু ছিল না।

পাখ্‌মারাদের কথা

বসন্ত তলার খুবই কাছে ভাগীরথীর কিনারায় 'বাজারে' রাধার ঘাটে একসময় পাখি বিক্রি হতো, একটি লোকায়ত বাজার ছিল সেখানে। সেই জায়গাটিকে ভালোবেসেই লোকসংস্কৃতির গবেষক শক্তিনাথ ঝা বাসা পেতেছেন। এখন আর পাখির বাজার নেই, তবে জায়গাটি এখন অনেকটাই গঞ্জের মতোন হ'য়ে উঠেছে। বসবাসের লোকজনের মধ্যে মুসলমানদেরই সংখ্যাধিক্য এখানে। লোকায়ত বাজারটি উঠে গেলেও একটু চেষ্টা করলেই এখনো এখানের দোকান বা বাড়ি থেকে খেজুরগুড়-লবাত্-মাছ ধরার জাল-পাখি ধরার জাল-সাতনলা এসব অনায়াসেই সংগ্রহ করা যায়। বসন্ত তলায় এসে শক্তিনাথ ঝা-এর সঙ্গে দেখা না করার অর্থ বিগ্রহ না দেখে মন্দির দেখে ফিরে আসার মতোন। তিনি লোকসংস্কৃতির মানুষজনদের বিশেষ ক'রে বাউল-ফকিরদের নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা-ই শুধু ক'রে আসছেন না, দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে একজন সত্যিকারের সহমর্মী হ'য়ে উঠেছেন। এমন শক্তিনাথ ঝা পাখ্‌মারাদের জীবন নিয়ে-জীবনচর্যা নিয়ে বসন্ত তলার কথা বলতে গিয়ে একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপির অনুলিপি (জেরক্স) আমাকে দিয়েছিলেন, তাঁর লেখা সেই পাণ্ডুলিপিটি থেকে আমরা অনেক বিষয় জেনেছি। লেখাটি 'হুগলি জেলা সমাজ বিজ্ঞান সম্মেলনে' তিনি পাঠ করেছিলেন।

অতীতের অরণ্যচারী 'পাখমারা' জনগোষ্ঠী ক্রমশ অরণ্য কমে আসার ফলে বিভিন্ন নদীর তীরবর্তী জায়গায় বা রেল স্টেশনের ধারে বসতি গড়ে তুলেছিল। বর্তমানে ভাগীরথীর তীর বরাবর বহু জায়গাতেই এই সময় ব্যাধ অরণ্যজীবী মানুষজন থেকে গিয়েছেন। তবে তেমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। গোছানো-গাছানো নয় তাদের সংসার, তাদের ঘরবাড়ি। বর্ধমান-মুর্শিদাবাদের ভাগীরথীর তীরে বসন্ত তলায়, কালনায়, মিঠিপুর-রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গীপুরে, কাটোয়ায়, হুগলির বৈঁচিতে, তারকেশ্বর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়, দোমহানী-ফরিদপুর-বর্ধমান শহরে, বীরভূমের বিষয়পুর-ইলামবাজার-মহম্মদবাজার এলাকায়, উখ্‌রায় কোথাও কোথাও এই পাখমারা > পাখি মারা > পাখেরা > পাখ'রা পাড়ায় অতীতের সেই অরণ্যজীবীরা আজও রয়ে গেছেন। এই জনগোষ্ঠীর আদিম হাতিয়ার 'সাতনলা', সাতটি সরু সরু বিশেষ বাঁশের মাথায় মাথায় যোগ দিয়ে উপরেরটিতে একটি সুতীক্ষ্ণ ফলা লাগানো। খুব আস্তে আস্তে সেটি পাখির বসে থাকা ডালে নিয়ে গিয়ে অজান্তেই পেটে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও ফাঁদ, জাল, বিশেষ আঠা লাগানো 'আঠাকাটি' এসব দিয়ে এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা পশুপাখি ধরে, মারে। কতক নিজেরা খায়, কতক মাংস হিসেবে বা পোষার জন্য বিক্রি করে বাজারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামীণ লোকচিকিৎসকেরা ওষুধ-পাতির জন্য পশুপাখির হাড়, দেহাংশ, ডানা, নখ এসব কেনে এদের কাছ থেকে। সমাজে 'পাখমারা' যাযাবর হিসেবেই এই জনগোষ্ঠী পরিচিত। এই জনগোষ্ঠী বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অংশ হলেও

সেভাবে এদের কোনো বর্ণ ও জাত নেই, এরা যাযাবর হিসেবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহীত। হিন্দুদের যে বর্ণ ও জাতি-বিন্যাস সেখানেও এদের সেভাবে স্পষ্ট কোনো নাম নেই। এদের বৃত্তিটিও গৌণ এক বৃত্তি মাত্র। জেলা পর্যায়ের আদম-সুমারীর বিবরণীতেও তপশীল বা উপজাতি হিসেবে এদের অনেক জেলাতেই এখনো স্থান হ'য়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র বিষয়পুরের বহুরূপীরা বীরভূম জেলায় 'তপশীল' হ'য়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। 'পাখমারা' সম্প্রদায়ভুক্ত এই ছোট্ট জনগোষ্ঠীটির বৃত্তি আজও সরকারী দপ্তর ইত্যাদির হিসেবের বাইরেই। সুতরাং জাতি-গোষ্ঠী-বর্ণ-বৃত্তির বিচারে সমাজের মূলস্রোতের একেবারে দূর-প্রান্তেই এই প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর অবস্থান। তাই কারণে-অকারণে সমাজের মূলস্রোতের মানুষজনের সঙ্গে এদের সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেই চলেছে। তাদের ভেতরে এবং বাইরে তাই শুরু হ'য়ে গিয়েছে এক অন্তর্দেশীয় ভাঙন। ফলে কোথাও কোথাও নিজের আত্মপরিচয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন 'পাখ্‌মারা' জনগোষ্ঠীর মানুষজন। তারা নিজেদের পদবীও বদলে ফেল্‌ছেন দ্রুত। নিজেদের স্বাতন্ত্রও হারিয়ে যাচ্ছে তাতে। বৃহত্তর প্রতিষ্ঠিত পার্শ্বস্থ পরিবেশের সঙ্গে মিলে যাচ্ছেন তারা। অবশ্যই এই 'হওয়াটা' সব ক্ষেত্রে হচ্ছে না, যারা মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত হ'য়ে উঠ্‌ছেন তাদের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটছে। তারা আর থাকতে চাইছেনা নিজেদের সংস্কৃতি-পদবী ইত্যাদি নিয়ে। এ ঘটনা বসন্ত তলাতেও ঘটেছে।

'জাত' নিয়ে অশেষ যন্ত্রণা রয়েছে সমাজে। রিজলে (Risley H.H, Tribes and Castes of Bengal) তাঁর বইতে বলেছেন, চিড়িমার/মিরশিকারী (মিন্‌শিকারী?)পাখমারারা বেদেদেরই সাতটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এরা 'Possibly converted Bedias'। 'বেদে', 'বেদ', 'ব্যাধ' সেই অর্থে 'একই অঙ্গে নানা রূপ'-এর মতোন। পোষা পাখির ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে সজারু-ভালুক-বাঁদর ইত্যাদি পশু, শকুন-ডাহুক-পেঁচা-বাদুড়-পানকৌড়ি প্রভৃতি পাখি লোকচিকিৎসার জন্য তারা সংগ্রহ করে দিত। আবার আঠা দেওয়া বাঁশের লিলের (ছাল) ফাঁদ আর সাতনলা বা সাতনলি দিয়ে বেদিয়া > বেদেদের অন্য জনগোষ্ঠী সাপুড়িয়া বা শানদারেরাও পশুপাখি শিকার করতো। অন্যদিকে ছোটনাগপুর ব৷ বর্তমান ঝাড়খণ্ড এলাকার দ্রাবিড় বা সাঁওতালদের দল ছুট্‌ একটি গোষ্ঠী এখনো বেদিয়া বা বেদে ব'লে পরিচিত। কুর্মিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল। পূর্ববঙ্গের বেদেদের সঙ্গে তথাপি এদের অমিল-ই বেশি। ঝাড়খণ্ডের প্রান্তরেখায় অবস্থিত বীরভূমের রাজনগরে 'কলেন্দর' উপাধিধারী একটি জনগোষ্ঠী আজও ভালুক-বাঁদর নাচিয়ে আর জরি-বুটি-তাবিজ-খুপি বিক্রি করেই সংসার চালায়। তারা ধনেশ পাখিও নিয়ে যায় সঙ্গে। হাঙরের দাঁত, বাঘের ছাল, কুমিরের আঁশ, মাছের তেল এসব বিক্রি করে ওষুধ হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ারাও 'বেদে' > 'বেদিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত। 'বেদে' > 'বাইদ্যা'রা সাপও খেলায় এ বাংলায়। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম একটি পার্থক্যরেখা টানা রয়েছে জাতি ও বৃত্তিগতভাবে।

দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতি 'মালপাহাড়ি' জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে বীরভূম-মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান জেলায়। তবে তাদের ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজ পরিকল্পনার সঙ্গে 'পাখমারা'দের মিল বা সম্পর্ক নেই। মালপাহাড়িরাও পশুপাখি শিকার করে, তবে তা তীর-ধনুক দিয়ে। মুণ্ডা-ওঁরাও-সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীও তীরধনুকের মাধ্যমে পশুপাখি শিকার করে, কিন্তু

তাদের সঙ্গেও অনেকাংশেই আচার-আচরণে অমিল রয়েছে পাখমারাদের। ওই সমস্ত জাতির সঙ্গে পাখমাবাদেব বিবাহ কেন্দ্রিক কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। পাখমারা সম্প্রদায়ের প্রাচীন মানুষেরা নিজেদের বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগণার লোক বলে গণ্য ক'রে থাকেন এবং বর্ণনাও দেন। দেওঘর এলাকার শানদার (ধার দেয় যারা), শিলকোটা, সাহুকার প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যদের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও পাখমাবাদের কোনো সম্পর্ক সেভাবে গড়ে ওঠেনি। পাখমারারা নিজেদের মধ্যে একটি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, কিন্তু সে ভাষা হিন্দি-ভোজপুরী বা বাংলা নয়। তবে প্রায় প্রত্যেকেই বাংলা ভাষা জানে। বাড়িতে হিন্দু দেবদেবীর ছবি টাঙিয়ে রাখে। অনেকেরই বাড়িতে তুলসীমঞ্চও দেখেছি। তারা নিজেদের কুর্মি-গোপ-বৈষ্ণব বলে না, বলে 'ব্যাধ'। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেখ নিয়ে বৈষ্ণবও হয়েছেন কেউ কেউ। রাঢ় অঞ্চলের বিশেষভাবে মুর্শিদাবাদ জেলায় বেদেদের চারটি 'খুট' বা ভাগ আছে— ১. সাপুড়ে : এরা বাঁশি বাজিয়ে সাপ ধরে এবং নাচায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঁদরও নাচায়। ২. মাসকাটা : এরা ভালুক নাচায়, জরিবুটি সহ বাতের তেল দিয়ে চিকিৎসা করে। ৩. বাঁশিকাটা : বাঁশি বাজিয়ে বাঁদব নাচায় আর ধনেশ পাখিও দেখায় শুভ চিহ্ন হিসেবে। ৪. সাতনলি > সাতনল > সাতাল-পাখ্‌মাবা (সাঁওতাল নয় কিন্তু) : এরা সাতনল দিয়ে, ফাঁদ-জাল-আঠাকাঠি দিয়ে পাখি শিকাব করে। ইঁদুর-পাউশবিড়াল প্রভৃতিও ধবে। এসব ছাড়াও বিভিন্ন শহরের উপকণ্ঠে যাযাবর-বেদেরা মাঝে মাঝেই অস্থায়ীভাবে ছাউনি টাঙিয়ে মাসাধিককালও বসবাস করে। তারাও পাখি ধরে, বন্য ও মাঠের পশু শিকার করে, মধুও সংগ্রহ করে। এইসব যাযাবরদের সঙ্গেও কিন্তু পাখমাবাদেব ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ কোনো কিছুই মেলে না। বাংলার পাখমারাদের সঙ্গে এইসব যাযাবরদের কোনোরকম সম্পর্কও গড়ে উঠতে দেখিনি।

'পাখমারা' জনগোষ্ঠী নিজেদের 'ব্যাধ' বা 'বেদ' ব'লে উল্লেখ করে থাকে। তাদের আবার চারটি 'থাক্' বা বিভাগ— ১. জরাসন্ধ, ২. কালকেতু-ফুল্লরা, ৩. জঙ্গীপুরী, এবং ৪. দাঁইহাটি। একসময় ছিল যখন জঙ্গীপুরী এবং দাঁইহাটিদের জল-অচল ছিল জরাসন্ধ এবং কালকেতু-ফুল্লরা গোষ্ঠীব কাছে। এখন অবশ্য সবাই সবার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করে, সব গোষ্ঠীর মধ্যেই বিয়েসাদিও হয়। বহরমপুরের এই বাজারপাড়ার পাখমারাদের কেউ কেউ 'জরাসন্ধ' বা 'কালকেতু-ফুল্লরা' 'থাকে'র মানুষজন ব'লে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। মহাভারতে বৃহদ্রথের ছেলে জরাসন্ধ ছিলেন মগধের রাজা, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ-কালকেতু-ফুল্লরাও লোকায়ত চণ্ডীর কৃপাতেই মধ্যবঙ্গে বন কেটে বসত এবং নিজেদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যাযাবর গোষ্ঠীর অংশ বিশেষ হয়তো সেভাবেই থিতু হয়েছিল একদা। স্থায়ী বসত গড়েছিল নিজেদের জন্য। জল-জঙ্গল-পাহাড়-ই ছিল সেদিন তাদের জীবিকার উৎসস্থল। বেদেদের একটি অংশ তাঁতের চিবুনি, তাঁতেব শান, তাঁত বোনা, ডুবুরীর কাজে অংশও নিয়েছিল। নদী তীরে, নানান বয়নশিল্পের কেন্দ্রে তাদেব উপস্থিতি ক্রমে স্থায়ীত্ব এনে দিয়েছিল এই গোষ্ঠীকে। আসানসোল-জামুড়িয়া-দোমহানী এলাকায় পাখমারারা 'শিয়ালমাবা' নামেও পরিচিত, তাদেরও একটি গোষ্ঠী কয়লা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঘর বেঁধেছে এলাকায়। যাযাবরত্ব পছন্দ নয় তাদের অনেকেরই।

ব্যাধেরা বনের পশুপাখি শিকার করেই সংসার চালাতে অভ্যস্ত। বন্য পশুপাখির মাংস বিক্রি করেই সংসার চলতো কালকেতু আর ফুল্লরার, সেই-ই ছিল তাদের পেশা। ইংরেজের নতুন ভূমি-ব্যবস্থায় অরণ্যজীবী মানুষেরা অরণ্যের অধিকার হারিয়েছে। তাদের বিদ্রোহও হয়েছে অনেকটাই নিষ্ফল। পশুপাখি শিকার এবং গাছ কাটার উপর সরকারী ও ব্যক্তিগত মালিকানার কারণে ব্যাধ বা তথাকথিত অনধিকারীদের উপব জারী হলো নিষেধাজ্ঞা। তথাপি খরগোস, সজারু, শিয়াল, হরিণ প্রভৃতি প্রাণি এবং বনেব পাখিদের মারা বা ধরার ক্ষেত্রে তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিলনা ইংরেজ আমলে। ওই সমস্ত পাখি ও পশুরা ফসল নষ্ট করতো, পানের বরজের ক্ষতি করতো, পাখিরাও বিস্তব দানা শস্য খেয়ে ফেলতো। সুতরাং ওই সমস্ত পশুপাখিদের মারলে কৃষকেরা খুশিই হতো। 'বগড়া' নামের এক ধরনের ছোটো ছোটো পাখি খেতে নাকি খুবই সুস্বাদু, এগুলিও 'আঠাকাঠি' পেতে ধরা হতো। বগড়ার ঝাঁক পাকাধানের মাঠে বসে খুবই ক্ষতি করতো জমির। এক সময় বীরভূম-মুর্শিদাবাদের লাইনের হোটেলগুলিতে খুব সস্তায় এই বগড়ার মাংস বিক্রি হতো। এখন 'বগড়া' প্রায় দেখাই যায় না। খুবই কম দেখা যায় তালগাছে উল্টো কলসীর মতো নিজ হাতে গড়া কাঁচাঘরের স্বাধীন রাজা বাবুইপাখিকে।

পুকুর-নদী-বিলের মাছের মালিকেরা জলচর পাখিদের নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি কখনো। এ সমস্ত পাখির পণ্যমূল্য তেমন না থাকলেও বিক্রি হতো। তবে পরিযায়ী পাখির সুস্বাদু মাংসের জন্য তার দাম কম হয়নি কখনো।

দু'তিন পুরুষ আগের পাখমারারা নিজেরা খরগোসের মাংস খেতো, ধ'রে পোষার জন্য বিক্রিও করতো; সজারুর কাঁটা-চর্বি বিক্রি ক'রে মাংস খেতো নিজেবা। প্রধানত বুলবুল-টিয়া-ময়না প্রভৃতি পাখি ধরা হতো পোষার জন্য, অনেক বাড়িতেই পাখি-পায়রা পোষার নেশা ছিল। আবার ডাহুক-ধনেশ-পেঁচা-বাদুড়-পানকৌড়ি প্রভৃতি পাখির হাড়-দেহাংশ কবিরাজ এবং গ্রামীণ লোক-চিকিৎসকেরা কিনে নিতেন, সেই হিসেবে এইসব পাখিগুলিও ধরা হতো। হাঁপানির জন্য বাদুড়ের মাংস এবং অন্য অনেক টোটকা চিকিৎসার জন্য বাদুড়ের হাড় লোকচিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন। ধনেশপাখির হাড় ও তেলে বাত সারে বলে এই সমস্ত কবিরাজদের বিশ্বাস। বাতে ডাহুকের মাংস, প্লিহা এবং জরায়ু ঘটিত ব্যাধিতে পানকৌড়ির মাংসও ব্যবহার কবেন অনেকে। কাক ছাড়া প্রায় সব ধরনের পাখিই খাবার হিসেবে ব্যবহার করতো পাখমারারা। হরিয়াল-বালিহাঁস-সরালের মাংস তো গেরস্থদেরও যথেষ্ট প্রিয়, তাই ওই পাখিগুলি ধ'রে বা মেরে বাজারে বিক্রির একটা সুযোগ পেতো ওই জনগোষ্ঠী।

বাংলার বহু মানুষ বিজয়া দশমীতে নীলকণ্ঠ পাখি দেখাকে সৌভাগ্যের লক্ষ্মণ মনে করেন। ফাঁদ পেতে নীলকণ্ঠ পাখি ধ'রে বহু জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত বাড়িব উঠোনে গিয়ে হাজির হয়েছে একদা বিজয়া দশমীর শুভক্ষণে প্রাচীন পাখমারাদের অনেকেই। তাতেই খাবার আর অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। নীলকণ্ঠ পাখির অভাবে বড়ো মাছরাঙা পাখি ধ'রে তাকেই নীলকণ্ঠ বলে চালানোও হয়েছে অনেক সময়। পাখমারাদের অনেকেই আগে থাকতে খোঁজে থাকতো নীলকণ্ঠের, তারপর সময় বুঝে বিজয়া দশমীর ঠিক আগে আগেই তাদের ধ'রে আনা হতো। বসন্ত তলার সুব্রত এবং মধুবালা নীলকণ্ঠ পাখি ধরতো, দেখিয়ে আসতো বাজারে—বাড়িতে। ভালই রোজগার হতো তাতে, ইনামও মিলতো অনেকক্ষেত্রে।

কিন্তু গত ২/৩ বছর থেকে সেই নীলকণ্ঠেরা যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, সুব্রত-মধুবালাও সে ঠিকানা জানে না।

পাখমারাদের অনেকেই মধু সংগ্রহ করতো একসময়। মধু সংগ্রহের কারণেই বাজারপাড়ার বিশ্বনাথ রায়ের নামটিই হয়ে উঠেছিল 'মধুবালা'। বিশ্বনাথ নামটি ভুলে গিয়েছিল মানুষজন। তবে মধুবালাকে ভোলেনি। এখন মধুর অনেক দাম, বহু মানুষই এই মধু সংগ্রহ এবং বিক্রির পেশায় এসেছেন, অনেক নামী-দামী সংস্থাও মধু বিক্রির ব্যবসাতে নেমেছেন। কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য বিপদসংকুল কম মুনাফার এমন 'ছোটোলোকি' (?) কাজকে মধুবালার ছেলে বিদ্যুৎ গ্রহণ করেনি, সে রাজমিস্ত্রীর কাজে আনন্দ ও অর্থ দুই-ই উপার্জন করছে এখন।

বছর পঞ্চাশ আগেও পাখমাবাদের কেউ কেউ জরিবুটি-বনৌষধি বিক্রিবাটা করতো, এখনো কেউ কেউ লুকিয়ে-ছাপিয়ে সে ব্যবসা করে। তাই তাদের মধ্যে অলীক বাণমারা বা গাছ চালানোর গল্পগুলি রয়ে গেছে। তবে চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ওষধি গাছপালাগুলি সংগ্রহ ক'রে তারা কবিরাজদের কাছে বিক্রিও করতো। এদের কেউ কখনো সাপুড়ের কাজ বা ওঝার কাজ করেছে বলে জানা যায় না। তারা নিজেদের খাবারের জন্য পশুপাখি শিকার, মাংস-হাড়-ডানা-আঁশ-নখ প্রভৃতি ওষুধের জন্য বিক্রি, মধু এবং ওষধি গাছ-গাছড়া সংগ্রহ ও বিক্রি, পশু-পাখি বেচা, এসবই করেছে। এগুলিই ছিল পাখমারাদের বৃত্তি। অবশ্যই তাদের মূল বৃত্তিটির অন্তরালে রয়েছে পাখির কথা। পাখি সংক্রান্ত বিষয়েই তাদের জীবিকার ঘুঙুর বাঁধা। একারণেই পাখমারা > পাখেরা > পাখ'রা যে নামেই তাদের ভাবা হোক না কেন, নামটি কিন্তু সার্থক।

বাজারপাড়ায় একসময় জমজমাট পাখির বাজার ছিল। পাখির ব্যবসা করতো পাখমারা বা পাখমারাদের অনেকেই। এখন আর সে বাজার নেই, বন্ধ হয়েছে পাখি কেনা-বেচার ব্যবসাও। বাজারপাড়ায় ইসলামি সমাজভুক্ত একজন এখনও পাখির ব্যবসা করেন, অন্য দু'একজনও করেন। মূলকথা পাখমারাদের নিজস্ব পাখি কেনা-বেচার ব্যবসাটি হস্তান্তরিত হ'য়ে গেছে এখন। বটগাছে-পাকুড়গাছে আর হরিয়াল দেখাই যায় না, এই প্রজাতির পাখিটি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। জলা-জংলায় খালে-বিলে বুনো হাঁস-সরাল প্রভৃতি পরিযায়ী পাখিরা এখনো শীতকালে অল্প-স্বল্প আসে, সর্বসাধারণের যে কেউ সুযোগ বুঝে তাদের হত্যা করে। এসব আর এখন শুধুমাত্র পাখমারাদের হাতে নেই। ফসলে বিষ প্রয়োগে, যথেচ্ছ জল-জঙ্গল-অরণ্য ধ্বংসের কারণে, নির্বিচারে পাখি হত্যার ফলে বহু প্রজাতির পাখিই এখন যথেষ্ট কমে গেছে পশ্চিমবাংলায়। তথা সারা ভারতেই। তথাকথিত সভ্য মানুষজনেরা যে সমস্ত পাখির মাংস খায় না, যেমন শালিখ, কাক, সাতভেয়ে, চড়ই প্রভৃতি প্রজাতির পাখি এখনো রয়ে গেছে। তবে নাকি মোবাইল ফোনের বিশেষ ক্ষতিকারক রশ্মির কারণে এইসব জাতের পাখিরাও ফুরিয়ে ফাঁকা হ'য়ে আসছে। বক, শামুকখোল-মানিকজোড় মেরে খায় এখনো পাখমারারা। বাদুড়-পানকৌড়ি-শকুনের হাড়-মাংস লোক-চিকিৎসকেরা এখনো কেনেন। তবে এসব চিকিৎসায় এখন মানুষজনের বিশ্বাস অনেক কমে আসার ফলে ব্যবসাটি ঠিক্ লাভজনক অবস্থায় আর নেই। কবিরাজী এবং লোক-চিকিৎসা এখন লুপ্তপ্রায় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কাজেই অস্থায়ী আর অলাভজনক ব্যবসায় পাকমারাদের আর মতি নেই।

জল-জঙ্গল-গাছ-পালা এখন সবই কঠোরভাবে ব্যক্তি মালিকাধীন, তাই সেখান থেকে স্বাভাবিক কারণেই পিছিয়ে আসতে হয়েছে পাখমারাদের। অনর্থক হ'য়ে গিয়েছে পাখি শিকারের বৃত্তিটি, শুধু নামটি বেঁচে আছে তালবোনা পুকুরের মতোন।

পাখমারাদের পাখি শিকারের অস্ত্র ও পদ্ধতিগুলি তুলনায় আদিম এবং একান্তভাবেই নিজস্ব। তারা পাখি মারার জন্য তীর-ধনুক ব্যবহার করে না। ব্যবহার করে সাতনলা বা সাতনলি। সরু বাঁশের সাতটি লম্বা দণ্ড খোপে খোপে বসিয়ে গাছের সমান দীর্ঘ ক'রে পাখমারারা পাখিকে হত্যা করে অথবা আঠাকাঠিতে জড়িয়ে নেয়। সাতনলির মাথায় থাকে লোহার ধারালো ফলা, যার আকার অনেকটাই ইংরেজি ওয়াই (Y)-এর মতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক্স (X) অক্ষরের মতো বাঁশের লিল্ দিয়ে তৈরী 'আঠাকাঠি' বা হাতে বোনা জালের ফাঁদও থাকে। নিঃশব্দে নীচের দিক থেকে গিয়ে সাতনলি পাখিকে বিদ্ধ অথবা বন্দী করে। এরা নিজেরাই নিজস্ব লোকায়ত পদ্ধতিতে এসব অস্ত্র এবং ফাঁদ বানায়, আঠাও তৈরি করে। বনজ উপাদানে, সহজ লোকায়ত পদ্ধতিতে এসব পাখি ধরার অস্ত্রশস্ত্রগুলি তৈরি হয়। পাতলা ক'রে বাঁশের বাতা চিরে নিয়ে এক্স (X) আকৃতির ক'রে মাঝখানে সুতো বেঁধে একটি ঝিঁঝিঁ পোকাকে আটকে দেওয়া হয়। চেরা বাতার ফালিটিতে লাগানো হয় সর্ষের তেল মেশানো পাকুড়-বট বা মনসার আঠা। এছাড়াও এ (A)-র মতো বা ওয়াই (Y)-এর মতো করেও সরু ডাল বা বাঁশ-বাতার ফালির মাঝে তালপাতার শির বসিয়ে আঠা দিয়ে একইভাবে ঝিঁঝিঁ পোকা আটকে রাখা হয়। ছোটো ছোটো পাখিরা পোকাটিকে খেতে এসেই আঠাকাঠির আঠায় জড়িয়ে যায় ডানায়। এভাবেই সিট্‌কেল, একশির, দু'শির, আঠাকাঠি প্রভৃতি তৈরি হয় পাখমারাদের কৌশলী হাতে। এছাড়াও তালের বাগ্‌ড়া, ঘোড়া এবং গোবুর লেজের চুল তারা ফাঁদ বানানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। সবই দেশজ-লোকায়ত এবং নিজস্ব পদ্ধতি। এই সমস্ত প্রাচীন পাখি ধরার পদ্ধতিগুলি অন্য যাযাবর শিকারী গোষ্ঠীর মানুষজন থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে পাখমারাদের। সাতনলির ব্যবহার তাদের স্বাতন্ত্রের দিকটিকেই স্পষ্ট ক'রে তোলে। পটুয়া-ব্যাধ-বেদে-যাযাবরদের একাংশ সাতনলিতে পাখি শিকার-ই করতো একদা নিজস্ব বৃত্তি হিসেবে। তাই 'পাখমারা' তারা। 'পাখি মারা' থেকেই এসেছে শব্দটি। কালের প্রবাহে তার বদল হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের রেনেলের ম্যাপে ভাগীরথী নদীকে বহরমপুরের পূর্ব দিকে বয়ে যেতে দেখানো হয়েছে। সারগাছির আগে সে নদী পশ্চিমগামিনী হ'য়ে বর্তমান নদীখাতে মিশে গেছে। পশ্চিমগামিনী গ্রাম সে বিবরণের সাক্ষী। বর্তমানে বহরমপুর শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে ভাগীরথী প্রবাহিত। তার পশ্চিম পারে বাজারপাড়া। ভাগীরথীর তীর বরাবর বহুদিন বাঁধ ছিল না। বসতিহীন কিনারার জমিগুলিতে বর্ষার আগে হতো আউস ধান। কৃষ্ণনাথ কলেজের ঘাটের জন্য একজন মাঝি শুধুমাত্র বাস করতো এখানে। পাড়াটির নাম ছিল মাঝি পাড়া। গৌরচন্দ্র চৌধুরীর মামা ওই জমি চাষ করতেন আর কাজ করতেন সেচ দপ্তরে। কাছাকাছি জায়গায় বিহার থেকে আসা চাঁই-বিন্দ-গোপ-পাণ্ডে-মিশ্র প্রমুখেরা আস্তে আস্তে বসতি গড়ে তোলে। শক্তিনাথ ঝা-এর পাণ্ডুলিপি থেকে আরও জানা যায়—গৌরচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল মহুলার পাখমারাদের মেয়ে উমাকালীর সঙ্গে। সেই সূত্রে মহুলা, দাঁইহাট থেকে

আসা কয়েকটি পাখমারা পরিবার আশ্রয় পায় এখানে। কাছেই শক্তিপুরের রাস্তার পশ্চিমে রায়পাড়া বা পাখমারা পাড়াটির অবস্থান। ইংরেজ আমলে এখানে একটি রেশমকুঠি ছিল। কুঠিয়াল ইংরেজরা শ্রমিক হিসেবে ঝাড়খণ্ড এবং বাংলার নানান জায়গা থেকে অনেক মানুষ নিয়ে এসেছিল তাদের প্রয়োজনে। এখানে তাদের অনেকেই থেকে গেছে পরে। অন্যদিকে উদ্বাস্তু হিসেবে ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষজন এবং জেলার নানান স্থান থেকে উঠে আসা মুসলমান ইসলামি জনগণ শহরতলি বাজারপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করে। জমে ওঠে ভাগীরথীর একেবারে আঁচলে আঁকা কল্কার মতো 'বাজার পাড়া'। অতীতে এখানে বাজার ছিল, পাখি কেনাবেচা হতো।

পাকা রাস্তার পশ্চিমে 'রায় পাড়া', 'পাখরা পাড়া' পাখমারাদের পাড়া। এখানকার পাখমারাদের সবার উপাধি 'রায়'। এখানে কেউ জাত-ব্যবসা করে না, পাখমারারাও করে না। তাদের ঘর-সংসার সবই আছে, ভোটার লিস্টে নাম আছে, রেশন কার্ড আছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। বৃহত্তর হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যেই এখন তাদের অবস্থান এবং বিকাশ। ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের বাঁধ নির্মিত হলে এই এলাকায় জমির দাম দ্রুত বেড়ে যায়। সমৃদ্ধ হিন্দু-মুসলমানেরা অনেকের জমি কিনে নেয় এবং বসতবাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে থাকে। রেশম কুঠির ম্যানেজার হ'য়ে অবশ্য এই এলাকায় আগেই কিছু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বসবাস শুরু করেন। পাড়াটিরও নাম হয় 'বাবুপাড়া'।

গৌরচন্দ্র চৌধুরী, মামার অবর্তমানে সেচ-বিভাগের চাক্‌রিটি পান এবং ভাগীরথীর বাঁধ দেখাশোনার দায়িত্বও ছিল তার। জমিগুলিও চাষ করতেন গৌরচন্দ্র। পাখমারাদের মেয়ে উমাকালীকে বিয়ে করতে তাকে কন্যাপণ দিতে হয়েছিল ষাট টাকা। গৌরচন্দ্র ও উমাকালী ছিলেন নিঃসন্তান। গৌরের আত্মীয়-স্বজন শিলকোটা বা সাহুরা বিহার থেকে আসতো এখানে। উমাকালীর আত্মীয়রাও আসতো, আশ্রয়ও পেতো। এমন একটা সময়ে উমাকালী তার দিদির মেয়ে পূর্ণিমাকে দত্তক নেয়।

আগে পাখমারাদের বিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে হতো না। কন্যাপণ লাগতো। সাতনলা, পাখি ধরার ফাঁদ, পাঁচসিকে পয়সা, পর্যাপ্ত মদ এইসব। অন্যদের সঙ্গে বিয়ে হলে জরিমানা লাগতো, একঘরে করা হতো। একারণেই পাখমারাদের ছোট্ট গোষ্ঠীটি ক্রমশ আরও ছোট হতে থাকে। গোষ্ঠীর মেয়েরা দলছুট হয়ে যায়। শিথিল হতে থাকে গোষ্ঠীর অনুশাসন, সামাজিক প্রথা। বৃত্তির উপরও আসে আঘাত। চালু হতে থাকে ভোজ আর মদ খাইয়ে অন্য গোত্র ও গোষ্ঠীতে বিয়ের প্রথা। জঙ্গীপুর, দাঁইহাট গোত্রের সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে না হলেও তাদের সঙ্গে পান-ভোজনও শুরু হয় পরবর্তীকালে। মিঠিপুরের পাখমারাদের আর স্বপাক রান্না ক'রে খেতে হয় না বসন্ত তলায়। বীরভূমের বিষয়পুরের পাখমারাদের সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বিবাহ প্রথা। তার আগে পাখমারাদের সংখ্যাল্পতার কারণে মহুলায় জেঠ্‌তুতো-খুড়তুতো ভাই-বোনেও বিয়ে হ'যে যাচ্ছিল। সেটা খানিকটা হলেও থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

উমাকালী তার দত্তক নেওয়া মেয়ে পূর্ণিমার বিয়ে দেয় দেওঘর থেকে আসা এক শিলকুটানী সাহুর সঙ্গে। সাহুর আরেক স্ত্রী এবং সন্তানেরা দেওঘরে থাকে। পূর্ণিমা থাকে বাজার পাড়াতেই। পূর্ণিমার বড় মেয়ে শ্রাবণী মাধ্যমিক পাশ, তার বিয়ে হয়েছে মালিহাটির

এক সাহুর সঙ্গে। স্বামী চাষ করে। তাদের উপাধি 'সাহা'। বিহারের এবং ছোটনাগপুরেব সাহু-সিং-চৌধুরীদের সঙ্গে রায়েদের বিয়ে হয়। উমাকালীর বয়স এখন ৭৬, উপাধি হিসেবে তিনি বলেন 'দাসী'। খুব অল্প বয়েসে মামা-শ্বশুর তার বিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্বামী গৌরচন্দ্র মারা যান। উমাকালী মহুলা এবং দাঁইহাটের পাখমারাদের এখানে জায়গা দেন, নিয়েও আসেন। অনেক জমি তিনি স্বজাতি, বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু এবং অন্যান্য মানুষজনকে অনেক কম দামে দিয়ে দেন। দরিদ্র মানুষজনের উপর একটা মমতা থেকেই গেছে উমাকালীর। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই পূর্ণিমা এবং তার ছেলেমেয়েদেব দায়িত্ব নিতে হয়েছে উমাকালীকেই। পূর্ণিমার স্বামী তাদের দেখে না, দেওঘর চলে গেছে সে রসিক বাঘ। এখন উমাকালীব জমিও কমে এসে দাঁড়িয়েছে পাঁচ বিঘে মাত্র।

উমাকালীর দু'কাঠা জমি কিনে নিয়ে দাঁইহাটের পাখমারা পাড়ার বিশ্বনাথ রায় প্রায কুড়ি বছর আগে এই বসন্ত তলায় বাড়ি করেছিল, তখন তার বৃত্তি ছিল মধুসংগ্রহ। তাই বিশ্বনাথ নামটির আর প্রয়োজনই পড়েনি, সবাই ডাকতো 'মধুবালা' বলেই। ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবারই সে 'মধুবালা'। পড়শীদের কাছে শিলকুটানো শিখে নিয়েছিল মধুবালা। সংসারের উন্নতির জন্য তাই শিলকুটানো, জনমজুর খাটা থেকে বিজয়া দশমীর দিনে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিয়ে বেড়ানোকেও সে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল। তাতেও সংসারে স্বচ্ছলতা আসেনি। তখন বহুরূপী সেজেছে মধুবালা। বাঘ-সিংহ-হনুমান এই ছিল মধুবালা ওরফে বিশ্বনাথের প্রিয় সাজ। এখন বয়সের ভারে আর লাফ-ঝাঁপ করতে পারে না, পোশাকপত্রও ছিঁড়ে গেছে বহুরূপীর। তবে কোনোদিনই কৃষিকাজে মন যায়নি তার। মধুবালা জানিয়েছে তারা 'জরাসন্ধ' গোষ্ঠীর পাখমারা। তার দু'ছেলে। বড়ো ছেলে রাজমিস্ত্রি। সে লিখতে পড়তেও পারে। তার বিয়ে হয়েছে সারগাছি হালালপুরের 'পাল'দের মেয়ে টুকুরানির সঙ্গে। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের মেয়ে টুকু, তাব বাবা করতো দুধের ব্যবসা। দু'ভাই মিলে মজুর খেটে সংসারকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিল তারা, কিন্তু কোনোদিন বহুরূপী সাজেনি। বড়ো বোনের বিয়ে হয় 'হালদার' (মাছ ধরা যাদের জাত ব্যবসা)-দের ঘবে। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে পড়া ছেড়েছে মধুবালার ছোট ছেলে বিদ্যুৎ। সে এখন রাজমিস্ত্রির কাজ করে। কৃষিকাজ বা মধুসংগ্রহে তার কোনো আগ্রহ নেই। তার মতে রাজমিস্ত্রির সামাজিক সম্মানও বেশি।

ষোড়শীবালা রায়ের এখন বয়স সত্তর বছর। স্বামী-রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি গত হয়েছেন। তাদের বাস ছিল সারগাছি মহুলার ঘোষপাড়ায়। জাল দিয়ে হাঁস-ডাহুক-পানকৌড়ি-নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ধরতেন ষোড়শীর স্বামী। কিন্তু ঘোষদের অত্যাচার আর কাজের সুবিধার জন্য প্রায় তিরিশ বছর আগে এই বসন্ততলার বাজার পাড়ায় তারা চলে আসেন। মধুবালা তাদের জামাই। বড় ছেলে নারায়ণ রাজমিস্ত্রির কাজ করে। তার দু'ছেলেও সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর রাজমিস্ত্রির কাজে যোগ দিয়েছে। ছোটো ছেলের বিয়ে হয়েছে 'পাণ্ডে'দের (বিহারের ভূমিহার, ব্রাহ্মণ) মেয়ের সঙ্গে। নারায়ণের মেয়ে মা-মণির বিয়ে হয়েছে বাংলাদেশ থেকে আসা দেবনাথের ছেলের সঙ্গে। ছেলে পাড়াতেই থাকে এবং রাজমিস্ত্রির কাজই করে। অন্য মেয়ে শ্যামলীর স্বামী ছুতোর মিস্ত্রি, কাঠের কাজ করে। বিহার থেকে আসা তাদের উপাধি 'শর্মা'। আরেক মেয়ে রাধারানির বিয়ে হযেছে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এক যুবকের সঙ্গে, সে গ্রিলের কারখানায় কাজ করে। শুধুমাত্র সূর্যমণির বিয়ে হয়েছে তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীতে 'রায়'দের

ঘরে। গোষ্ঠীর নিজস্বতা সংস্কৃতি আচার-আচরণ এসমস্ত কারণেই আর সেভাবে ধরা থাকছে না। ধ'রে রাখার চেষ্টাও কারোর মধ্যে যেমন আর নেই, তেমনই সে আর সম্ভবও নয়।

মধুবালার এক ভাই নিরঞ্জন রাজমিস্ত্রি। মহুলার এক ঘোষের মেয়েকে বিয়ে ক'রে সে এখন নিজের পদবীও 'ঘোষ' লেখে। রেশনকার্ড, ভোটারলিস্ট সর্বত্রই রয়েছে 'ঘোষ'। তার তিন ছেলেও 'রায' না লিখে 'ঘোষ'-ই লেখে নামের পদবী। উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করেছে অপু, মাধ্যমিক পাশ ক'রে রাজমিস্ত্রির কাজ করছে ছোটন, আর ছোটো ছেলে সুকুমার এখন পড়ে সপ্তম শ্রেণিতে। এদের মধ্যে আর পাখমারাদের কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই।

মধুবালার আর এক ভাই বিপদভঞ্জন রায় মোটর-ড্রাইভার। সেও 'ঘোষ' বাড়িতে দ্বিতীয় বিয়ে ক'রে নিজের পদবী পাল্টে 'ঘোষ' ক'রে নিয়েছে। বিপদভঞ্জন বিশেষ বিশেষ সময়ে পৈতে পরে মনসার পুজোও করে। মনসার দেয়াসীন সে এখন।

মধুবালাদের আত্মীয় ঁসুধাকালী রায় রেলে কাজ করতো, তার স্ত্রী খুদুবালা রায় এখনো জীবিত। সুধাকালীর তিন ছেলেই বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। বাদল, কৃষ্ণধন এবং বিশ্বনাথ এরা তিনজনেই রাজমিস্ত্রি। চতুর্থ এবং ছোটো ছেলে ষষ্ঠী ভ্যানরিক্সা চালায়। তার এবং মেয়েদের বিয়ে হয়েছে 'রায়' অর্থাৎ নিজস্ব পাখমারা গোষ্ঠীর মধ্যেই। বাদল, কৃষ্ণধন এবং বিশ্বনাথ 'ঘোষ' ও 'পাল' বাড়িতে বিয়ে করেছে।

মাঝের পাড়ার পাখমারাদের একজনই এখনও মধুসংগ্রহ এবং পাখি শিকারের সঙ্গে যুক্ত। অন্যেরা চাকরি, রাজমিস্ত্রি, মোটরগাড়ি বা ভ্যানরিক্সার চালক। বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে গিয়েছে পাখমারাদের উত্তর প্রজন্ম। বিভিন্ন পরিবারেই বিয়ে হয়েছে 'রায়'দের। তার মধ্যে ঘোষ, পাল, চৌধুরী, মণ্ডল, দেবনাথ, শর্মা, সাহু প্রভৃতি রয়েছে। 'জাত' বিভিন্ন হলেও তারা সকলেই প্রায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং প্রান্তবাসী জনগণেরই স্বজন।

শক্তিপুর যাওয়ার পাকা রাস্তার ধারে পাখরা (পাখমারা) পাড়ায় কয়েকঘর পাখমারা থাকে। তাদের সবার পদবীই 'রায়'।

মণি রায় ভূমিহীন স্বাক্ষর, ৪ মেয়ে ও ১ ছেলের জনক। সে কাজ করে বিদ্যুৎপর্ষদে। ভিটে আছে তাব। পাখমারাদের জাত-ব্যবসার সঙ্গে তার কোনোই সংযোগ নেই। বয়স এখন পঞ্চাশেব কাছে।

ডোমন রায়-ও জাত ব্যবসার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। অবশ্য সে মনসার পুজো কবে। ৪২ বছরের ডোমন পি-ডবলু-ডি-তে চাকরি করে। তার পাকা বাড়ি এবং ৪/৫ বিঘে জমিও আছে। ঁদিবাকর রায়ের দু'ছেলের একজন গ্রিল-মিস্ত্রি, অন্যজন ভ্যান-চালক। ৪১ বছর বয়সের বিশ্বনাথ রায় রাজমিস্ত্রির কাজ করে। বিশ্বনাথের ভাই সুব্রত রায় পেশায় বহুরূপী। তার সামান্য জমি-বাড়ি আছে। সুব্রত নিজে 'সাহা' বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করলেও নিজের পদবী পাল্টায়নি। বাংলাদেশ থেকে আসা রবি রায় রিক্সা চালায় কিন্তু তার ১৫ বছরের ছেলে সুজিত বহুরূপী সাজে। সুজিতের বহুরূপীর শিক্ষা সুব্রতর কাছে। ৪৬ বছর বয়সের রাইপদ রায় জাত ব্যবসা না ক'রে চায়ের দোকান পেতেছে। ৪৩ বছরের সুধীর রায় চাকরি করছে বহরমপুরের মানসিক হাসপাতালে। ঁপঞ্চু রায়ের এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে বীরভূমের বিষয়পুরের পাখমারাদের ঘরে। তার স্বামী বহুরূপী সাজে। ভাই সঞ্জয় রায়ও সাজে বহুরূপী। অন্য ভাই রিক্সা চালায়।

নদিয়ার করিমপুর হ'য়ে বসন্ত তলায় এসেছিল কমল বিশ্বাস। জাতিতে নমশূদ্র কমল ২ ছেলে ও ১ মেয়ের জনক। সে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর পাখমারাদের মেয়ে মাধবীকে বিয়ে করেছে। কমলের আগের পক্ষের ছেলে বচন এখন বহুরূপী সাজে। বচনের বিয়ে হয়েছে কাঠালিয়ার ঘোষেদের মেয়ে চায়নার সঙ্গে। বিয়েতে সামান্য পণ-ও পেয়েছে বচন। কমল নিজে বহুরূপী সাজে, মজুরের কাজ করে, সময়-সুযোগ পেলে ডাব-ও বিক্রি করে। তবে প্রধান জীবিকা তার বহুরূপীই। কমলের দশ বছরের ছেলে জয়দেবও বহুরূপী সাজে। তার মা মাধবী নিজের হাতে ছেলেকে সাজিয়ে দেয় রাম-কৃষ্ণ-হনুমান অথবা আরও অন্য কিছু। কমল নিজের 'বিশ্বাস' পদবী আর ব্যবহার করে না। সে এখন 'রায়'ই হয়ে গেছে।

বাজার পাড়ার দু'টো পাখমারা পরিবার ভেখ্ নিয়ে জাত-বৈষ্ণব হ'য়ে 'রায়' পদবী বিসর্জন দিয়ে এখন 'দাস' হয়েছে। ৭৫ বছরের কালিপদ দাস (রায়) চাকরি করতেন সেচ বিভাগে। তার তিন ছেলে এবং দু'মেয়েরই বিয়ে হয়েছে জাতবৈষ্ণব দাসদের ঘরে। অবশ্য তাদের কেউই আর পুরনো পাখমারা বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত নয়। তাদের পূর্ব-বংশধরেরা কুষ্টিয়া হ'তে রেশমকুঠিতে চাক্‌রি নিয়ে নাকি এদেশে এসেছিলেন এবং সেই কালিপদর পিতামহের কাল হতেই পরিবারটি জাত-বৈষ্ণব। পাখমারাদের সঙ্গে কোনোদিনই তাদের বিয়ের চল্ ছিল না।

অন্য পরিবারের কর্তা বিশ্বজিৎ রায় (৫০)-ও সেচ বিভাগে কাজ করেন। বিশ্বজিৎ ভাল কবিগান করতে পারেন। তার ছেলেমেয়েরা সবাই পড়াশুনা করে। তারও প্রপিতামহ রাণাঘাট-ইসলামপুরের রেশমকুঠিতে কাজ করতে এসেই থেকে গেছিলেন এপারে। তিন পুরুষ থেকেই তাদের বিয়ে হয় বৈষ্ণবদের ঘরে। পাখমারাদের সঙ্গে তাদের কোনোই সংস্রব নেই। তবে অতীতের সংস্কারের কারণেই এদের কেউ-ই সাপ মারে না। কিন্তু সাপ ধরা বা পাখি শিকারও তাদের রক্তে নেই।

হিন্দু সমাজের প্রান্তজনেরা, জাত-বর্ণের নিম্নস্থানাধিকারীরা অনেকে জাত-গোত্র-বর্ণ বিসর্জন দিয়ে 'ভেখ্' নিয়ে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে। বৈষ্ণব ধর্মে এই সুযোগ আছে। সে সকলকে আশ্রয় দেয়, সকলের আধার হ'য়ে উঠ্‌তে চায়। তথাপি কোনো ব্রাহ্মণ নিজের অধঃপতন ভিন্ন এভাবে জাত-বৈষ্ণব হ'য়ে ওঠেনি। জাত-বৈষ্ণবে এসেছে অধিক সংখ্যায় প্রান্তবাসীরাই। হিন্দু-সমাজের মূল স্রোতে যাদের স্থান দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলার, প্রায় জল-অচলের। তারাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ভেখ্' নিয়ে, বৈষ্ণব সন্ন্যাসের কাছে দীক্ষা নিয়ে নিজেদের 'জাত্যান্তর' ঘটিয়ে থাকেন। চিহ্নিত হন 'জাত-বৈষ্ণব' হিসেবে। তখন বৈষ্ণবের 'দাস' সেবক হিসেবে তারা 'দাস' পদবীও ব্যবহার করেন। ভুলে যান স্বেচ্ছায় নিজেদের পূর্বপদবী। মধ্যবঙ্গ এমনকী সমগ্র বাংলাতেই এই জাত-বৈষ্ণবদের 'জলচল' আছে। হিন্দু ব্রাহ্মণের সঙ্গে দশকর্মে বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে বৈষ্ণবসেবা-প্রথাও চালু আছে বাংলায়।

বেদ-ব্রাহ্মণ-রাজা-অগ্নি সবই বৈষ্ণবের কাছে অবান্তর। এরা মহাপ্রভু, গুরু-মহান্তদের ভোগরাগ দেয। হিন্দু মতে বিবাহ-প্রথাও চালু আছে জাত-বৈষ্ণবের সমাজে। তাদের দেহ মৃত্যুর পর সমাধিস্থও হয়। তারা নিজেদের 'অচ্যুতানন্দ' গোত্রের বৈষ্ণব হিসেবে পরিচয় দেন। অন্য জাতি-গোত্রের যে কোনো আগ্রহী মানুষকে নরনারী নির্বিশেষে তারা 'ভেখ' দিয়ে বৈষ্ণব ক'রে নিতেও পারেন। কালক্রমে বেদ-ব্রাহ্মণ বিরোধিতা এবং জাতিবিরোধ কমে আসে, 'জাত-

বৈষ্ণবেরা' হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ জাতি হিসেবে মান্যতাও পেতে থাকে। গতানুগতিক আচার-ব্যবহারও তারা পালন করতে থাকে। তথাকথিত নিম্নজাতের বহু মানুষ নিজেদের জাতকুলমান মুছে দিয়ে এভাবেই 'জাতবৈষ্ণব' হ'য়ে জাতি-স্তরের উন্নত সোপানে উঠতে চেয়েছেন। এদের নিয়ে মূল বৈষ্ণব সমাজে বহু বিতর্ক। কোথাও কোথাও এদেরই কেউ কেউ জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন বহুরূপীকে। বীরভূম জেলার কুলিয়া গ্রামের সুবল দাস বা হুগলি জেলার বৈঁচি স্টেশন সংলগ্ন নিত্যানন্দ মহান্ত বহুরূপী সাজেন। জীবিকাও বহুরূপী। তারা নিজেদের বৈষ্ণব হিসেবেই তুলে ধরেন সর্বত্র। নিত্যানন্দের বাড়িতেই আছে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, তিনিই তাঁদের সেবক। মূলকথা জাতি-পরিচয়কে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে পাখমারাদের কেউ কেউ 'জাত-বৈষ্ণব' হিসেবে হিন্দু সমাজের একটি সম্মানজনক স্থানে উঠতে চেয়েছেন। 'জাত হারিয়ে বৈষ্ণব আর গোত্র হারিয়ে কাশ্যপ।'

বহরমপুরের বাজার পাড়ায় দরিদ্র ইসলামি জনতার প্রাধান্য আছে। তাদের থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে পাখমারারা। তাদের বাড়িতে খায় না। তাদের সঙ্গে ছেলে-মেয়ের বিয়ে তো অকল্পনীয় ব্যাপার। বহুরূপী সুব্রত রায় বা গোষ্ঠীর আরও অনেকেরই বক্তব্য— মানুষের জাত-বিচার করিনা আমরা। সবার সঙ্গে আমাদের বিয়ে-সাদি হয়। তবে 'মুচি-মেথর আর মুসলমান ছাড়া'। পাখমারাদের মেয়েকে বিয়ে ক'রে বাংলাদেশ থেকে আসা কমল বিশ্বাস এখন 'রায়' পদবী ধারণ করেছে। তার ছেলেমেয়ের পদবীও হয়েছে 'রায়'। 'মুচি-মেথর-মুসলমান'দের সঙ্গে পাখমারাদের বিয়ে হয়নি। তবে বাংলাদেশি-বিহারীরা অনেক ক্ষেত্রেই পাখমারাদের বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় হ'য়ে উঠেছে। যদিও অসবর্ণ বিয়েগুলির অধিকাংশই প্রেমজ। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট এবং উপযুক্ত ছেলেমেয়ে না থাকার কারণে পাখমারা সমাজে অসবর্ণ বিবাহ খুব একটা আপত্তির নয়। পাখমারাদের মেয়েরা তুলনায় সুন্দরী-শিক্ষিতা, উপস্থিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও তাদের প্রবল। মহুয়া নদেরচাঁদ হুমড়াবেদের প্রসঙ্গ মনে পড়ে এদের দেখেই। সাহু-ঘোষ-সাহা এসব ঘরে বাজারপাড়ার পাখমারাদের বিয়ের সূত্র ধরেই তাদের সন্তানসন্ততিদের বিয়েও হচ্ছে সেসব ঘরেই। সুব্রতর বৌদি সাহা, মেয়ের বিয়েও হয়েছে 'সাহা' ঘরে। পূর্ণিমার বিয়ে হয়েছে 'সাহু' ঘরে, তার মেয়েও আছে 'সাহু' ঘরেই। 'ঘোষ' স্ত্রী হওয়ার সূত্রে ছেলেদের বিয়ে হয়েছে 'ঘোষ' বাড়িতে। হিন্দু সমাজে এখন ভয়াবহ 'বরপণ'। ক্ষেতমজুর, জনমজুর পাত্রের জন্যও ৩০/৪০ হাজার টাকা লাগছে। পাখমারাদের ঐতিহ্যে 'বরপণ' ছিল না, ছিল 'কন্যাপণ'। এখন অবশ্য পাখমারাদের বিয়েতেও বরপণ লাগে। তাই 'সামান্য পণ' বা 'বিনাপণে' 'উচ্চ বংশে' বিয়েতে আপত্তির ঝড় ওঠে না পাখমারা সমাজে। অধিকাংশ অসবর্ণ বিয়েই পরবর্তীকালে মেনে নিয়েছে তাদের অভিভাবকরা। ঘোষ-পাল-সাহু-সাহাদের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য আর দুর্দশা থেকেই এসেছে সমর্থন। আসলে দারিদ্র্যই শ্রেণিচরিত্র জাত-বর্ণ-গোষ্ঠী-প্রথাকে কখন যেন অমান্য ক'রে কালো মেঘের আবরণে আড়াল করে দিয়েছে।

ভূমিহীন পাখমারারা কৃষিকাজে কোনোদিন মন দিতে পারেনি। তাই অকৃষক এই জনগোষ্ঠীর জাতবর্ণের শিকড় তত দৃঢ় নয়। বেশ আল্গাই। প্রতিষ্ঠিত হিন্দু উপাধি বা পদবী তারা অর্জন করেনি, বিয়ের সূত্রে গ্রহণ করেছে। এসবের মধ্য দিয়ে তাদের নিজস্ব জাত-বর্ণ-পদবীর প্রতি হীনমন্যতাই লক্ষ করা যায়। সে কারণেই বোধহয় অন্যের পদবী গ্রহণ ক'রে

তাদের কেউ কেউ পাখমারাদের পদবীর হীনমন্যতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পথ খুঁজেছে। সেক্ষেত্রে স্বামী সাগ্রহে গ্রহণ করেছে স্ত্রীর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু পদবী। পরবর্তীতে সন্তানেরাও পরিচিত হ'য়ে উঠেছে নতুন পদবীতেই।

অনিশ্চিত জাতের অবস্থান থেকে নিরাপদ হিন্দু জাতির বর্ণ-ব্যবস্থায় এভাবেই পাখমারাদের স্থানলাভ নিশ্চিত হয়েছে। জাত-গোত্রহীন আদিবাসীদের এমন হিন্দুত্ব প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছে বহু ক্ষেত্রেই। বৃত্তি হারিয়ে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পাখমারা জনগোষ্ঠী পদবী বদ্‌লে উন্নত হিন্দুর পরিচয় ধারণ ক'রে নিজেদের নতুন অস্তিত্বের ভিত্ নির্মাণ করেছে। কেউ কেউ বৈষ্ণব পরিচয়ে অর্জন করতে চেয়েছে সামাজিক মান্যতা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, বহিরাগত উদ্বাস্তুদের জাতি পরিচয় সর্বদা সঠিক থাকে না। তবে সকলেই উন্নত এবং প্রয়োজনীয় জাতি পরিচয় গ্রহণে আগ্রহী।

বহরমপুরের বাজার পাড়ার মধ্যে 'চাঁই' এবং 'বিন্দ' জনগোষ্ঠীর অবস্থান দেখা যায়। জমি কেন্দ্রিক জীবন-যাপনে তারা অনেকটাই আগ্রহী। তাদের পুরুষেরা কৃষিকাজ করে, মেয়েরা সব্জী-মদ বেচে। তাদের বিয়ে হয় এখনও নিজস্ব গোষ্ঠীতে। নিজস্ব গোষ্ঠীর সঙ্কর ভোজপুরী ভাষা ও সংস্কৃতিকেও তারা সযত্নে রক্ষা করে চলার ক্ষেত্রেও বেশ যত্নশীল। কিন্তু পাখমারা জনগোষ্ঠী নিজেদের পূর্ব পরিচয়কে রক্ষা করার পরিবর্তে মর্যাদাকর উন্নত হিন্দুর পরিচয় অর্জনে বহুধা আগ্রহী। তাই তারা সমমাত্রিক শ্রমগোষ্ঠীর মানুষজনের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে সংযুক্ত হ'তে চেয়েই নিজেদেব পদবী পর্যন্ত বিলোপ করেছে অনেক ক্ষেত্রে।

পাখমারাদের মৃতদেহ দাহ হয়। দশ দিনের অশৌচের পর একাদশ দিনে কামান। জিয়াগঞ্জের 'চক্রবর্তী' ব্রাহ্মণেরা এসে বাজারপাড়া-বসন্ততলার পাখমারাদের পৌরোহিত্য করতেন। এখন অবশ্য বহু দরিদ্র ব্রাহ্মণই এসব কাজ করেন। বাচ্চা জন্মানোর ক্ষেত্রে ২১ দিনের আনন্দাশৌচ পালিত হয়। এ সমাজে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তার পুনরায় বিয়ের প্রথা চালু আছে। মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া এবং 'কন্যাপণ' পাওয়াও এই সমাজের রীতি। যদিও উন্নত সমাজের প্রভাবে এখন 'কন্যাপণ' আর সেভাবে নেই, লাগছে 'বরপণ'। বিয়েতে কিন্তু পাত্র এবং পাত্রীকে এখনও নির্জলা উপবাসে থাকতে হয়।

বসন্ততলার এবং বাজারপাড়ার পাখমারারা বৈশাখ মাসে 'বৃক্ষপূজায়' অংশ নেয়। বট-পাকুড়, বেল-পাকুড়, বেল-বট গাছের বিয়ে দিয়ে এসব গাছকে একসঙ্গে রোপন করে এই জনগোষ্ঠী। তখন বিশাল উৎসব তাদের। বীরভূমের বিষয়পুরের পাখমারাদের সবচেয়ে বড় উৎসব 'ধরমপুজো'। তখন তাদের নিজস্ব ধরমকে খুশি করতে তারা পাঁঠা বলিও দেয়। মিশকালো পাঁঠার চাহিদা যথেষ্ট পাখমারাদের ধরমপুজোয়। বেল-নিম-বট-অশ্বত্থ গাছ পোড়ানো তাদের নিষেধ। নিষেধ আছে কচ্ছপের মাংস খাওয়াতেও। শিবরাত্রিতে নির্জলা উপবাস ক'রে শিবের পুজো দেয় ছেলে-মেয়েরা। যদিও মেয়েরাই এক্ষেত্রে বেশি সংখ্যায় উপস্থিত, তথাপি ছেলেরাও থাকে। শিব নিজে তো বহুরূপীই ছিলেন। আবার পাখমারাদের ছেলেরা শিব সাজতেই ভালোবাসে বেশি। বর্ধমানের দাঁইহাটের পাখমারারা বেলপাতায় নিজের একফোঁটা রক্ত, পরিবর্তে পাখির রক্ত দিয়ে শিবের পুজো করতো। এই-ই ছিল তাদের রীতি।

বান্ রাজা নিজেব দেহের রক্ত দিয়ে শিবের পুজো করেছিলেন। পাখমারাদের সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, কৃষ্ণকে সাতনলি দিয়ে বিদ্ধ করেছিল জরা ব্যাধ। তিনি ছিলেন এই

পাখমারাদেরই পূর্বপুরুষ। তখন গাছের নীচে থাকা শিবলিঙ্গের মাথায় পড়েছিল কৃষ্ণের এক ফোঁটা রক্ত। সেই থেকেই রক্তের ফোঁটা দিয়ে শিবপুজো করা পাখমারাদের প্রথা।

কার্তিক মাসে কার্তিক পুজোয় অংশ নিত পাখমারারা। মাথায় জলের কলসী নিয়ে তাদের 'ভর' হতো। ধাক্কাধাক্কির লড়াই হতো বিসর্জনের সময়। তথাপি পাখমারাদের প্রধান দেবী মনসা, আর প্রধান পুরুষ দেবতা ধরম। আদিতে ঘটে পুজো হতো মনসার। পুজোর জায়গায় রাখা হতো জীবন্ত সাপ। নাগপঞ্চমীতে মনসার ডাল পুঁতে দুর্গাপুজোর দশমী তিথিতে তা বিসর্জিত হতো নদীতে। এই গোষ্ঠীর পুরুষেরাই করতো মনসা পুজো। এখন অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ এনেও পুজো করানো হচ্ছে। বীরভূমের বিস্ময়পুরে তাদের নিজস্ব ধরমের পুজো করে সুকুমার চৌধুরী ব্যাধ। পাখমারা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সাপ মারা নিষিদ্ধ। প্রতি বাড়িতে বাস্তু সাপ থেকে গৃহকে রক্ষা করে ব'লে বিশ্বাস করে পাখমারা জনগোষ্ঠী। সে কারণে 'বাস্তুসাপ'কে তারা মর্যাদা দেয় গৃহদেবতার। এই বাস্তুসাপ নাকি গৃহের শুভাশুভের প্রহরী। তন্ত্র এবং লৌকিক দেহতত্ত্ববাদীদের ধারণা, প্রত্যেক ব্যক্তির নাভিমূলে সাড়ে তিন প্যাঁচে সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনীর অবস্থান। সাধনার মাধ্যমে তাকেই জাগিয়ে তোলা সাধকের কাজ। দেহসাধকদের অনেকে মনে করেন যে পেটে সাপের মতো এক জোড়া বড়ো কৃমি থাকে। দেহ-ঘরের তারাই রক্ষক। কুলকুণ্ডলিনীর কৃপাতেই সাধকের উত্থান। সাপ আবার যৌনতারও প্রতীক। নারীর পেটের সাপকে তাই রক্ষা করাও প্রথা।

মহুলার বাড়ি ত্যাগ ক'রে আসার জন্য নাকি বাজার পাড়ায় স্বপ্ন দেখতো ষোড়শীবালা। বাস্তুসাপের স্বপ্ন। সাপ দেখা দিতো, কাঁদতো। ২০০০ সালের বন্যায় নাকি সেই সাপ ভেসে এসেছে বাজার পাড়ায়। তাঁর নিমিত্ত, তাঁর স্বপ্নাদেশেই নির্মিত হয়েছে মনসার মন্দির। আসলে পাখমারাদের নিয়ম-কানুন, আচার-বিশ্বাস সবই অনায়াসে মিশে গেছে হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্যে। লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন পুজো-উৎসব-অনুষ্ঠানে এখন সবার সঙ্গেই মিশে যেতে পারে পাখমারারা। তথাপি তাদের নিজস্ব দেবদেবী হলো মনসা, ধরম এবং শিব।

অনেক আলোচক মনসার প্রাচীন ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তদের দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে থাকেন। কালীয়নাগ দমনকারী কৃষ্ণের উপর 'নাগ' বংশীয়েরা তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। সেই সূত্রেই সাতনল দিয়ে কৃষ্ণ হত্যার কাহিনি পাখমারা সমাজ সাগ্রহে সযত্নে রক্ষা ক'রে চলেছে।

পাখমারাদের এখন আর কেউ যাযাবর নয়। গৃহস্থ এবং বাংলাভাষী। কিন্তু কৃষিকাজে তাদের কারোরই আগ্রহ নেই। কেউই কৃষিতে মনোনিবেশ করেনি। নগরের উপকণ্ঠে তারা বসতি গড়ে তুলেছে। কারখানার শিল্প-শ্রমিক, ভ্যান-রিক্সা চালক, মোটর-ড্রাইভার, রাজমিস্ত্রির কাজের সঙ্গে সঙ্গে তারা যুক্ত হ'য়ে পড়েছে নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে। শিলকুটানো শিখে মধুবালা শিল কুটিয়েও বেড়ায়। পেলে তারা চাকরিও করে। ষোড়শীবালা বলেছিলেন— 'অভাব আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমরা অভাব তাড়ানি।' এই কথাটিই বোধহয় সবচেয়ে বেশি সত্য। পাখমারারা জীবন ও জীবিকার টানে দারিদ্র্যে ক্ষতবিক্ষত হয়েই দিশাহীনভাবে ছুটে চলেছে এক জীবিকা থেকে অন্য উপজীবিকায়। বহুরূপী সাজাও তার ব্যতিক্রম নয়।

বিনষ্ট বৃত্তির জনসমাজের মজুর-শ্রমিক-ছোটো ব্যবসায়ী-নটকর্মী হ'য়ে ওঠার কথা, এমন কী বনের পশুপাখি মেরে জীবিকা নির্বাহের প্রসঙ্গও রয়েছে জাতকের গল্পে। নিরুপায় দরিদ্র

এ জনতার অনেকে ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে বহুরূপীর পেশাক অবলম্বন করেও বাঁচতে চেয়েছে জীবনে। নিম্নবর্গের (!) কিছু মানুষ অভাব এবং স্বভাবের কারণে বহুরূপী বৃত্তিতে এলেও, পাখমারা গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই বহুরূপী সাজে। জীবিকা নির্বাহের পেশা হিসেবে বহুরূপী বৃত্তিকেই তারা গ্রহণ করেছে। বীরভূমের লাভপুর থানার বিষয়পুর গ্রামের পাখমারারা সবাই-ই বহুরূপী সাজে। বর্ধমানের দাঁইহাট এবং বর্ধমান শহরের পাখমারাদেরও অন্যতম প্রধান বৃত্তি বহুরূপী। কিন্তু বহরমপুর মুর্শিদাবাদের বাজারপাড়া-বসন্ততলার পাখমারারা ৩০/৩২ বছর আগেও কেউ বহুরূপী বৃত্তিটিকে জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করেনি। দাঁইহাট থেকে আসা মধুবালাই প্রথম এখানে বিশেষ পুজো অথবা উৎসব উপলক্ষ্যে বাঘ এবং হনুমান সাজতো। তার মোটামুটি মানের সাজপোশাকও ছিল। সেই বহুরূপী দেখিয়ে তার সামান্য রোজগারও বেড়েছিল। তথাপি মধুবালা বা বিশ্বনাথ বহুরূপী সাজাকে সর্বক্ষণের বৃত্তি করেনি, জীবিকা হিসেবেও গ্রহণ করেনি। বরং এই বেশ (বহুরূপীর) দুটি তার মধুসংগ্রহের বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। নিজে বাঘ হলে বা বাঘ সাজলে নাকি বাঘের আক্রমণের ভয় থাকে না। মধ্যবঙ্গে কুলাই ঠাকুরের লৌকিক ব্রত উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে রাখালেরা একজনকে বাঘ সাজিয়ে ভিক্ষে করে। প্রতীক বাঘকে তার প্রাপ্য দিলে সে নাকি গো-বধ করে না, অরণ্যের মধ্যে মানুষকেও আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। তাই তাকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন। একইভাবে গাছের উপরে ছোটাছুটি ক'রে নিজস্ব ক্ষমতা বিস্তার ক'রে থাকে হনুমান। মধু সংগ্রহের ক্ষেত্রে এমন দক্ষতা থাকা দরকার। হনুমানকে নিয়ে একটি নিজস্ব কাহিনি আছে পাখমারা সমাজে। মাছিদের মধ্যে বিষধর হলো 'পাহাড়ি-মৌমাছি'। তাদের চাকের যে অজস্র মুখ থাকে, তা মাটি দিয়ে বন্ধ ক'রে দেয় হনুমান। একটি মাত্র মুখ খোলা রাখে সে। আর সেই একমাত্র মুখ দিয়ে মৌমাছিরা যখন বেরিয়ে আসে, তখন সেগুলিকে ধরে ধরে খায় হনুমান। বিষাক্ত মৌমাছি হনুমানের প্রিয় খাদ্য। মধু সংগ্রহের সময় হঠাৎ মৌমাছির কামড় এক নিত্য সমস্যা। হনুমানত্ব অর্জিত হ'লে নাকি সেই সমস্যা থাকে না। হনুমান সেজে মৌমাছির কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায় মধুবালা। ফ্রেজার কথিত কল্পিত রূপারোপ বা লৌকিক জাদুর বৈশিষ্ট্য এখানে প্রতিভাত হ'তে দেখা যায়। বয়স হওয়ার কারণে বাজারপাড়ার মধুবালার এখন অসুবিধা হয় লাফ্‌ঝাঁপে। কিছুদিন আগে চোখের পাতায় কামড়েও দিয়েছিল মৌমাছি। ছদ্মবেশের সাজও জলে-বর্ষায় নষ্ট হ'য়ে গেছে আজ। তাই এখন আর বহুরূপী সাজে না মধুবালা। তবে সাজপত্র জোগাড়ের চেষ্টায় আছে সে। সুযোগ পেলেই সাজবে বহুরূপী।

পশু বা বহুরূপীর ছদ্মবেশ ধারণে বা মুখোশ ব্যবহারে অভিনয় কেন্দ্রিক অঙ্গসঞ্চালন, নাচ, বক্তব্য এবং নানান রকমের ধ্বনি ব্যবহার ক'রে আদিম মানুষ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো, অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে চাইত। নির্দিষ্ট সাজ বা মুখোশ ধারণ করলে সেই শক্তি ভর করে নরদেহে এবং সেই শক্তির প্রভাবে অনেক দুঃসাধ্য কাজও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। অনায়াসে অনেক কঠিন কাজও করতে পারা যায়, এ বিশ্বাস আছে পাখমারাদেরও। এরই কারণে নানান লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাসে, ছদ্মবেশে, সং-মুখোশে বহুরূপ গ্রহণের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। কালে ধর্মবিশ্বাস থেকে ছিন্ন হ'য়ে বহুরূপ ধারণ রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ হয়ে ওঠে। অবশেষে বহুরূপী একটি বৃত্তি বা অন্নসংস্থানের উপায় হ'য়ে দাঁড়ায়।

বহরমপুরের বাজারপাড়া বা বসন্ততলার পাখমারাদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বর্ধমানের দাঁইহাট, রঘুনাথগঞ্জের মিঠিপুর, বাসুদেবখালি, বীরভূমের ভালকুঠি-বিষয়পুরের। সেসব জায়গার সূত্র ধরেই বহুরূপী বৃত্তিটি এসেছে এখানে। কালীপদ রায় বলেছেন—বীরভূমের বিষয়পুরের অর্ধযাযাবর পাখমারারা এখানে এসে ২৫/৩০ বছর আগে কাউকে কাউকে বহুরূপী বৃত্তিতে প্রশিক্ষণ দেয়। সেই শুরু বহুরূপী সাজা।

সঞ্জয়ের এক বোনের বিয়ে হয়েছে বিষয়পুরে। তাদের ভগ্নিপতি বহুরূপী সাজে। তিনিই সঞ্জয়কে বহুরূপীর শিক্ষা দিয়েছেন। ভূমিহীন, নির্দিষ্ট বৃত্তিহীন সঞ্জয় বহুরূপী সেজেই সংসার চালায়। সঞ্জয়ের সূত্রেই সুব্রত এবং আরও কয়েকজন পেশা হিসেবে বহুরূপী বৃত্তিটিকে গ্রহণ করেছে। সঞ্জয়ের ২ মেয়ে এবং ১ ছেলে, সে নিজে স্বাক্ষর, বয়স এখন ৩৫-এর উপর।

এখান থেকে একটু দূরে বাসুদেবখালিতে আরও ২/৩ ঘর পাখমারা থাকে। দাঁইহাট থেকে শ্বশুরবাড়ি এসে এখানেই স্থায়ী হয়েছে ৩২ বছরের লক্ষ্মণ রায়। সে নিজে ভূমিহীন জনমজুর হলেও বহুরূপী সাজে। তার ৫ মেয়ে। দাঁইহাটে থাকতেও সে বহুরূপী সাজতো। গঙ্গার তীরের পাখমারারা কেউ বহুরূপী বৃত্তি গ্রহণ করেনি। শক্তিপুরগামী রাস্তার পাশে পাখমারাদের পাড়ার অবশ্য অনেকেই বহুরূপী বৃত্তি গ্রহণ করেছে। মেয়েরা কেউ এখানে বহুরূপী সাজে না, তবে পুরুষদের সাজিয়ে সাহায্য করে। নিজের হাতে সন্তানকে বহুরূপী সাজায় মাধবী রায়। অনেকে আবার বাড়ি থেকে সেজে বেরোয়না বা সেজে ঢোকে না। পথে কোথাও সেজে নেয়। বহুবৃপীর সাজে তাদের সংকোচ দেখা যায়। তবে এমনটি বীরভূম-বর্ধমান-হুগলির বহুরূপীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তারা তাদের পেশাকে অনেক ক্ষেত্রেই বেশ সম্মানের চোখে দেখে।

বাজারপাড়া-বসন্ততলায় বহুরূপীর বৃত্তিধারী ২৭ বছরের সুব্রত রায়ের অষ্টম মান পর্যন্ত পড়াশুনা। দাদা রাজমিস্ত্রি, স্ত্রী সাহা পরিবারের মেয়ে। বহুরূপীর শিক্ষা বিষয়পুরের জামাইবাবুর কাছে। কমল বিশ্বাসের পরিবারের সবাই অর্থাৎ দুই ছেলে, জামাই এবং নাতনিও বহুরূপী সাজে। কমলের স্ত্রী মাধবী বিষয়পুরের বহুবৃপীদের মেয়ে। সেই 'বহুরূপী' সাজতে উৎসাহ দেয় প্রত্যেককে, সাজিয়েও দেয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। কমলের ছেলে বচন রায় এবং জয়দেব রায় বহুরূপীর শিক্ষা নিয়েছে সুব্রতর কাছে। সুজিত রায় ১৮ বছরের যুবক। তার বাবা রিক্সা চালায়। পাঁচ বছর ধরে বহুরূপীর কাজ করছে। ৩৮ বছরের সঞ্জয় রায়ও বহুরূপী সাজে।

ট্রেনে-বাসে-শহরে-গঞ্জে-হাটে-বাটে বহুরূপী দেখিয়ে তেমন আর সম্মান মেলে না। সারাদিনে ৩০/৪০ টাকা রোজগার হয়। যা কিনা দিন-মজুরীর চেয়েও কম। কাজেই 'ও-আর ভিক্ষা ভিন্ন কি'? এ ধারণা বসন্ততলার-বাজার পাড়ার বহুরূপীদেব। যথেষ্ট এবং উন্নত সাজপোশাক-প্রসাধন না থাকলে নতুন ও আকর্ষণীয় ছদ্মবেশ ধারণ কবা বা বহুরূপী সাজা যায় না। কালনায় এক বহুরূপী একারণেই বলেছিল—'ছেঁড়া পুরনো পোশাক পরলে বহুরূপী নয়, জোকার লাগে—জোকার'। বেশভূষায় জনচিত্ত আকর্ষণ করতে না পারলে উপার্জন কমে যায়। পেশাটিতো উপার্জন এবং ভিক্ষার মাঝামাঝি। ঐতিহ্যবাহিত রং বা সাজপোশাক এখন আর ব্যবহৃত হয় না। সবই কিনতে হয় বাজার থেকে। বাজার পাড়ার বহুরূপীদের আর্থিক সামর্থ দুর্বল। তাবা বহুরূপীর সাজপোশাকে সেভাবে অর্থ বিনিয়োগ করতে না পারায়

নতুন নতুন ছদ্মবেশ ধারণে অক্ষম হয়। উপরন্তু সরকারী দপ্তর হ'তে বহুরূপী সাজার শংসাপত্র না পাওয়ায় ট্রেনে-বাসে কনডাকটর এবং পথে-বিপথে পুলিশদের কাছে হেনস্থা হ'তে হয় তাদের।

বসন্ততলার বহুরূপীরা গভীরতর বিশ্বাস থেকে বা গভীর চিন্তাভাবনায় বেশ ধারণ করেনা। তাদের বহুরূপের রূপগুলিও প্রচলিত এবং সাদামাটা। তারা সাধারণত পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, হরপার্বতী, রাধাকৃষ্ম, কালী, মহীরাবণ, তারকা রাক্ষসী প্রভৃতি সাজে। পশুদের মধ্যে তাদের বাঘ আর হনুমান ই প্রিয়। সামাজিক সাজের ক্ষেত্রে ব্যাধ-পাগল-ডাকাত-খুনি-হঠাৎবাবু-গোয়ালিনীর সাজ দেখা যায়। খুদি-গয়লানি সেজে এরা শেষ দিন সিধে আর টাকা তোলে ৫/৭ দিন বহুরূপীব বিভিন্ন সাজ দেখানোর পর। খুদি গয়লানির মধ্যে রাধার স্মৃতিকে বহন করে বহুরূপীরা। সাবা বাংলাতেই এই গয়লানি চরিত্রটি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। বাংলার গ্রামে-ঘরে বহুরূপী গযলানির সাজটি সবারই প্রিয় ও প্রাণের। সে কারণেই কাকতালিয় হলেও উল্লেখ করা যেতে পারে, ঘোষ বাড়িতেই বহুরূপী- পাখমারাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়েছে সর্বাধিক। বাজার পাড়ার বহুরূপীরা বসবাসও করে ঘোষেদের সঙ্গেই পাশাপাশি।

ভুবনায়নের ফলে দ্রুত পরিবর্তনের বাতাস লেগেছে আজ নিস্তরঙ্গ গ্রামদেশেও। পরিবর্তনের কারণেই আমোদ-প্রমোদের নানা শাখা-প্রশাখাও উজ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে। বহুরূপী বৃত্তিটিও তাই অনেকটাই ভিক্ষার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে বাধ্য হয়েই। আবার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কর্মহীনতা, কৃষিকাজে অনীহা এবং সর্বোপরি দুঃখ-দারিদ্র্যের অনাবিল অন্ধকার আবৃত করেছে বাজারপাড়ার পাখমারা জনগোষ্ঠীকে। তাই অন্য রূপের মধ্যে আত্মলোপ ক'রে অথবা অন্যরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে এই বঞ্চিত মানবগোষ্ঠী মানুষের মূল স্রোতের তালিকায় নাম লেখাতে চেয়েছে অনিবার্য সমাজ-বাস্তবতার বৃত্ত-বিন্যাসেই।

বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার-দোমহানী পোবনি এবং জামুড়িয়া থানা এলাকায় 'পাখমারা' 'শিয়ালমারা' বলে পরিচিত দু'একটি জনগোষ্ঠী আছে। হত-দরিদ্র এইসব মানুষজনের সামান্য সম্মানও দেখিনি ওখানে। স্থানীয় মানুষজন তাদের 'গুলগুলিয়া' পাখমারা-যাযাবর ব'লে অবজ্ঞা ক'রে থাকে। 'গুল্‌গুলিয়া' শব্দটি শুনে ওদের রাগও হ'তে দেখেছি ভীষণ। তবে ওদের চলন-বলন এবং সামাজিক অবস্থান দেখে মনে হয়েছে এরা পাখমারাই। কিন্তু এখানে এই দামোদরপুর-বোরিংডাঙা-ফরিদপুর এলাকায় তারা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত এবং হতদরিদ্র। স্থানীয় মানুষজন তাদের খোঁজখবরই রাখে না, তারাও নিজেদের পরিচয় বা অবস্থান বলেনা অন্যদের কাছে। ফরিদপুবের বহুরূপীদের অবশ্য একতলা পাকা বাড়ি হয়েছে। তবে তা বহুরূপী দেখিয়ে নয়, কয়লার কালোতে মগ্ন থেকেই।

জামুড়িয়া থানা মোড় থেকে বড়ো রাস্তা ধ'রে একটু এগিয়ে বাঁদিকে সরু গলি রাস্তা। এই গলিপথের সামান্য ভেতরে গেলেই একটি বিশাল বট গাছকে ঘিরে পাখমারাদের পাড়া, স্থানীয় বাসীন্দারা বলে 'গুলগুলিয়াদের পাড়া'। জায়গাটির নাম বোরিংডাঙা। এখানে কয়েকঘর হতদরিদ্র পাখমারাদের বাস। এরা এখানে স্থায়ীভাবে থাকেও না। তবে ঠেক্ বা আটন এখানেই। তেমন কোনো কাজ করে না এখানের পুরুষেরা। সারাদিন শুধু মদ খেয়ে

বুঁদ হ'য়ে বসে থাকে গোল হয়ে। আমি দুপুর ১২টার সময় যখন ওদের কাছে গেলাম তখনও মাটির হাঁড়ি থেকে মদ ঢালছে কাচের গ্লাসে। ওদের কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুলের দলপ্রধান কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিল না। তাই পাশের মানুষজনের কাছ থেকেই ওদের খবর সংগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু বারবারই ভাবনার ডানা মেলেছে আমার, এইভাবে কাজকর্ম বিহীন শুধুমাত্র মদ খেয়েই পেরিয়ে যাচ্ছে একটি জীবনের সীমায়িত সময়কাল!

জামুড়িয়া স্টেট ব্যাঙ্কের উল্টো দিকের পিচ্ ঢালা পথ ধ'রে উত্তরে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। তারপর ডাইনে ঘুরে বিশাল বট গাছের কাছে চলে গেছে মোরাম মাটির পথ। গাছে ঝুল্‌ছে দড়ির শিকলে বাঁধা ৮/১০ বাড়ির সংসার। ভাতের হাঁড়ি থেকে সব্জীর ঝুড়ি পর্যন্ত। ঝুল্‌ছে দোলনায় বসে পাখমারাদের বাচ্চারাও। অদ্ভুত জীবনযাপনের পথ ও পদ্ধতি। এটিই দামোদরপুরের পাখমারা পাড়া। এখানের বেশ ক'জনই বহুরূপী সাজে। তবে এখানে নয়। বাইরে দূরে বহুরূপী দেখায় ওরা। অতি দরিদ্রের সংসার প্রত্যেকেরই। সর্বমোট ২০ ঘর পাখমারার বাস এই দামোদরপুরে। এরা সবাই তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। তবে প্রত্যেকেই বাংলাভাষা জানে।

বর্ধমান জেলার কালনা রেল স্টেশনের ২নং গেটের কাছেই নিউ-মধুপুর কলোনী। এখানেই বহুরূপী পাখমারাদের বাস। মোটামুটি একটি ভালো অবস্থানে আছে এখানের বহুরূপীরা। তবে প্রত্যেকেই দরিদ্র। অতিকষ্টেই সংসার চলে তাদের। অনেকেই এখানে বহুরূপী দেখায়। জামুড়িয়ার বেঙ্গালা ডোম-ও বহুরূপী দেখায়।

লোকসংস্কৃতির গবেষক ড. সুধীর করণ এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন— 'পাখমারা' বলে কোনো জাত নেই। লোয়ার কাস্ট অফ্ দি পিউপিল। হিন্দু সমাজের নিচুতলার মানুষ। উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে বহুরূপী বৃত্তিটিকে। ট্রাইব্যাল হিসেবে 'ব্যাধ' আমার চোখে পড়েনি। মাল-বাগ্দীরাও হিন্দু সমাজের নিচু তলার মানুষ। সবাই দরিদ্র, খুবই অভাবি শ্রেণির মানুষ। বহুরূপী ব্যাপারটি মধ্যযুগের বৈষ্ণব প্রভাবের কোনো ফল নয় বলেই আমার ধারনা। এর সূত্র বৈদিক বা প্রাক্‌বৈদিক আমলেই পাওয়া যেতে পারে।' হনুমানকে বাঙালিরা খুব অবহেলা করেছে। বোকা-অক্ষম ছেলেকে 'হনুমান' বলা হয় এখনও। 'হনুমান' অর্থ বাঙালিদের কাছে বোকাসোকা মোটা বুদ্ধির মানুষ। অথচ তামিল রামায়ণে আছে, রাবণের ছেলে মেঘনাদ-ইন্দ্রজিৎ মারা যাবার পর লঙ্কার সিংহাসনে বসার জন্য হনুমান মনোনীত হয়েছিলেন। এই হনুমানকে নিয়ে নতুনভাবে ভাবনার বৃত্ত রচনার সুযোগ আছে। হিন্দী বলয়ে অবশ্য বজরংবলী হনুমানের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বহুরূপীদের ক্ষেত্রেও হনুমান একটি প্রিয় চরিত্র। পাখমারা সম্প্রদায় হিন্দু সমাজেরই নিচুতলার দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। প্রাথমিকভাবে পাখি শিকার আর মধু সংগ্রহের কাজ করতে করতেই তাদের বাঘ আব হনুমান সাজা। পরে এই দরিদ্র মানুষগুলি শুধুমাত্র পেটভরানোর তাগিদেই বহুরূপী সেজেছে। তবে বাংলার বহুরূপীদের ক্ষেত্রে এই পাখমারাদেরই সংখ্যাধিক্য রয়েছে। অন্য দরিদ্র শ্রেণির মানুষও সহজে রোজগারের আশায় এসেছে এই জীবিকায়।

বহুরূপী : জীবন ও শিল্প

একসময় দৌর্দণ্ড দাপট ছিল বহুরূপীর। পাঁচ-সাত খানা গ্রাম নিয়ে শিবির করতো তারা। পালা করে সাজতো রাম, কৃষ্ণ, একই দেহে হরগৌরী, হনুমান, পরশুরাম, মহীরাবণ, চণ্ডালবেশি রাজা হরিশ্চন্দ্র, ভয়ঙ্কর দর্শন তারাসুন্দরী বা তারাক্ষেপি অথবা তারকা রাক্ষসী, কালী, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি। শেষের দিনে দুগ্ধ বিক্রেতা সুবেশা গোয়ালিনী, কচ্চিত গোয়ালা। পরপর সপ্তাহ জুড়ে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে বহুরূপে কখনো সংলাপে কখনো অভিনয়ে খণ্ড এককের পালা শুনিয়ে—বিলাপ গেয়ে আতঙ্ক বা আমোদের কাঁপন তুল্‌তো বহুরূপী। কখনো হুপ্ ক'রে একেবারে বারান্দায় হাজির হয়ে বৌ-বাচ্চাদের চম্‌কে দিয়ে কৌতুকের আসর জমিয়ে দিত। শিশুরা সেসব দেখে নকল করতো, হনুমানের মতো ঝাঁপ দিতে শিখতো। শেষের দিন রূপবতী পরচুলা পরে ঘাগরা দুলিয়ে গোয়ালিনী আসতো। কাঁখে দুধের ঘটি, মাথায় দুধের কলস। কোমর দুলিয়ে, নাকের নথ্ নড়িয়ে, চোখের ভুরু কাঁপিয়ে বৃন্দাবনের গোয়ালিনী মথুরার হাটে এসে মেয়েলি সুরেলা কণ্ঠে অনুযোগের সুরে আবেদন রাখতো—'দিনে দিনে শুধু দুধই খেল্যা। দাম দিবার নাম নাই। পিতি পত্যেকের এক'শ টাকা করে বাকী। এই আঁচল পেতে বসল্যাম, কড়ায়-গণ্ডায় সব বাকী মিটিয়ে দাও। নইলে ঘোষ কানুকে নালিশ জানালে আর রক্ষে থাকবে না। পারের পারাণির সাথে সে আমার দেনাটাও পাই-পয়সা আদায় করে ছাড়বে।' এমন অপরূপ কথাবার্তা নানান ভঙ্গিমা করে বহুরূপী বলতো। শুনে খুশি হ'য়ে চাল-পয়সা দিত সবাই। কেউ পুরনো কাপড়-চোপড়ও দিতো। গোয়ালিনী বেশের বহুরূপী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বাড়ির কোনো যুবকের দিকে এমন বাঁকানো ভ্রূভঙ্গিমা দেখিয়ে যেতো যে সমস্ত লোকজন হেসে কুটি কুটি হতো। তাদের চাল-চলন-সংলাপ বারবারই বদ্‌লে যায়, অথবা বদল করেই মুখে যা আসে তাই বলে তারা। তাই একই কথা ঘুবিয়ে ফিরিয়ে অনেকবারই শুনতে হয়। তবু তারই মধ্যে আনন্দ এবং সমাজশিক্ষা থেকে গেছে অনেকটাই।

যদিও আশ্চর্য গ্রামীণ এই লোকশিল্পটি আজ বড় বিপন্ন। আগে বহুরূপীরা তাদের শিল্পকলা প্রদর্শন ক'রে সহজেই নিজেদের খোরাক জোগাড় করতে পারতো, আজ আর সম্মানের সঙ্গে সে রোজগার সম্ভব হচ্ছে না। সংসার চালানো কষ্টকর হ'য়ে উঠেছে। সেদিনের শিল্প এখন যেন ভিক্ষায় পরিণত হয়েছে। আর ভিক্ষুকের জীবনে মানুষের করুণা কুড়িয়ে বেঁচে থাকার গ্লানি এইসব লোকশিল্পীদের নয়া-প্রজন্মকে সেভাবে আকর্ষণ করতে পারছে না। নিষাদ বা ব্যাধ সম্প্রদায়ভুক্ত বহুরূপীদের অধিকাংশেরই কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই। গ্রাম ছেড়ে বহুরূপী শিল্পটি শহরে আদৌ ঠাঁয় ক'রে নিতে পারেনি। রাম-হনুমান-কৃষ্ণ সেজে হত-দরিদ্র পরিবারের শিশুরা ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষে করে মাত্র। যাদের স্কুলে যাওয়ার বয়স,

তারাই সাজে বহুরূপী। কেউ কেউ অবশ্য ইতিমধ্যে কৃষিকাজে মন দিতে শুরু করেছে, পড়াশুনাও করছে। তথাপি এত যন্ত্রণা-অনটন-অসহযোগ-অপসংস্কৃতির মধ্যেও লোকশিল্পীরা অনেকেই 'বহুরূপী' শিল্পটিকেই আঁকড়ে থেকে বাঁচার পথ খুঁজছে। বহুরূপ গ্রহণের আসক্তি ও আনন্দই তাদের পথে নামায়, গৃহস্থের উঠোনে—সদর দরজায় দাঁড় করিয়ে দেয় ভুবন বিজয়ী বিশ্বত্রাস মহীরাবণের সাজে—'বিশ্বত্রাস মহীরাবণ আজ তোমার দরজায়। যদি কোনো অন্যায়, কোনো পাপ, কোনো অসামাজিক কাজ তুমি করেছো, তবে আজ আর তোমার নিস্তার নাই।'' এই সচেতনতার বাণী গ্রাম-গঞ্জের ঘরে ঘরে লোকশিক্ষকের মতোন শুনিয়ে বেড়ায় যে বহুরূপী, তারও সমানে জোটেনা দু'বেলার খাবার। তাই তাদের শিশুরা বাল্যবেলাতেই বইপত্তরের বদলে মুখে রং মাখতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। শৈশবের সব স্বপ্ন ভুলে পথে নামে ভিক্ষায়। তার মা-ই তাকে সস্নেহে সাজিয়ে দেয় রাম-কৃষ্ণ অথবা হনুমান কিংবা শিব।

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ তীর্থেও ছোটো ছোটো শিশুদের শিব সাজিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় ভিক্ষায়। তাবা অবশ্য জীবিকার কেউ বহুরূপী নয়। পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের (কলকাতা) উদ্যোগে ২০০৪ সালে একটি পঞ্জি প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে প্রত্যন্ত গ্রামের শিল্পীদেরও সন্ধান পাওয়া যায় সহজে। সেই ডাইরেক্টবিতে বহুরূপী বিষয়ে সামান্য মুখপাত্ এবং কয়েকজন বহুরূপীর ঠিকানা ছিল। সেখানে লেখা হয়েছিল—

Bahurupee :

(Directory : Folk & Tribal cultural centre ❑ Feb 2004 Edn.)

This word 'Bahurupee' had been derived from 'Bahurup' which signifies multiforms. Bahurupees are capable of assuming or disguishing various typcs of appearances. This particular form of art did not arise from any religious beliefs. It is completely secular in nature and had arisen from the hunger of the general low caste, poverty stricken backward classes of agrarian society. Bahurupees are mostly found in Birbhum, Bardhaman and Murshidabad districts of West Bengal. They earn their livelihood by amusing people with different appearances. Two to three members are needed for the performance of Bahurupee.

District : Bardhaman.

1. Ashok Roy, C/o-Ma Siddheswari Group, Vill + P.O.–Ukhra.

District : Birbhum.

1. Jiten Das, Vill + P.O.—Naotara
2. Kartick Das, Vill—Maldhiha, P.O.—Kabilpur.
3. Subal Das Bairagya, Vill—Kulia, P.O.—Bangachatra.
4. Sukumar Choudhury, Vill—Bishaypur, P.O.—Bhalkuti, Lavpur.
5. Uttam Bajikar, Bhalkuti, Bishaypur, Chouhatta.

District : Murshidabad,

1. Bachchan Biswas, Vill—Bajarpara, P.O.—Radharghat.
2. Jaankumar Biswas (Choudhuri), Vill + P.O.—Mithipur.
3. Kamal Biswas, Vill—Bajarpara, P.O.—Radharghat.
4. Kanai Roy, Vill—Bajarpara, P.O.—Radharghat.

বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরেও একটি তালিকা আছে বহুরূপীদের। সেখান থেকে সরকারী অনুষ্ঠানে ডাক পাঠানো হয শিল্পীদের। তালিকাটির নাম ও ঠিকানাগুলি এখানে দেওয়া হলো

১. সুবলদাস বৈরাগ্য—কুলিযা, পো : বঙ্গছত্র (নানুর ব্লক), ফোন—৯৫০৩৪৬৩, স্বপ্না দে—২২৭৪৩১, সাগর দত্ত—২২৭৩৮১।

২. দিলীপ চৌধুরী—বিষয়পুর, ভালকুঠি, লাভপুর ব্লক।

৩. সুকুমার চৌধুরী—বিষয়পুর, ভালকুঠি, লাভপুর ব্লক।

৪ জিতেন দাস—গ্রাম + পো : নাওতারা, লাভপুব ব্লক।

৫. অজিত দাস—ভগবানবাটি, পো : ইকড়া।

৬. হরিচরণ দাস—নানুবাজার।

৭. বিদ্যাসাগর আঁকুড়ে—গয়রা, সিউড়ি ২নং ব্লক।

৮. উত্তম বাজিকর—ভালকুঠি, বিষয়পুর, চৌহট্টা।

৯. রিক্ত দাস— ভ্রমরকোল, আমোদপুর।

১০. উত্তম চৌধুরী—ভালকুঠি, বিষয়পুর, চৌহট্টা।

১১ কার্তিক দাস—গ্রাম: মালডিহা, পো: কবিলপুর, মহম্মদবাজাব ব্লক।

১২. শরীন দাস—মহম্মদ বাজার।

মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান বা অন্যকোন জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে এইরকম বহুরূপীদের পঞ্জি নেই, তবে লোকসংস্কৃতির শিল্পীদের পঞ্জি রয়েছে। বেশ বোঝা যায়, অতীতে বহুরূপীর শুধুমাত্র শিল্প মূল্যই ছিল না, ছিল সামাজিক মূল্যও। কিন্তু শিল্পের চেয়ে জীবন চিরদিনই বড়ো। যারা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না, তারা কিভাবে ধ'রে রাখতে পারে বহুরূপীর নান্দনিক শিল্প মূল্য? যে শিল্পের সরাসরি ফেরৎযোগ্য কোনো লাভ নেই, বিনিময়যোগ্য কোনো বস্তু নেই, প্রায় একই নাট্যকলার বহুরকম ভেদ্ বাজারে চালুও আছে যা বহুরূপীকে ছাপিয়ে যেতে সক্ষম। এই রকম একটি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছে আজকের বহুরূপী শিল্প। এ সময় ঠাকুর-দেবতাব প্রতি, পাপ-পুণ্যের প্রতি, ন্যায়-অন্যায়ের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বোধও কমে এসেছে। এখন হাতের মুঠোয় 'রিমোট', 'কমপিউটার-স্ক্রিন', হাতের তালুতে খুলে গেছে ভুবনায়নের দরজা। এবং তা এখন অন্ধ গ্রামের শোবার ঘর পর্যন্তই পৌঁছে গেছে অনায়াসে। সুতরাং আর বহুরূপী দেখবে কে? হ্রাস পেয়েছে চাহিদার। বহুরূপী শিল্পী অনেকটাই এসে দাঁড়িয়েছে পথে। ভিক্ষুকের প্রায়। আসলে, বহুরূপী এমন একটি পেশা বা শিল্প যার সরাসরি কোনো বিনিময় মূল্য বাজারের চাহিদা মেটাচ্ছে না। মানুষজন দেখছেন, দেখে কারো কারো ভালোও লাগছে, আবার আমোদ-কৌতুকেই ফুরিয়ে যাচ্ছে তা। স্থায়ীত্ব আসছে না কিছুতেই। ক্ষণিকের মজা বহুরূপী। এই পেশায় যারা সংযুক্ত রয়ে গেলেন, তারাও আর ফিরে আসতে পারছেনা সেখান থেকে। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাঁচা, দিনের শেষে নগদ পয়সার মুখ সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। তাই মুখে রং মেখে ১২/১৩ বছরের বালক-বালিকাও ট্রেনে ট্রেনে বহুরূপী দেখিয়ে ভিক্ষে করছে। যখন তাদের স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন, তখন তাদেরই মা নিজের হাতে আপনার সন্তানের মুখে রং মাখিয়ে সেলাইকরা জীর্ণ পোশাকখানি পরিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছেন রাম-কৃষ্ম বা হনুমান। শেষ বিকেলে পকেট ঝেড়ে ১০/১৫টা টাকা বেঁধে রাখছেন নিজের

খুঁটে। বঞ্চিত বালক বা বালিকাও দেখতে পায় তার অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা। সুতবাং ফিবে আর যাওয়া হয় না অন্যদিকে, কিংবা বই খাতা নিয়ে অন্য শিশুদের মতো বসে যাওয়া যায় না পাকুড়তলার পাঠশালায়। এভাবেই দরিদ্র বহুরূপী পরিবারের শিশুদের শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে, অগাধ বঞ্চনায় শোষিত হচ্ছে তাদের কিশোরীরাও। বিনিময়যোগ্য পণ্যবস্তু দেবার সুযোগ বহুরূপীর প্রায় নেই। তার যোগ শুধু নাটক-সংলাপ-অভিনয় ও সাজসজ্জার সঙ্গে। দেহ না পারলে যাত্রা-নাটক-সিনেমার শিল্পীর মতোই লোকশিল্পী বহুরূপীও 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'!

বহুরূপীর জীবন-যাপন মূলত অবহেলিত এক নটের খাদ্যান্বেষণের করুণ লড়াইয়েরই ছবি। যেখানে সে অনেকটা পরাজিতও। আসলে বহুরূপীকে যাঁরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, বৃত্তি হিসেবে জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে নিয়েছেন—তাঁদেরও আড়ালে এক নির্মম সত্য লুকিয়ে আছে। সমাজের প্রান্তীয় নিম্নবর্গের এক শ্রেণির মানুষ একান্তভাবেই সমাজের অন্যান্য কাজকর্মে অংশ নিতে না পেবে নিজের সামান্য অভিনয় ক্ষমতাকে সম্বল করেই একদিন পেট ভরানোর তাগিদেই মুখে রং মেখে বহুরূপী সেজেছে। পথে নেমে এসেছে। জৈবিক ক্ষুধাই তাদের বহুরূপী বৃত্তিতে টেনে এনেছে। অবশ্য কৃষিকাজ বা কল-কারখানার কাজেও তাদের দক্ষতা একেবারেই ছিল না। সেই সুযোগেই সামাজিক বর্জনের শিকার হ'য়েছে তারা। অর্থ-সামর্থে জৌলুষহীন বিবর্ণ জীবন-যাপনে বাধ্য হয়েছে। উপবাস-নিরক্ষরতা-অস্বাস্থ্য সম্বল করেই কোনোক্রমে টিকে আছে। তথাপি চোখের মণির মতো আগলে রেখেছে বহুরূপী লোককলাটিকে। যদিও সেখানে কোনো উৎকর্ষতা নেই, উন্নতির কোনো লক্ষণ তারাও দেখতে পান না। তাই হতাশাকে বিনাশ করতে পারে না বহুরূপীরা, সে রেশ ছড়িয়ে এবং জড়িয়ে আছে জীবন জুড়ে। বহুরূপী দেখিয়ে যে সামান্য রোজগার হয় তারই দিকে তাকিয়ে থাকে তার পরিবারের অন্তত পাঁচজন। তাই প্রতিদিন রেলের হকারদের মতো নিয়ম ক'রে মুখে রং মেখে পরচুলা পরে জীর্ণ পোশাক শীর্ণ দেহে চাপিয়ে সকালেই বেরুতে হয় বহুরূপীকে। সেই তার জীবন, সেই তার সংগ্রাম। তারই মাঝে আনন্দ খুঁজে নিতে পারলে অবশ্য মন্দ লাগে না, ঘর-সংসার-ক্ষুধা সবই তখন জয় করা যায় অনায়াসে।

বহুরূপী শিল্পটি অবশ্য খুব বেশিদিন গৃহীত হয়নি লোকসংস্কৃতির আঙনে। এই লোকশিল্পটির শিল্পীরাও উপযুক্ত মর্যাদা পাননি আজও। এখনো ভিক্ষুকের থেকে খুব বেশি উঁচুতে তুলে আনা যায়নি বহুরূপী লোকশিল্পটিকে। এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা থেকেই ১৯৮৮ সালের ৯ ও ১০ অক্টোবর মূলত রসিক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার সদব শহর বহরমপুবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'প্রথম বহুরূপী রাজ্য সম্মেলন'। সেই-ই প্রথম লোকশিল্পী বহুরূপীদের দিকে সামান্য নজর পড়লো আমজনতার। রসিকজন এলেন এগিয়ে। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অধ্যাপক সত্রাজিৎ গোস্বামী এবং আহ্বায়ক ছিলেন শ্রী নির্মল সরকার।

সত্রাজিৎ গোস্বামীর লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি সেই সম্মেলনের প্রচারপত্রে বহুরূপীদের প্রথম সম্মেলনের উদ্দেশ্য—

১. প্রাথমিকভাবে বহুরূপী বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলিকে সংগঠিত করা।

২. সাধারণ মানুষকে এই লোকশিল্প ও শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ক'রে তুলে বৃত্তিটির শিল্পগত দিকটি সম্পর্কে সচেতন করা।

৩. বহুরূপী শিল্পের মান উন্নত ক'রে তাকে সময়োপযোগী ক'রে তোলার চেষ্টা করা। ওই প্রচারপত্রেই লোকশিল্পী বহুরূপীদের পক্ষ থেকে কয়েকটি দাবী তুলে ধরাও হয়েছিল।

১. বহুরূপীকে লোকশিল্পী হিসেবে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিতে হবে।

২. দুঃস্থ লোকশিল্পী হিসেবে বহুরূপীদের সরকারী সহায়তার আওতায় আনতে হবে।

১৯৮৮ সালের 'প্রথম বহুরূপী রাজ্য সম্মেলনে'র প্রথম দিন অর্থাৎ ৯ অক্টোবর শহীদ সূর্য সেন পার্কের মাঠে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বহুরূপীরা এসে সমবেত হন। ঐ দিনই সন্ধ্যায় বহরমপুরের 'রবীন্দ্র সদন' মঞ্চে একটি আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলা-সমাহর্তা দেবাদিত্য চক্রবর্তী; প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়। ড. চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বহুরূপী শিল্পকে একটি বিশিষ্ট লোককলা হিসেবে স্বীকৃতি জানান এবং এই সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজনকে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন পদক্ষেপ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মঞ্চে শ্রী নির্মল সরকার এবং অধ্যাপক সত্রাজিৎ গোস্বামীও বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৫৬ জন বহুরূপী তাঁদের কলাকৌশল এবং শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

পরদিন ১০ অক্টোবর ১৯৮৮, সকাল ৮টায় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে সম্মেলনে উপস্থিত বহুরূপীদের এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়। সেখানে তারা তাদের আর্থিক-সামাজিক-পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদির কথা তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকারের পর বহুবর্ণ পোশাকে সজ্জিত হ'য়ে বহুরূপীরা এক আকর্ষণীয় শোভাযাত্রা নিয়ে বহরমপুর শহর পরিক্রমা করেন।

সম্মেলনে উপস্থিত ৫৬ জন বহুরূপী প্রতিনিধিদের তলিকা :

বীরভূম—১, আনন্দগোপাল চৌধুরী, ২. সনাতন চৌধুরী, ৩. উত্তমকুমার মণ্ডল, ৪. সুকুমার চৌধুরী, ৫. অশোক বাগ, ৬. ক্ষুদিরাম মণ্ডল, ৭. দিলীপকুমার চৌধুরী. ৮. কাজল চৌধুরী, ৯. পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, ১০. ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ১১. নয়নকুমার চৌধুরী, ১২. হীবু কোনাই, ১৩. রাম চৌধুরী, ১৪. ফটিক চৌধুরী, ১৫. দুলাল চৌধুরী, ১৬. দলিল চৌধুরী, ১৭. আশুতোষ রায়, ১৮. নবকুমার চৌধুরী, ১৯. বিবেক চৌধুরী, ২০. অজিত চৌধুরী, ২১. অরুণকুমাব চৌধুরী, ২২. বরুণ চৌধুরী, ২৩. কাশীনাথ চৌধুরী, ২৪. নিমাই চৌধুরী, ২৫. নিত্যগোপাল চৌধুরী, ২৬. মদন চৌধুরী।

মুর্শিদাবাদ—২৭. ঘেন্টু চৌধুরী, ২৮. জানকুমার চৌধুরী, ২৯. শচীন ব্যাধ, ৩০. নাড়ুগোপাল ব্যাধ, ৩১. বাবলু চৌধুরী, ৩২. শৈলেন ব্যাধ, ৩৩, বিশ্বনাথ রায়, ৩৪. গোপেশ্বর চৌধুরী।

বর্ধমান— ৩৫. সুকুমার রায়, ৩৬. লক্ষ্মণ রায়, ৩৭. হাবু রায়, ৩৮. অর্জুন রায়, ৩৯. সুদাম মণ্ডল, ৪০. সুফল রায়, ৪১. কানাই রায়, ৪২. দেবু রায়, ৪৩. দিলীপ রায়, ৪৪. বলরাম রায়, ৪৫. নিরঞ্জন রায়, ৪৬. পরেশ রায়, ৪৭. ভরতচন্দ্র রায়, ৪৮. সুদাম কোনাই, ৪৯. সুজিত রায়, ৫০. অশোক রায়, ৫১. গণেশ রায়, ৫২. লক্ষ্মণ রায়, ৫৩. কার্তিক রায়, ৫৪. স্বপন হালদার, ৫৫. নরেশচন্দ্র রায়।

নদিয়া— ৫৬. সুখনাথ ঘোষ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের চিচড়া-বাঁধগোড়াতেও একজন আগে বহুরূপী দেখাতেন. চিচড়াব 'চালচিত্র' পত্রিকার সম্পাদক সৌমেন সাউ জানিয়েছেন সে আর বহুরূপী দেখায় না। তাকে আর দেখাও যায় না।

বহুরূপীরা এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। বিষয়পুরের সুকুমার সস্ত্রীক উখরা, আমোদপুরে থেকে যান বহুদিন। শীতলগ্রামের বিদেশ বাজিকররা কারোর বাড়ি নয়, কোনো বড়ো গাছের নীচে বাসা বাঁধে ৭/১০ দিনের। তারা কোটাসুর-কুলেরা এলাকায় প্রায়ই আসে।

বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের কাছে পাইগড়া ডোমপাড়ায় বছরে ২/৪ বার আসে বহুরূপীরা। এখানে তাদের জায়গাও আছে সরকার থেকে দেওয়া। কিন্তু ওদের কেউই এখানে স্থায়ীভাবে কোনোদিন বসবাস করেনি, এখনো করে না। ওরা আসে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুড়িয়া অঞ্চল থেকে। ৭/১০ দিন থাকে, কাছাকাছি গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে বহুরূপী দেখায়, আবাব অন্যত্র চলে যায়। জামুড়িয়াতেও তাদের কোনো স্থায়ী বাড়ি-ঘর দেখিনি, দেখেছি অস্থায়ী ত্রিপলের ঠেক্ মাত্র। তবে দু'চারজনের টালি দেওয়া ছোটো ঘর আছে। কিন্তু স্থায়ী বলা তাকেও দুষ্কর।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিকতা-রীতিনীতি-আচার পদ্ধতির সঙ্গে বহুরূপীদের জীবনযাপনের কোনো যোগ নেই। ওদের নিজেদের মধ্যে নিজস্ব সামাজিকতা আছে, আবার হিংসা-বিদ্বেষও প্রবল। তাছাড়া গাঁয়ে বহুরূপী এলে তাকে যে চাল-পয়সা দেওয়া হয়, সেটা শিল্পকে ভালোবেসে নিশ্চয় নয়। ভিক্ষে দেবার মতো দেওয়া। ড্রেস-পোশাক পরেছে, 'একটু বেশি দিই' মাত্র। তাও সবক্ষেত্রে সে ভাবনাও থাকে না। তখন শুধু ভিক্ষার মতোই দেওয়া হয়।

পাইগড়ার যে এলাকায় বহুরূপীদের জায়গা দেওয়া হয়েছে সে জায়গাটির এখনো ডাকনাম—'পাখ্‌মারাপট্টি'। বাবুইবড়ার কাছে ডোম পাড়ায় এই জায়গাগুলি ক্রমশই বেদখল হ'য়ে যাচ্ছে। বেদখলের কারণও আছে। এখানে বহুরূপীরা এখনো—স্থায়ীভাবে তো থাকেইনা আবাব ভূমি-জমি সম্পর্কে তারা একেবারেই উদাসীন।

সম্প্রতি আমোদপুর—কাটোয়া পিচ্ রাস্তায় এবং ন্যাবোগেজ রেললাইনের গোপালপুর স্টেশনের কাছে এক সুন্দর গাছগাছালি ঘেরা ডাঙায় বিষয়পুরের বহুরূপীদের বসবাসের জন্য সরকাব থেকে জাযগা দেওয়া হয়েছে। জায়গাটির যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু একজন বহুরূপীও বিষয়পুর ছেড়ে সেখানে যাচ্ছে না। সরকার থেকে বাড়ি ক'রে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বহুরূপীদের আগ্রহ বোঝা যায়নি। তাই গড়ে ওঠেনি গোপালপুরের ডাঙায একজন বহুরূপীরও এক ছাউনির পাকা বাড়ি। একসঙ্গে থাকতে না পেলে তারা কোথাও যাবে না বলেছে। তাছাড়া বিষয়পুরেই তারা জায়গা পেতে আগ্রহী। এই একই রকম অবস্থা লক্ষ্য করা যায় কেঁদুলির 'সাঁওতাল কাটার ডাঙায়।' সেখানেও বিহার সরকার একসময় ৭টি বাড়ি ক'রে দিয়েছিল সাঁওতালদের বসবাসের জন্য, কিন্তু একজনও সেখানে বাস করতে আসেনি। অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাড়িগুলি। জায়গাটি কিন্তু যথেষ্টই সুন্দর। ময়ূরাক্ষী নদী এই কেঁদুলির কাছেই ঝাড়খণ্ড সীমানা ছেড়ে বীরভূমের মাটিতে পদার্পণ করছে। আসলে ঐক্য-মিলন-সম্মিলন-সহমত পোষণই এইসব স্বাধীন জাতির বসবাসের মূল শর্ত। এগুলি যেখানে পূরণ হয় না সেখানে তারা যায় না। জায়গা ভালো হলেও তা তারা বর্জন করে।

৪. ৩. ২০০৬ তারিখ বিশিষ্ট লেখক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের সঙ্গে দূরালাপে এ বিষয়েহ কথা হচ্ছিল। তিনিও স্বীকার করেছেন শ্রমজীবী মানুষের প্রথম ঐক্য গড়ে তোলে বীরভূমের শ্রমজীবী মানুষেরাই। সেই সূত্রেই বোধহয় এই বর্জন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে অন্তরে অরাধিত। তারা তো অন্যের মতো নয় কখনোই। লোকসংস্কৃতির মূল কথাই হলো সম্মিলন। সবার সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাংলার মাটিতে বহুযুগ আগে থাকতেই বাউল-রায়বেঁশে-ফকির-ভাদু-ভাজো-লেটো-আলকাপ-বহুরূপীর দল লোকায়ত পৃথিবীর পাঠশালায় চিরদিন সেই শিক্ষাই দিয়ে এসেছে। ছৌ-গম্ভীরা-টুসু সব ক্ষেত্রেই একই ইঙ্গিত বহন করে। এগিয়ে আসে লোকশিক্ষকের দল।

নতুন প্রস্তর যুগ বিস্তৃত ছিল ৮০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত। পুরাতন প্রস্তর যুগের তুলনায় এযুগের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ছিল উন্নত এবং ধারালো। সেগুলো ব্যবহৃত হতো মাটি কাটা, বনজঙ্গল সাফ করা এবং শস্য কাটার কাজে। এ যুগেই মানুষ শিখেছিল কাপড় বুনতে, পশুপালন করতে, মাটির পাত্র তৈরি করতে এবং খাদ্য উৎপাদন করতে। নতুন প্রস্তর যুগের মানুষই প্রথম বুঝেছিল একসঙ্গে বাস করতে হলে কিছু রীতিনীতি নিয়মকানুন মেনে চলা প্রয়োজন। নতুবা সে বসবাসের কোনো অর্থ হয় না। মানুষ সভ্যতার পথে যত এগিয়েছে তার ভাবনা-চিন্তাগুলোও তত পরিবর্তন হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রকৃতির নানান রচনা মানুষকে অবাক করেছে। তারা ভেবেছে গ্রামে যেমন একজনের নির্দেশ মান্য হয়, সেই নেতা বা মাঝির কথা মতোই সবাই সব কাজ করে, আকাশেও হয়তো তেমন কেউ আছেন—যাঁর নির্দেশে সূর্য, চাঁদ ওঠে, বাতাস বয় আবার চাঁদ-সূর্য দিনের শেষে ডুবেও যায়। একইভাবে তাঁর নির্দেশে বান আসে, মড়ক লাগে, বনে বনে দাবানল জ্বলে ওঠে, আগুন লেগে সব পুড়ে যায়। পৃথিবী আদর করেই ফুল ও ফসলের ডালি উপহার দেয় মানুষকে। সুতরাং সেদিনের মানুষের মনে 'আকাশ' দেবতা হিসেবে গণ্য হলো, 'পৃথিবী' হ'য়ে উঠলো দেবী। এলো ভয় থেকে ভক্তি। ভাবা হলো শিকারের পশুরা পূর্বপুরুষদেরই প্রতীক। এভাবেই আসতে থাকলো জীবের পুজো এবং সৃষ্টি হ'তে থাকলো মানুষের ধর্মবিশ্বাস। এল গুহা-গহ্বরে মূর্তি আঁকার সময়। স্পেনের আলতামিরা গুহার গায়ে আঁকা বাইসনের জীবন্ত চিত্রটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। গুহার গায়ে আঁকা ছবির নিদর্শন ভারতেও আছে। একদিন ধর্মের অঙ্গ হিসেবেই উঠে এসেছে শিল্পকলা-ভাস্কর্য। বেড়েছে দেবদেবীর সংখ্যা। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তাঁদের প্রতিকৃতি আঁকাব এবং ব্যাখ্যা দানের। সাঁওতাল সমাজে এখনো দেওয়ালে চিত্র রচনার রেওয়াজ রয়েছে।

সেই অনুমানেই বলা যায়, স্কেচ-ছবি-মুখোশের জন্ম হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-২০০০ বছরেরও আগে। শিকার ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছে মুখোশের। এখনো সুন্দরবনের 'মউলি'রা পিছন দিকে মাথায় মুখোশ বেঁধে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে মধু সংগ্রহ করতে। প্রথম দিকে মানুষ ঢালের ব্যবহার জানতো না। 'সিন্ধুযুগ' পর্যন্ত কোনো ঢালের সন্ধানও পাওয়া যায়নি। ঢাল এসেছে 'আর্যযুগে'। সম্ভবত আর্যপরবর্তী যুগের মানুষ যখন ছবি আঁকতে শুরু করলো তখনই চিনে—মিশরে স্কেচ এসে গেছে। ভারতবর্ষে তার অনেক পরে শুরু হয়েছে স্কেচ ও ছবির ব্যবহার। সিন্ধু সভ্যতাতেও ঘোড়ার ব্যবহার ছিল না, ছিল বৃষ—ষাঁড়। এসব জীব-জন্তুর ছবিও দেওয়ালচিত্রে দেখা গেছে।

একইভাবে বৌধ্দের নানান ধর্মবিশ্বাস এসেছে বাংলায়। 'মার' নামক এক দৈত্য নাকি বৌধ্দের ধর্মসাধনায় বাধা সৃষ্টি করতো, সেই দৈত্যের বধ-উদ্দেশ্যেই বৌধ-সংস্কৃতিতে 'মার-বিজয়' উৎসব-অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। 'মার'-কে জয় বা পরাজিত করার অনুষ্ঠানই 'মার-বিজয়'। শিবগাজন বা ধরমপুজোর লৌকিক আঙনেই সেই বৌধ-সংস্কৃতির মার-বিজয়ের ছায়াটি সম্ভবত এসেছে বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে।

মুখোশ কোথাও-ই মানুষের মুখের অবিকল নয়। মুখোশে মানব মুখের আকৃতি নেই, আছে কল্পিত দৈত্য-দানব-দেবতার মুখের আকৃতি। দেহকে কষ্ট দিয়ে গাজন অনুষ্ঠানে বা ধরমপুজোয় মুখোশ নাচের মধ্য দিয়ে তারই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ছো-নাচেও দেবতার মুখ-জন্তুর মুখ-অসুরের মুখের কল্পিত রূপায়ন দেখা যায়। পরবর্তীকালে নাচের ক্ষেত্রে বা ভয় পেয়ে মানুষ মুখোশের ব্যাপক ব্যবহার ঘটিয়েছে তার সংস্কৃতিতে। দক্ষিণ ভারতের নাচ এমনই মুখোশ সমৃধ। পুরুলিয়া-ওড়িশা বা ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের ছো-নৃত্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

মুখ অর্থ আনন, বদন, প্রবেশপথ, ছিদ্র, মোহনা, আরম্ভ, অগ্রভাগ, নাটকাদির সন্ধিবিশেষ। মুখোশ, মুখোষ বা মুখোস অর্থে মুখাচ্ছাদন—নকল মুখ। অর্থাৎ মুখোশের আড়ালেই আসল মুখের অবস্থান। আজকের মানুষজন মুখোশের আড়ালেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সবসময় ব্যস্ত। তাই 'মুখোশ খোলা' শব্দটি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। একইভাবে মুখোশ অতীতকাল থেকেই লৌকিক সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় আচারের আঙিনায় ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন প্রকার অমঙ্গল, বিপজ্জনক প্রাকৃতিক ও পশুবলের বিরুধে লড়াইতে মুখোশ প্রাগৈতিহাসিককাল হতেই ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। মুখোশের মাধ্যমেই লৌকিক-সাধারণ-অশিক্ষিত-অদীক্ষিত মানুষ জীবনের আবেগকে, আপনার চিন্তা-চেতনা ও সংবেদনশীলতাকে বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ ক'রে এসেছে। সুন্দরবনের শিকারি এবং মউলিরা মাথার পিছন দিকে মুখোশ এঁটে বনের পশুদের বোঝাতে চায় যে তাদের মুখটা পিছনেই আছে। বাস্তব থেকে পরাবাস্তবে, বস্তুবাদ থেকে ভাববাদে, জ্ঞান থেকে কল্পনায়, বিভিন্ন প্রকাশ-ভঙ্গির বিশিষ্ট মাধ্যমের প্রকাশকর্তা হলো মুখোশ। সাধারণ লোকবিশ্বাস, মুখোশ জীবিত ও মৃতদের মধ্যে সংযোগকারী সেতু। মুখোশের মাধ্যমে কুলচিহ্ন-কুলকেতু সব প্রকাশিত হয়। কিংবদন্তি, বংশেব বিশিষ্ট পুরুষদের স্মৃতিও জাগিয়ে রাখা হয় এই মুখোশের মাধ্যমেই। কোনো কোনো মুখোশ শত্রু ও রোগব্যাধি বা বিপদকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়। মুখোশ মূলত আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট হলেও, আনন্দ-উৎসবে-নৃত্যে ও নাট্যকলায় মুখোশের ব্যবহার আকছার দেখা যায়। নাচ-নাট্যপ্রয়োগ এবং অলৌকিকতা সৃষ্টির উৎসবে মুখোশ ব্যবহারের রীতি খুবই জনপ্রিয়। 'কথক' বা 'ছৌ' নৃত্যের প্রসঙ্গটি এবিষয়ে আর একবার ভেবে নেওয়া যেতেই পারে।

সাধারণত অভিনয়ের সময় মুখোশ একটি কল্প-জগৎ রচনার মাধ্যমে শ্রোতা-দর্শককে গভীরভাবে মূল নাটকের বা নাট্য-বক্তব্যের অতি কাছের ভাগীদার ক'রে তোলে। বোধহয় এই উদ্দেশ্যেই ভারতে ধ্রুপদী এবং লোকায়ত শিল্পের ক্ষেত্রে মুখোশ পরা বা মুখোশের মতো মুখকে বদলানোর এক সুমহান ঐতিহ্যের ধারা প্রবাহিত হ'য়ে আসছে। উপজাতীয় মুখোশে যেমন ধর্মীয়-আচার অভিনয়ের প্রাধান্য দেখা যায়, তেমনি বিশুধ নৃত্যকলার ক্ষেত্রে বা

নাট্যকলার ক্ষেত্রেও এর আলোক-বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করার মতো। ছৌ-মুখোশ নাচই তো নাট্যধর্মী বিশুধ লৌকিক উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের চিল্‌কিগড় ছাড়াও বিহারের খরসোঁয়া, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে কার্ডবোর্ড-রাংতা-জরি-পুঁতি-ময়ূরখানায় বানানো ছৌ-মুখোশ পরিহিত মানুষের অভিনীত নৃত্যনাট্য সারা বিশ্বেই এখন বেশ জনপ্রিয়।

এ পৃথিবীর বিশাল রঙ্গমঞ্চে প্রায় প্রত্যেকটি মানুষই মুখোশ পরে আছেন, তিনি স্বামী-স্ত্রী-পুত্রকন্যা-বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকের সঙ্গে ভিন্নভাবে অভিনয় করে চলেছেন। নিজের আসল চেহারা হয়তো কোথাওই সেভাবে দেখানো যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে ভেতরের মুখোশ লালিত নাট্যক্রিয়া যেন সবসময় চালু আছে এ বিশাল বিশ্ব জুড়ে। বহুরূপে মানুষ অভিনয় ক'রে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। যাকে দেখে একটুও হাসার ইচ্ছে নেই ভেতরে, বাইরে তাকে দেখেই হাসতে হচ্ছে। আসলে বিশ্বজুড়ে বহুরূপীর মেলা বসেছে। মুখোশ পরার প্রতিযোগিতাও শুরু হয়ে গেছে। যিনি বা যাঁরা সেভাবে পোশাকে-মুখোশে সাজতে পারছেন না, তাঁরা পিছিয়ে পড়ছেন। হয়তো বিপদেও পড়ছেন। বিষয়গতভাবে 'আকাদেমি অভ ফোক্ থিয়েটার' মুখোশকে তিনভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী—১. ধর্মীয় আচার সংবলিত মুখোশ। ২. নৃত্যকলা সংবলিত মুখোশ। ৩ নাট্যকলার প্রয়োজন সংবলিত মুখোশ।

'মুখোশ' ব্যবহার করেছে মানুষ নিজের রূপের বদল ঘটাতেই। মুখটাকে গোপন করার জন্যই তার রূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল। বহুরূপী এই মানুষই। যদিও তার সেই ভেতরের পরিবর্তনটি আমরা সবসময় দু'চোখ দিয়ে দেখি না, অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে অনুভব করিনা। লোকায়ত বাংলায় দরিদ্র মানুষজন একদা নানান লোকসংস্কৃতির মঞ্চে বা লোকায়ত দেবদেবীর আঙিনায় বহুরূপী সেজেছে। সে যা নয় তাই সেজে দেখিয়েছে। তাই দেখিয়ে আনন্দ দিয়েছে, আনন্দ পেয়েছে। গাঁয়ের যাত্রাপালা, কেষ্টযাত্রা, আলকাপ, গাজন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এমন উদাহরণ অমিল নয়। বাংলার সঙ্‌-ও বহুরূপীরই একটি স্তর। বহুরূপীর ইতিহাসে প্রাথমিক অবস্থায় এর শুধু নান্দনিক মূল্যই ছিলনা, ছিল সামাজিক উপযোগিতা এবং প্রয়োজন। তাই বহুরূপীদের যাঁরা 'ভিক্ষুক' ভাবেন, তাঁরা সেই সামাজিক মূল্যটার কথা উপলব্ধি করতে পারেন না। যাত্রা-নাটকে বহুরূপীদের অংশগ্রহণ এখনো তেমন বিনিময়যোগ্য পণ্য হ'য়ে ওঠেনি। তাই ব্যক্তি বহুরূপীর জীবন-যাপন বেশ কষ্টেরই। অভিনয়ের জীবন তার অল্পমেয়াদিও। দেহের কর্মক্ষমতা কমে এলেই বহুরূপীর আশা-ভালোবাসাও শেষ হ'য়ে আসে। লোকশিল্পী বহুরূপীদের ক্ষেত্রে 'দেহপট সনে নট্ সকলি হারায়' কথাটি তখন মর্মান্তিকভাবেই কার্যকরী এবং সত্য হয়ে ওঠে।

হিমালয়ের প্রান্তদেশে জলপাইগুড়ি জেলা এবং পাহাড় ও সমতলের মেলবন্ধনে গড়া কৃষি বলয়ে অসংখ্য জাতি ও জনজাতির উৎসব-অনুষ্ঠানে নিজস্ব এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ 'মুখা' বা মুখোশ নাচের বর্ণময় আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই পাহাড় কোলের লোকনৃত্য বাংলার মানচিত্রে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। জলপাইগুড়ি জেলায় নৃ-গোষ্ঠীগত বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিশেষ জাতি ও জনজাতির মুখোশ এবং প্রচলিত মুখোশের দুটি সমমাত্রিক ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্তভাবে এ জেলায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি পাহাড়ি আদি-জনজাতি গোষ্ঠীও বসতি বিস্তার করেছে। তাদের নিজস্ব সামাজিকতা আর মুখোশনৃত্যও

আছে। ওরাওঁ-টোটো-ড্রুকপা-শেরপা-ভুটিয়া-তিব্বতি-লেপ্‌চা-মেচ্‌-রাভা-চাক্‌মা-গারো-হাজং প্রভৃতিরা নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়েই এখানে রয়েছেন। এরপর ১৮৭৪ সালে চা বাগান প্রতিষ্ঠার সূত্র ধ'রে বিপুল সংখ্যক অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জনজাতির মানুষ এ জেলায় এসেছেন। তাঁরা নিজেদের সঙ্গেই বহন ক'রে এনেছেন নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা।

ওরাওঁ-দের পূর্বপুরুষেরা চা-বাগানের শ্রমিক হিসেবে প্রথম পর্বে আসার সময় কাঠের তৈরি দেবতা ও পশুর মুখের মুখোশগুলি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো পরেই তারা নাচতো। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় ভূতপ্রেত দমনে জাদুবিদ্যার প্রভাবে ধর্মীয় মুখোশের প্রচলন আছে প্রধানত নেপাল থেকে আসা মঙ্গোলীয় জনজাতির মধ্যে। এদেব মুখোশগুলিও কাঠের তৈরি এবং তুক্‌তাক্‌ ও জাদুবিশ্বাসের কাল্পনিক সাদৃশ্য সমন্বিত। তামাংদের মুখোশ পরা ধর্মীয় লোকনৃত্যগুলিতেও লোকবিশ্বাস এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের ভাবধারায় মুখোশগুলি তৈরি। তামাংদের নাচগুলির ভেতর অপদেবতা বা অপশক্তির বিরুদ্ধে রণনৃত্যের একটা কৌশলই প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে। তাই নৃত্যশিল্পীর মুখ বিশেষ বিশেষ মুখোশে ঢাকা থাকে এবং শিল্পীর দেহভঙ্গিমায় ধরা পড়ে যুদ্ধনৃত্যের বর্ণময় ভাষা। নাচের শেষে অশুভ শক্তির পরাজয়ও ঘোষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে তাই মুখোশগুলি হ'য়ে ওঠে রৌদ্ররসের পরিবাহী এবং আপাত ভয়যুক্ত। 'বাক্‌পা' নৃত্যেও কাঠের মুখোশ ব্যবহার করা হয়। গামার আর কিম্‌বু কাঠে তৈরি হয় এসব মুখোশ। ঢিলে আলখাল্লা, চমরি গাই-এর লেজ দিয়ে বানানো পরচুলা আর মুখোশ পরে নাচে শিল্পীরা। এই নাচেও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার রীতি অনুযায়ী দৈবশক্তি এবং অশুভ শক্তির প্রতীক রূপে মুখোশ পরে অভিনয়ের ভঙ্গীতে নৃত্যের তালে তালে অন্য এক কল্পিত রাজ্যে পৌঁছে যাবার দরজা খোলা হয়। 'চেকিয়া' চরিত্রে হাস্যরস উদ্রেককারীর মুখোশ পরা হয়। 'বাক্‌পা' নৃত্যকে ভয়ঙ্কর ও অলৌকিক ক'রে পরিবেশনের জন্য রাত্রে, আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশ জুড়ে নাচের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। 'মুখোশ' এসব নাচের ক্ষেত্রে ভূত-প্রেতাত্মা-অপদেবতার সাদৃশ্যমূলক জাদু হিসেবে (Homoepathic magic) ব্যবহার হ'য়ে থাকে।

'জুংবা' নৃত্যের শিল্পীরা মুখোশ না পরলেও ভূত-প্রেতের প্রতিরূপ হিসেবে পোশাক পরে থাকে। এ নাচও প্রতীকধর্মী। তাই পরচুলা পরতেই হয় শিল্পীদের। প্রকারান্তরে মুখোশের মতোই শিল্পীরা নিজের নিজস্ব চেহারাকে আড়াল করে রাখে। তামাংদের ধর্মবিশ্বাস ভূত-প্রেত বা অশুভশক্তি মৃতের আত্মাকে প্রভাবিত করে, স্বর্গে যাবার পথে তাকে বিপথগামী করে। এর কারণেই পাঁচজন পুরোহিত পাঁচটি বিশেষ মুখোশ প'রে জাদু-প্রতীকের মাধ্যমে মন্ত্রপূত নাচ শুরু করে। আর তাতেই নাকি রক্ষাকবচ তৈরি হয় এবং অশুভ শক্তি দেহ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

তিব্বতী এবং মঙ্গোলীয়দের একটি শাখা ড্রুক্‌পা। জলপাইগুড়ি জেলাব বক্সা—পর্বতের চুনভাটি-ফাতেলু-আদমা প্রভৃতি গ্রামে ড্রুক্‌পাদের বাস। এরা গভীরভাবে তন্ত্রেমন্ত্রে বিশ্বাসী। তাদের নানান উৎসবেই মুখোশ নাচের প্রচলন রয়েছে। এদের মুখোশগুলি প্রধানত কাঠের তৈরি। তামাংদের মতোই এরা অশুভ শক্তিকে দেহ এবং গ্রাম থেকে বিতাড়নের জন্য নাচ করে। তিব্বতী মুখোশের মতো ড্রুক্‌পাদের মুখোশে পঞ্চমুন্ড শোভিত শিরোভূষণ সহ বিভিন্ন অশুভশক্তির কল্পিত মুখাবয়ব রূপায়িত হয়। জলপাইগুড়ি জেলার রাভা জনজাতির উৎসব-

অনুষ্ঠানে মুখোশ ব্যবহারের রীতি যথেষ্ট প্রাচীন। তারা বাঁশের সূক্ষ্ম বাতায় বোনা চাটাইয়ের ওপর প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত গাছের আঠা দিয়ে এক নিজস্ব ঘরাণায় মুখোশ প্রস্তুত করতো। সে অবশ্য এখন অবলুপ্ত হয়ে স্থানীয় লোকসংস্কৃতির প্রয়োজন অনুসারী মুখোশে বিলীন হ'য়ে গেছে। কালীপুজোর পর বর্ষাকালের সমাপ্তি বিবেচনা করে রাভারা বনের দেব বা দেবীকে তুষ্ট ক'রে বনে প্রবেশ করতে চায়। তারই উপলক্ষে তারা গাছ-ফুলকে বনদেবীর প্রতীক হিসেবে পুজো দেয়। আর সেই উৎসবেই তারা 'মাকপার-বসিনি' নাচ নাচে। ভালুক সেজে নাচ এরই অঙ্গ। ভালুককে জলপাইগুড়িতে 'ভাণ্ডি' বা 'ভাণ্ডাকুরা' বলা হয়। জন্তুটি মর্যাদা পায় বনদেবতার প্রতীক হিসেবেও। একইভাবে ভালুকের রূপায়ণ এই এলাকার লোকনাট্য এবং লোকনৃত্যের আসরেও উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে।

রাভাদের অন্য নাচ 'চোর-খেলেয়ি'তে দুটি মুখোশের ব্যবহার রয়েছে। একটি কালী এবং অন্যটি 'মাকপার-বসিনি'র মতোই ভালুকের। কালীপুজোর রাতে কালী এবং ভালুক সেজে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচ হয়। তবে বাংলার প্রচলিত কালীর মুখোশের সঙ্গে এই কালী বা কামাখ্যার মুখোশ গঠনপ্রণালী অনেকটাই আলাদা। জেলার কামাখ্যাগুড়ি অঞ্চলের রাভাদের মধ্যে এই নাচের প্রচলন বেশি। 'মেচ' জনজাতির মধ্যেও কালীর মুখোশ পরে কালীপুজোর রাতে বিশেষ নাচের প্রদর্শন হয়। তারা ঐভাবেই চাঁদাও তুলে বেড়ায়। কালীনাচ অন্যত্রও হয়।

দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলা থেকে বহু মানুষ শিব-কালী প্রভৃতি দেবতার মুখোশ এখানে এনেছিলেন। সেগুলি নষ্ট হলে আবার তারা আগের মতোই মুখোশ বানিয়ে নিয়েছেন নিজেদের নাচের জন্য। আবার ছৌ-নৃত্যর মতোন রামায়ণের কাহিনি নির্ভর 'মুখাখৈইল' বা মুখোশখেলা দেখা যায় জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরপ্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত। উত্তরের এই সমস্ত মুখোশ নির্মাণে তিব্বতি-মুখোশের একটি স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় কালীপুজোর পরের দিনটিতে 'সঙ্' সাজার চল্ রয়েছে। বালক-কিশোর-যুবকেরা এদিন কাগজ-শোলা-লাউ-এর খোল্-থার্মোকল প্রভৃতি দিয়ে তৈরি দেবদেবী-পশুপাখি-ভূতপ্রেতের মুখোশ পরে এবং অনুরূপ পোশাক ও প্রসাধন ক'রে সঙ সাজে। সঙের দল গৃহস্থের দরজায় গিয়ে 'চোর চোর' বলে চিৎকার করে। তারপর ভিক্ষাপাত্র এবং ভিক্ষার ঝোলা নিয়ে ভিক্ষে করে। এদের মধ্যে যুবক এবং বয়স্করা সঙ্ সেজে নানা রকমের নাচ দেখায় গান করে এবং নানান হাসি-তামাসা ক'রে গ্রামবাসীর মনোরঞ্জন ক'রে থাকে। এই ধারার নাচের মধ্যে কালীর মুখোশ এবং পোশাক পরে 'কালীনাচ' একক নৃত্যটিও উল্লেখযোগ্য। কালীর মুখোশটি এখানে তৈরি হয় শোলা দিয়ে। শিব সেজে ছড়া কেটে 'দেউশি' নাচের শিল্পীরা ভিক্ষে করে। বাংলা 'মাগনের গানে'ও দেবদেবী এবং পশুপাখির মুখোশ পরে শিল্পীরা। জলপাইগুড়ির জনপ্রিয় পালাগান, 'চোর-চুন্নি'তেও মুখোশ পরেই নাচ ও গান করা হয়। ছেলেরাই মেয়ে সেজে 'বিষহরি পালায়' মনসা-মঙ্গলের নাচগান ক'রে থাকে। এই পালায় শিব-চণ্ডী-মনসা-সাপ-বেহুলা-লখিন্দর-চাঁদসদাগর প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য কাঠের মুখোশের প্রচলন রয়েছে। অবশ্য এখন শোলা-থার্মোকলের মুখোশেরও প্রচলন হয়েছে। এই মুখোশ তৈরির নির্মাণ শৈলিতে বাংলার নিজস্ব ঘরাণার সঙ্গে তিব্বতি মুখোশ তৈরির কলা-কৌশল সংযুক্ত হয়েছে।

মালদহের 'গম্ভীরা' নাচেও শিব এবং পার্বতী সাজার রেওয়াজ রয়েছে। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার জেলায় 'শ্মশান-খেইল' বা শ্মশান খেলা নামের নাচে দু'জন ভক্ত শ্মশানকালী এবং চামুণ্ডাকালীর মুখোশ প'রে নেয়। তারপর তারা মুখোশ নৃত্য পরিবেশন করে। ভুটিয়া লামাদের প্রেতবিতাড়ন নৃত্যধারা চর্যাপদের আমল থেকেই তন্ত্রসাধনার প্রবাহকে বহন করে চলেছে তাদের মুখোশ নাচের মধ্যে দিয়ে। উত্তরবঙ্গে 'রামমঙ্গল', 'মহীরাবণ বধ', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'কুশানগান' প্রভৃতি পালায় মুখোশের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। 'রামমঙ্গল' গানে১৩টি মুখোশের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ১৩ রকমের সাজও লক্ষ করা যায় কুশীলবদের। লোকনাট্যের বিভিন্ন পালাতেই বহুরূপ ধারণের একটি স্পষ্ট বাসনা বহুকাল হতেই প্রকট হ'য়ে আছে।

কোনো ক্ষেত্রেই এইসব 'মুখা নাচে'র শিল্পীরা সারা বছর ধরে জীবিকার প্রয়োজনে এই শিল্প প্রদর্শন করেনা। তারা বিশেষ বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাচগান অভিনয় ক'রে মাত্র। কিন্তু লোকনাট্যের বহুরূপী শিল্পীরা অন্ন-সংস্থানের চেষ্টাতেই এই শিল্পটিকে আঁকড়ে ধরে আছে।

তথাপি বহুরূপীরা অন্নসংস্থান তথা জীবিকার সঙ্গে পেশাটিকে যুক্ত রেখেও বাংলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বহুরূপী সাধারণত একক প্রয়াস, কিন্তু সমষ্টিগত লোকচেতনার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী যুক্ত। ঐতিহ্য আশ্রয়ী বহুরূপী যেমন শিব-কালী-রাম-কৃষ্ণ-তারকা রাক্ষসী-পুতনা রাক্ষসী-মহীরাবণ ইত্যাদি সাজে, তেমনি সাজে রঘুডাকু-খুদি গোয়ালিনী-গব্বর সিং- হঠাৎবাবু ইত্যাদি। নগর-জীবনের প্রভাব তার সাজসজ্জা এবং সংলাপে ধরা পড়লেও ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীন সমাজব্যবস্থার একটা মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টায় বহুরূপীরা নিয়োজিত। কিন্তু কোনোভাবেই তারা অনগ্রসর গ্রামীণ গতানুগতিক অভ্যাসের বিরুদ্ধচারী নয়। কারণ মূল রোজগারের ক্ষেত্রটিই এখনো তাদের গ্রাম। বহুরূপীর নানান রূপটানের আড়ালে তথাপি লোকায়ত শ্রমজীবী মানুষের জীবন-সংগ্রামের নির্মম ছবিই খুঁজে পাওয়া যায়। যারা আজও দু'মুঠো অন্নের জন্য মুখে রং মেখে মুখোশ পরে বিবর্ণ পোশাকে অদ্ভুত এক মজাদার জীব সেজে আনন্দ বিলিয়ে বেড়ায় সারা রাজ্য জুড়ে। যাদের স্থির হয়ে বসবাসের কোনো দায় বা দায়িত্ব এখনো নিতে পারেনি এই সমাজ।

অবশ্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীনাথ তথা ছিনাথ বহুরূপীকে চেনে না এমন শিশু-কিশোর বাংলাদেশে নেই। যে কিনা পড়ার ঘরে সেজবাতি উল্টে, দু'টো থাবা জোড় ক'রে অবিকল মানুষের গলায় ব'লে উঠেছিল—'আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী'। বারাসতের এই শ্রীনাথকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন শরৎচন্দ্র। তারই ফলে ছোটোদের সঙ্গে বড়োদেরও আকর্ষণ বেড়েছে বহুরূপীর প্রতি। বাংলার একটি বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ লোককলা হিসেবে মর্যাদাও এসেছে বহুরূপীর। কিন্তু তাতে তাদের ঐ পোশাকের আড়ালের মানুষগুলোর ভাত-কাপড়ের লড়াই ঘোচেনি, স্থির হয়নি ভিটেমাটিরও। অবশ্য কেউ কেউ পেশা হিসেবে বহুরূপী বৃত্তিটিকে গ্রহণ ক'রে সুখে আছেন, ভালো আছেন। তারা ভিক্ষুকের চেয়ে বেশি রোজগারও করছেন লজ্জা-ঘৃণা-ভয়কে বিসর্জন দিয়েই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়াও বিদেশেও বহুরূপীর দেখা মেলে। বহুরূপী শিল্পীদের নানান সমস্যা এবং শিল্পটিকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছোনর জন্য ১৯৮৮ সালের ৯ ও ১০ অক্টোবর

'প্রথম বহুরূপী রাজ্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। মূলত এরপরই শিক্ষিত মানুষজন ফিরে তাকান বহুরূপীর দিকে। বহুরূপী লোককলাটিও জনপ্রিয় হতে শুরু করে। বহুরূপী শিল্পকলাটি সাধারণ দরিদ্র অনগ্রসর গ্রামে বসবাসকারী বিশেষত তপশীল জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের যূথবদ্ধ প্রয়াস। আসলে এতদিনে সবাই জেনে বুঝে গেছেন সব মানুষ লোকসংস্কৃতির 'লোক' নয়। এই 'লোক' বৈদগ্ধ্যহীন লোক, 'জনগণ' বলা হয় যাদের। বাংলার সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার একেবারে নিচুতলার সমাজ-কাঠামোতেই এদের অবস্থান। সব ক্ষেত্রেই যে এরা আদি যাযাবর শ্রেণির মানুষ, তা কিন্তু নয়। তথাপি বীরভূমের বিষয়পুরের বহুরূপীরা আগে তাবিজ-খুপি-জড়িবুটি বিক্রি করতো, ধনেশ পাখি নিয়ে দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়াতো এবং তাদের যাযাবরত্ব এখনো রয়ে গেছে রক্তে। গাঁয়ে বহুরূপীদের পাড়াটির পরিচয় আজও 'পাখমারা পাড়া' হিসেবেই। তথাকথিত উন্নত সমাজের অবহেলা-বঞ্চনা তাদের নগর বাহিরে একেবারে অন্ধকারে এনে উপস্থিত করেছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণেই। সেই চর্যাপদের আমল হতেই নগরের বাইরে টিলার উপরেই তাদের কুঁড়ে ঘর।

বহুরূপীর কুল-কৌলিন্য নেই, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাও থাকে না। তথাপি এই বহুরূপ গ্রহণ বা বহুরূপ সজ্জার প্রবণতা মানুষের একেবারে সভ্যতার আদিম লগ্ন থেকে। শিকারের সময় পশুর ছাল-শিং-নখ এসব প'রে অভিনয় এবং কসরৎ করার রীতিও বহু প্রাচীন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অনিষ্টকারী পশুর ক্ষেত্রে মানুষ তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণেই জীবনের সূচনালগ্নে এনেছিল 'জাদুক্রিয়া', এঁকেছিল পাথরের অস্ত্রের উপরও নানান আঁকিবুকি। অলৌকিক জাদুশক্তির বিশ্বাস থেকেই তাবৎ লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে। জাদুশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য মানুষ নিজেকে নানান রূপে সাজিয়েছে। কল্পিত-অলৌকিক-ভয়ংকর দেবতা বা অপদেবতার অথবা দৈত্য-দানব-রাক্ষসের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে অশুভ শক্তিকে তুষ্ট করতে চেয়েছে। ধর্ম-শিল্প-বিশ্বাস-সংস্থান সমস্ত একাকার হ'য়ে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙুনগুলি পুষ্ট হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। পরে অবশ্য ধর্ম এবং শিল্প পৃথক হ'য়ে গেছে কোথাও কোথাও। ধর্ম থেকে ক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ শিল্প হ'য়ে ওঠার ক্ষেত্রটি মনোরঞ্জনের উপকরণে পর্যবসিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—'এখনো পাড়াগাঁয়ে রাখালেরা কুলাই ঠাকুরের ব্রত বলে একটা অনুষ্ঠান করে।' সেটি থেকে ধর্ম আর শিল্প ক্রমে কেমন করে স্ব-স্ব প্রধান হয়ে উঠেছে তার একটু আভাস পাবো। পৌষ সংক্রান্তির একপক্ষ পূর্ব থেকে রাখালেরা একজনকে বাঘ সাজিয়ে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি সন্ধ্যার সময় এই গানটি গেয়ে পুজোর চাল ভিক্ষে করে বেড়ায় (কোরাস কণ্ঠে)—

ঠাকুর কুলাই ভোঁ/হ্যাটা চল রে ॥
ধ্রু/হ্যাটা চল পাঁচিল পার। ...

এই ছড়াতো শুধু আউড়ে যাবার নয়, এতে বাঘ হতে হবে, জোরে জোরে হাঁটা, ঝপাৎ করে পড়া, সজাগ হয়ে এদিক ওদিক দেখা এবং হাম্বর হাম্বর গর্জন। নাট্যকলার অনেকটাই পাওয়া গেল (সত্রাজিৎ গোস্বামী)। বাঘের ভয় থেকে গোরু-বাছুর যাতে রক্ষা পায় সেই কামনা ক'রে রাখালেরা নিজেদের মধ্যেই একজনকে বাঘ সাজিয়ে এই অনুষ্ঠান করে। সঙ্গে রয়েছে চাল প্রার্থনা আর বাঘের গান গেয়ে রোজগার। ব্রত-পুজোর বাঘ হ'য়ে উঠল বহুরূপীর বাঘ। নটের নাট্যকৃতি হয়ে উঠল জীবন ও জীবিকার অঙ্গ।

'নট' ও 'নাট্য' শব্দ দুটি চতুর্থ শতকে পানিনির নটসূত্রে, পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের সেই সমস্ত নট শ্রেণির অধিকাংশই কৃষিজীবী পরিবারভুক্ত। কৃষিকাজের অবসরে উৎসবে বিনোদনে নটের ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হতো। মূল কৃষি নির্ভর আয়ের সঙ্গে বাড়তি কিছু আয় হতো এই নাট্যকর্মের মাধ্যমে। সেই নট শ্রেণিরই একটি শাখা হলো বহুরূপী। ভারতীয় সংস্কৃতিতে শিব 'নটরাজ', ভবঘুরে-ভিক্ষাজীবী একজন নটও। ভস্ম মেখে গায়ে, জটা ঝুলিয়ে মাথায়, বাঘছাল প'রে কোমরে, হাতে ত্রিশূল নিয়ে তিনি নৃত্য-গীতের মাধ্যমে সাধারণের মনোরঞ্জন ক'রে নিজের অন্নের সংস্থান করেন। আসলে লোকায়ত দেবদেবীর মানবায়নের আড়ালে আছে শ্রেণি বঞ্চনার এক দীর্ঘ ইতিহাস। দশম শতকে রামাই পণ্ডিতের শিবও ভবঘুরে এবং ভিক্ষাজীবী। বহুরূপীই হয়তো।

'বহুরূপী' নামে মধ্যযুগেব সাহিত্যে লোকনাট্যটির তেমন প্রকাশ না দেখা গেলেও 'কাপ' 'ভিক্ষু' 'ভাট' প্রভৃতি নামে তাদের দেখা পাওয়া গেছে। মুঘল যুগের প্রামান্যগ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী'তে আবুল ফজল লিখেছেন, "বহুরূপী—এঁরা প্রতিদিন নানা বেশ ধারণ করে উপস্থিত হন। যেমন, একজন যুবা পুরুষ সুন্দরভাবে বৃদ্ধের রূপ ধারণ করেন। বুদ্ধিমান পরীক্ষক এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষককেও এঁরা ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন"। ভারতচন্দ্র শিবকে 'সঙাল' বা 'বহুরূপী' 'কাপ' হিসেবেই দেখেছেন—'কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ'। বহুরূপীর মতো স্থূল আনন্দ পরিবেশনকারী ভবঘুরে ভিক্ষাজীবী ভারতের নানা রাজ্য ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে। ভারতে বহুরূপী বৃত্তির উদ্ভবের কারণ প্রকৃতিগতভাবে প্রায় সর্বত্রই এক। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে কৃষিজীবী লোকসমাজের একটা শ্রেণি নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বহুরূপী বৃত্তিকে অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। আর মনোরঞ্জন এবং অর্থোপার্জনের এই বিশেষ পন্থাটি যারা আয়ত্ত করতে পারেনি, তারা কেউ হয়েছে বাজিকর, কেউ তুক্‌তাক্ মন্ত্রতন্ত্রে দক্ষ গুণীন। কেউবা শীতলা-মনসা-ধরম প্রভৃতি বিঘ্নবিনাশক লোকদেবতার মূর্তি বাঁকে বা মাথার ঝুড়িতে বসিয়ে সিঁদুর মাখিয়ে পথে নেমেছেন, কেউ হয়েছেন নিতান্তই ভিক্ষুক।

অষ্টাদশ শতক থেকেই বাংলায় বহুরূপীরা স্থান পেতে শুরু করেছে। উনিশ শতকে এসে বহুরূপীর অস্তিত্ব নিয়ে আব কোনো বিতর্কই গ্রাহ্য হয়নি। গাজনের সঙ বা বহুরূপী তখন থেকেই সর্বত্র ব্যবহৃত হতে থেকেছে। 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন—উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও বহুরূপী রয়েছে, কিন্তু সে সব জায়গায় তারা 'বহুরূপীয়া' নামে পরিচিত। বিদেশি লেখক রিলসেও 'বহুরূপীয়া' বলেই উল্লেখ করেছেন। ঝাঁসী বা জম্মু-কাশ্মীরেও বহুরূপীদের দেখা মেলে। একদা বাংলাদেশে সারাবছর যে বহুরূপীদের দেখা পাওয়া যেতো, তারাও আজ নেহাৎ-ই বিবর্ণ—মৃতপ্রায়। সুনির্দিষ্ট জাতিতে এরা কোথাওই তেমনভাবে পরিচিত নয়। নিম্নবর্গের অনন্যোপায় মানুষেরা একদা অন্নসংগ্রহের তাগিদেই বহুরূপীর বৃত্তি গ্রহণ করেছে বলেই মনে হয়। বহুরূপীবা নট শ্রেণিরই একটি শাখা। 'বহুরূপী' কোনো জাতিগত নাম নয়, বৃত্তিগত নাম মাত্র। তবে এদের প্রায় সকলেই দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত। এদের মধ্যে সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, নমশূদ্র, ডোম প্রভৃতি জাতির মানুষজন যেমন

আছেন, তেমনি সংখ্যাগত ভাবে বহুরূপী বৃত্তিতে সবচেয়ে বেশি রয়েছেন বেদে ও পাখমারা শ্রেণিব মানুষজন। ব্যাধ বা পাখমারারা বেদিয়া বা বেদে সম্প্রদায়েরই মানুষ বলে পরিচিত।

বিদেশি লেখক রিস্‌লে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'দি ট্রাইব্‌স এণ্ড কাস্টস অভ বেঙ্গল' বইতে শ্রমজীবী শিল্পী বহুরূপীদের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন—

'Bahurupia, a mimic, an actor, a person assuming various Characters and disguises....They often appear in the guise of a decrepit old woman, her face puckered with gab juice, who calls herself Akber's nurse. Another popular role is that of shiv-Gouri, in which the Bahurupia gets up one side of his person as shiv and the other as gouri and conducts a humorous dialogue between the two.'

(H. H. Risley—The Tribes and castes of Bengal : Vol—1, 1891 Edn.)

একই শরীরে পুরুষ-নারী সেজে, হরগৌরী সেজে, দু'রকম ভাবে কথা বলে, দু'রকম সাজ দেখিয়ে বহুরূপীরা আজও জনচিত্ত জয় ক'রে চলেছে।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা এবং তিব্বত অঞ্চলেও বহুরূপীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরায় নমশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত চাষী পরিবারের এক বহুরূপীর সন্ধান পেয়েছিলেন সত্রাজিৎ গোস্বামীও। ওই কৃষক অবসর সময়ে কালী-শিব এবং ভূত-প্রেত সাজতেন। বাংলাদেশেব কোথাও কোথাও এখনো বহুরূপীর চল্ রয়েছে বলে শোনা যায়। আসলে বহুরূপী লোকনাট্যকে কোনো বিশেষ অঞ্চলের সীমানায় সীমায়িত করা শক্ত। সারা ভারতবর্ষে এমন কী সারা বিশ্বেও বহুরূপীব অস্তিত্বের সন্ধান মেলে। কোনো তিথি-অনুষ্ঠান-পুজো মেনেও (সঙ-চোরচুন্নির মতো) বহুরূপী বের হয় না। জীবন ও জীবিকার সন্ধানে পেটের তাগিদেই বহুরূপী বেরোয় স্বাধীনভাবে। যেদিন খুশি সেদিন, অথবা প্রতিদিনই।

নানান সাজ বহুরূপীর, তারা বলে ৫২ সাজ। তবে হরগৌবী বা হরপার্বতী অথবা অর্ধনারীশ্বর পোশাক বেশ অদ্ভুত। মুখ থেকে পা পর্যন্ত একদিকে দুর্গা অন্যদিকে শিব, একদিকে পুরুষ অন্যদিকে নারী। নাকের মাঝখান দিয়ে ভাগ। একদিকের পোশাক তুলে শিব হয়, অন্যদিকে দুর্গা। সংলাপও সাজানো হয় দু'রকম। এমনই নতুন চরিত্র 'হঠাৎবাবু' 'ফাঁসির আসামি', 'সাহেব', 'বাঈজি' প্রভৃতি। 'খুন খারাপি', 'নরমুণ্ড নিয়ে ধ্যান' এমন সব ভয় উদ্রেককারী রূপের প্রচলন এখন কমে এসেছে, কমে এসেছে বাঘ-সিংহের সাজও। ছিনাথ বহুরূপী যে বিপর্যয় ঘটিয়েছিল বাঘ সেজে সে ঘটনা তো সকলেরই জানা। বাংলার লোকনাট্যের এই প্রশাখাটি এখন অভিনয়ের মাধ্যমে পুষ্ট, তার সংলাপ সংক্ষিপ্ত আঞ্চলিক কিন্তু গুরুত্ব ও মনোযোগ আকর্ষণকারী এবং বিশ্লেষণধর্মীও।

'সঙ' বহুরূপীরই একটি শাখা হলেও তার সঙ্গে কোনো মানুষেরই জীবিকার প্রশ্ন সংযুক্ত থাকে না। লোকনাট্য বহুরূপীর নট্ বা শিল্পীর জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে এই বৃত্তিটিরই উপর। তাই বহুরূপীর সঙ্গে সঙের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েই যায়। বিভিন্ন লোকায়ত দেবদেবীর পুজো বা উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে সঙ দেখানোর একটি প্রথা রয়েই গেছে এ বাংলায়। 'বহুরূপী' কিন্তু অন্নসংস্থানের নিমিত্ত একটি পেশা, রুজি-রোজগারের লোকায়ত

নাট্য। গাজনে বা জন্মাষ্টমীর নন্দোৎসবে সঙ্ সাজার একটা প্রথা আছে। সঙ্ দেখিয়ে সে সময় আনন্দ পরিবেশন আর কৌতুক নিবেদন করা হয়। পয়সাও কিছু পাওয়া যায় বটে, তবে সে পয়সা পেট চালানোর জন্য চাল-ডাল-নুনে খরচ হয় না, খরচ হয় আমোদ-আহ্লাদে ফিস্ট খেয়ে। বহুরূপের অন্তরালে বহুরূপী একজন মানুষ, নিতান্তই দরিদ্র মানুষ। তার দারিদ্র্য থাকার কারণেই হয়তো লোকনাট্যের শিল্পী হিসেবে বহুরূপী-মানুষটিকে গ্রহণ করলেও, ভিক্ষুকের চেয়ে একটুও উঁচুতে তাকে স্থান ক'রে দেয়নি তথাকথিত সভ্য-সমাজ। পৃথিবীতে দরিদ্র হওয়ার জ্বালা অনেক। উপযুক্ত সম্মান না পাওয়া, হতাশায় ভোগা, দু'বেলা দু'মুঠো জোটানোর জন্য প্রাণপাত করা এসবই তার অঙ্গ। বহুরূপীও তার বাইরে নয়।

বহুরূপীদের বিশেষ কোনো ধর্ম নিজস্ব বলে নেই। তারা নিম্নবর্গের হিন্দুদের মতোই জীবন-যাপন করে। তবে বীরভূমের বিষয়পুরে বহুরূপীদের ধরমের নাম 'ফটিক বাবা', এই ধরম তাদের আনন্দোৎসব। পাঁঠাবলি, নাচ-গান, আকণ্ঠ মদ্যপান সবই। বৈশাখি বুদ্ধপূর্ণিমাতে বিষয়পুরে ধরমপুজোর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া 'লবান' বা 'নবান্ন' উৎসবেও তাদেব খুব ধুম। যে যেখানেই থাকুকনা কেন ধরমপুজোয় আর লবানে বিষয়পুরে চলে আসবেই। বর্ধমানের জামুড়িয়ার বহুরূপী পাড়ায় ত্রিশূল গোঁজা সিঁদুর মাখানো দেবতার 'থান্' আছে, সেখানে চৈত্র-সংক্রান্তিতে বুড়ো শিবের পুজো হয়। একই স্থানে অবস্থান করেন চণ্ডী-শীতলা-মনসাও, বিভিন্ন সময় অবশ্য তাঁদের পুজো হয়। দাঁইহাটের আখড়া গ্রামে 'নবান্ন' আছে। ভূমিহীন বহুরূপীরাও নবান্নকে বিশেষ উৎসব হিসেবেই গ্রহণ করেছে নিজেদের জীবনে। অমাবস্যার কালীপুজোতেও আখড়ার বহুরূপীরা একান্তভাবেই যুক্ত হয়ে পড়ে। বহরমপুরের বসন্ততলার পাখমারা পাড়ায় বহুরূপী ডোমন রায়ের বাড়িতে মনসা পুজো হয়। বিষয়পুরের আশুতোষ চৌধুরী এবং নিমাই চৌধুরী বহুরূপীর শিক্ষা নিয়েছিলেন ব্রজেশ্বর রায় বা ব্রজশ্যাম ভাট নামক এক বহুরূপীর কাছে। ইলামবাজার-দেবীপুর-পায়ের অঞ্চলের বহুরূপীদের আদিগুরু রাম সূত্রধর এবং রামনাথ ঠাকুর। এঁরা সবাই বহুরূপীর অভিনয়ে যাবার আগে মা কালী এবং শিব বাবাকে প্রণাম করে নেয়, তারপর বাড়ি থেকে বেরোয়। দাঁইহাটের বহুরূপী সুকুমার রায় বাবা-মায়ের ছবি সবসময় সঙ্গে রাখে এবং তাঁদের প্রণাম করেই পথে নামে। আসলে অস্থিরমতি বহুরূপীদের স্থিতিশীল কোনো ধর্মবিশ্বাস বা দেবতা নেই। বিচিত্র সাজের ক্ষেত্রেও কোনো নির্দিষ্ট বিধিনিয়ম নেই। তবে নানান রূপ দেখানোর পর ৫/৬ দিনের শেষে বা সপ্তাহের শেষদিনে গোয়ালা বা গোয়ালিনী সেজে বহুরূপীরা সাধারণত অর্থ সংগ্রহ ক'রে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহুরূপীরা প্রতিদিনই পয়সা তোলে। বহুরূপীর সাজে পয়সা তোলার অসুবিধা হলে অনেক সময় তাদের সঙ্গে পয়সা তোলার জন্য বাড়তি লোকও থাকে। বহুরূপী দেখিয়ে চলে যাবার পর ডালি নিয়ে সেই চাল-পয়সা সংগ্রহকারী গেরস্থর দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। যাদের লোক থাকেনা তারা নিজেও তোলে। তাই বাঘ-সিংহ-তারকা রাক্ষসীর কাঁধেও অনেক সময় ঝুলতে দেখা যায় কাঁধ-ঝোলা। বহুরূপী তাদের কাছে সর্বাংশেই একটি বৃত্তিমাত্র, তার প্রভাব স্বাভাবিক জীবনে অনেক সময়ই ছায়াপাত করে না। তবে পোশাক পরার পর কেমন যেন একটা 'ঘোর' লেগে যায়। বহুরূপী বৃত্তিটি মূলত পুরুষ প্রধান। তবে ১২/১৩ বছরের শিশু কন্যারাও এখন মুখে রং মেখে বহুরূপী সেজে ট্রেনে ট্রেনে

ভিক্ষেতে নেমেছে, শুধু পরিবারের অভাবের কারণেই। আসলে শিল্পের চেয়ে জীবন অনেক বড়ো। ক্ষুধার চেয়ে কোনোকিছুর জ্বালাই বেশি নয়।

বিষয়পুরের বহুরূপীদের মোড়ল আনন্দ চৌধুরী মেয়ের বিয়ে দিয়েছে আখড়া গ্রামের পাখমারা পাড়ায়। তার জামাই অশোক রায় হলো আখড়া গ্রামের "মা সিদ্ধেশ্বরী বহুরূপী ও ঘোড়ানাচ" দলের সভাপতি। পঞ্চম মান পর্যন্ত পড়াশোনা অশোকের। আখড়া গ্রামটি বর্ধমান জেলার কাটোয়া—কালনা রাস্তায় দাঁইহাটের কাছেই। কাটোয়া থেকে সহজেই যাওয়া যায়। কৃষ্ণ-হনুমান-রাম-তারকা-খুনি-হঠাৎবাবু-কালী সবই সাজে অশোক। তারা বায়না নিয়ে অন্যত্রও অনুষ্ঠান করতে যায়। সে বহুরূপীর শিক্ষা নিয়েছে বাবা হারাধন রায়ের কাছে। রঘুনাথগঞ্জের কাছে মিঠিপুর মুর্শিদাবাদে এবং বীরভূমের ইলামবাজারের কাছে দেবীপুর গ্রামে তাদের আত্মীয়-স্বজন আছে। আখড়া গ্রামে ১৪ জন এখনও বহুরূপী সাজে—

১. হারাধন রায় (৫৫)	২. অশোক রায় (২৮)	৩. সাধন রায় (২৬)
৪ নাদন রায় (২৩)	৫. দুলাল রায় (৩৫)	৬. কানাই রায় (৪৫)
৭. বলরাম রায় (৬০)	৮ অর্জুন রায় (২৫)	৯. পরেশ রায় (৪৫)
১০ তারক রায় (২৬)	১১ বাপী রায় (২২)	১২. নিরঞ্জন রায় (৫৫)
১৩ সুজিত রায় (২৮)	১৪. ভরত রায় (৪০)	

'রায়' পদবি হলেও এরা সবাই-ই পাখমারাদের শ্রেণিভুক্ত এবং দরিদ্র প্রান্তবাসীও। যে কোনো পদবি অনায়াসে ব্যবহার করলেও নিজেদের 'ব্যাধ' বা 'বেদ' বলে উল্লেখ করে তারা। এই বেদ>ব্যাধ>বেদিয়া>বেদে শ্রেণিভুক্ত মানুষের মধ্যে যাযাবরত্ব ভাবটিই বেশি লক্ষ করা যায়। এরা মূলত বিহারের অধিবাসী ছিল। আবার 'পাখমারা' এই জাতি নামের মধ্যে ধরা আছে পাখি মারা বা পাখি শিকারের গল্প। একদা পাখি শিকারই ছিল এদের জীবিকা, পরে অরণ্যভূমি ফুরিয়ে ফাঁকা হ'য়ে যাবার কালে এরাও কৃষিকাজে বা অন্য কাজে নিজেদের যুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কোনোদিনই কৃষিকাজকে তারা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি। কোনো কোনো পাখ্মারা সম্প্রদায়ের মানুষ কোনোদিনই কৃষিকাজ করেনি। বর্ধমান জেলার আখড়া বিষ্টুপুর-গলাতন-দিগনগর প্রভৃতি এলাকাতেও পাখমারা শ্রেণির ২০/৩০ ঘর বহুরূপীর বাস আছে। তবে কোথাও তারা স্থায়ীভাবে থাকে না। পাখমারা ছাড়াও বহুরূপীদের মধ্যে কিছু সদ্‌গোপ শ্রেণির মানুষজন আছে। আবার কালনা অঞ্চলের দু'একজন বহুরূপী নিজেদের পরিচয় দেয় 'কৈবর্ত' হিসেবে। বর্ধমান জেলার আসানসোল-রাণীগঞ্জ-বরাবনি-দো'মহানী-দামোদরপুর প্রভৃতি খনি অঞ্চলের বস্তিতে হিন্দিভাষী কিছু বহুরূপীর দেখা মেলে, এরা মূলত জাতিতে ডোম। বহুরূপী **ব্যাঙেলা ডোম** এমনই একজন, সে এখন আসানসোলের জামুড়িয়া অঞ্চলে থাকে। এই এলাকায় ব্যাধ-নমশূদ্র এবং ডোম শ্রেণির বহুরূপীরাই সপরিবারে বসবাস করে। তবে এদের অনেকেই আর বহুরূপী সাজতে চায় না, অন্য পথে বেশি রোজগারের বাসনায় লিপ্ত হয়ে থাকে সারাক্ষণ। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া-তারকেশ্বর অঞ্চলে মাহিষ্য-সদ্‌গোপ বৈরাগী > বৈষ্ণব > বোষ্টম শ্রেণিরও কিছু বহুরূপীর দেখা মেলে। খুবই অল্প সংখ্যক হলেও নদিয়া, ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুরের খড়্গপুর-ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ব্যাধ বা ডোম শ্রেণির দু'এক ঘর বহুরূপী আছে। দিন দিন অবশ্য বর্ণবিভেদ মুছে গিয়ে প্রকট হচ্ছে

বিত্তবিভাজন। সেদিক থেকেও বহুরূপীরা প্রায় প্রত্যেকেই পিছিয়ে পড়া নীচের তলার মানুষ। জীবিকার প্রয়োজনেই তারা ভবঘুরে—যাযাবর। শিক্ষার অভাবের কারণে পেছনের সারির নাগরিক। অন্ধকার মাটির বা দরমার ঘরের কোণে একটি তাক্ বা তোরঙ্গ, সেখানে কমদামি পাউডার-কৌটো, মুখের রঙ-পালিশ, বহুরূপীর সাজ-পোশাক। দেওয়ালে বা চালের বাতায় ঝোলানো বাঘ-সিংহের আর কালী-তারকা রাক্ষসীর টিনের মুখোশ ইত্যাদি। ফুটপাতে কেনা সস্তার আয়না আর একটি যে কোনো ঠাকুরের ক্যালেন্ডার বা বাঁধানো ছবি। এসবই থাকে বহুরূপীব ঘরে। দারিদ্র্য-দীর্ণ জীবনের ছবি আরকী। 'বহুরূপীর বাহান্ন রূপ' বলে প্রচার করলেও কোনো বহুরূপীরই দশের বেশি সাজ-পোশাক আমার নজরে পড়েনি। সেও আবার বিবর্ণ, ছেঁড়া, পুরনো সেলাই করা এবং পট্টি দেয়াও। ঝক্‌ঝকে সাজ-পোশাক প্রায় নব্বই শতাংশ বহুরূপীরই নেই। ঝক্‌মকে সাজ-পোশাক বানানোর খরচাপাতি প্রায় কোনো বহুরূপীই জোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারেনি। যাদের নুন্ আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা, তাদের পোশাক তৈরি করার রসদ কোথায়? তাই বহুরূপীর বহু স্বপ্নই মাঠে মারা যায় অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণেই। তবে তারকেশ্বরেব বহুরূপী কালীপদ পাল সাজ-পোশাক ভাড়া দেন, হুগলির নিত্যানন্দ দাস বৈরাগ্যেরও ভালো পোশাক আছে, কুলিয়ার সুবল দাসেরও মোটামুটি মানের সাজপোশাক আছে, শুধু পাখ্‌মারা শ্রেণির বহুরূপীদেরই ভাল সাজ-পোশাক গড়ানোর মতো টাকা-পয়সা জোটে না। অথচ বহুরূপী দেখিয়ে বেড়ায় সারা বাংলা জুড়েই তারা। এ পেশায় তারাই সংখ্যাধিক্য শিল্পী। কিন্তু অবহেলিত এবং বঞ্চিতও। লোকনাট্যের পথ-প্রদর্শনী করেও এইসব বহুরূপীরা ভিক্ষুকের চেয়ে বেশি সম্মান অর্জন করতে পারেনি এখনো। কোনো কোনো বহুরূপীর পথ-পরিক্রমার অভিজ্ঞতাও বহুধা যন্ত্রণার। লোকশিল্পী হিসেবে ন্যূনতম সম্মান হতেও এইসব বহুরূপীরা আজও বঞ্চিত। তথাপি মনের আনন্দে জীবনের প্রয়োজনে ঘরের ঠিকানা ভুলে বহুরূপীরা মাস-দু'মাস বাইরেই কাটায়। গোটা সংসার তখন তার সাথে। স্কুলবাড়ি-ব্লক অফিসের বারান্দা-ক্লাব-গেরস্থর চালা বা গাছতলাতেই তখনকার আস্তানা। সে ঠিকানাও বদলে যায় দ্রুত। আবার বাড়িতে থাকার কালে জাল দিয়ে বাদুড় ধরে, আঠাকাঠি বা সাতনলা দিয়ে পাখি ধরে, কেউ কেউ জড়িবুটি-তাবিজ-তেলও বিক্রি করে।

বিষয়পুরের **আনন্দ চৌধুরী** ব্যাধের শ্বশুরবাড়ি বর্ধমান জেলার পানাগড়ে, সেখানেও ক'ঘর বহুরূপী আছে। ওখানের বহুরূপীরা এখনো পর্যন্ত কেউই খাস জমি বা অনুদান কিছু পায়নি। বীরভূমেব ডি-এম-এর উদ্যোগে অবশ্য বিষয়পুরের ৪২ জনকে 'ব্যাধ' বহুরূপীকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। তপশীল উপজাতির কার্ড এবং এককালীন ১১ হাজার টাকা অনুদানও পেয়েছেন তারা সরকারী উদ্যোগে। অন্য জেলার ক্ষেত্রে এ সুযোগ এখনো মেলেনি। রাজ্যের প্রথম বীরভূম জেলাতেই ৪২ জন বহুরূপী সরকারীভাবে পেয়েছেন সচিত্র পরিচয়পত্র। অন্যদিকে বর্ধমান জেলাব আখড়াতেই আছে প্রায় ৫০ জন বহুরূপী, তারা এসব সুযোগ থেকে এখনো বঞ্চিত। তাই অন্ন-সংস্থানের তাগিদেই তাদেরই কেউ কেউ যুক্ত হয়েছে ব্যবসায়, কেউ খাটছে জনমজুর।

উল্‌টো কথা বলে বীরভূমের বিষয়পুরের বহুরূপীরা। বীরভূম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের 'ব্যাধ' উপজাতির 'বেদিয়া > বেদে' বিভাগে বিবেচনা ক'রে রেশন কার্ড আর

সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ায় বিষয়পুরের পাখমারা পাড়ায় এখন খুশির হাওয়া। হীরু বহুরূপী এখনই তার কিশোরী মেয়েকে কিনে দিয়েছে বহুরূপীর পোশাক। 'বাইরে কতো খাতির গো আমাদের, পুলিশেও আর আগের মতো ঝামেলা করে না।' বিষয়পুরের ব্যাধ পাড়ায় একমাত্র বাণী ব্যাধ-ই ছেলে-মেয়েদের ভেতর প্রথম গ্র্যাজুয়েট। তাকে দেখেও বহুরূপীরা সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে সামান্য হলেও লেখাপড়ার কথা নতুন ক'রে ভাবছে।

তবে রাজ্যের সমস্ত যাযাবর-বহুরূপী-ব্যাধ-বেদেদের এখনো দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা হ'য়ে ওঠেনি এরাজ্যেও। অন্যদিকে বহুরূপীদের বিয়েতে আগে পণ লাগতো না। দিতে হতো পাখি ধরার জাল, শিকারের সাতনলা, লাঠি, কাঁড়-ধনুক, পাঁচ পোয়া ধান, পাঁচ পোয়া চাল, পাঁচ সিকে পয়সা, আর লাগতো পর্যাপ্ত মদ। এখন সেসব বদলে গেছে। ৮/১০ হাজার টাকা পণ না দিলে বিয়ে হচ্ছে না। সব পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। বহুরূপীরাও আর পদবিতে 'ব্যাধ' লেখে না, লেখে 'চৌধুরী'—'রায়' প্রভৃতি। তবে সেই চর্যাপদের আমলের মতোই গ্রামান্তে টিলার উপরে বাস তাদের ঘোচেনি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' নাটকে বহুরূপীর একটি চরিত্র আছে। যে কিনা জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে উঁচু বাড়ির নীচের তলায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো। দিনমান বহুরূপী দেখিয়ে রোজগার করে শহরে। রাত্রে ফিরে আসে সেই ঘরে। গ্রাম-বাংলার লোকশিল্পীরা আসলে সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতায় এসে তখন থেকেই পথ খুঁজতে শুরু ক'রে দিয়েছে। এই নাটকটিই সর্বাগ্রে 'এমন কর্ম আর করব না' নামের হাস্যরসাত্মক প্রহসন হিসেবে ১৮৭৭ সালে প্রথম অভিনীত হয়। পরে তারই নাম হয় 'অলীকবাবু'। অলীকবাবু-গদাধর- সত্যসিন্ধু জগদীশবাবু এবং দু'জন নারী চরিত্র ছাড়া নাট্যকাহিনিটির নেপথ্যে রয়েছে একজন বহুরূপী। নাটকটিতে ছদ্মবেশের উপকরণ সরবরাহ করানো হয়েছে মাত্র নেপথ্যচারী বহুরূপীকে দিয়ে। **বাংলা সাহিত্যে বহুরূপী হিসেবে 'অলীকবাবু' প্রহসনেই এই শিল্প এবং শিল্পীর প্রথম দেখা মেলে**। এই নাটকেই চরিত্র হিসেবে প্রথম উঠে আসে বহুরূপী।

বহুরূপীরা মানুষের মনোরঞ্জন এবং রোজগার দুইই করে এই লোকশিল্পটির মাধ্যমে। 'বহুরূপী' কথার অর্থও তো তাই, এক মানুষের বহুরূপ। নানারকম সেজে রুজি-রোজগার করা। অবশ্য তারই মধ্যে থাকে মনোরঞ্জনের নানান কৌশল। কৌতুক-নাটকাভিনয়-ভয়দেখানো-আতঙ্ক ছড়ানো ইত্যাদি নানারকমের সবাক বা নির্বাক অভিনয় দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দিয়ে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। নাচ-গান-ছড়া দিয়েও এইসব লোকশিল্পীরা একদা সত্যিই ভরিয়ে দিতে পারতো মানুষের মন। আজ না-পারা অংশটুকুই বেশি। এসব তেমন দেখতে চায় না কেউ। বহুরূপী এখনো যেটুকু বেঁচে আছে তা গ্রামেই, সেও মাত্র ২/৩ টি জেলাতে।

অবশ্য দেখা গেছে যেদিন থেকে শিকার করতে জঙ্গলে নেমেছে মানুষ তখন থেকেই তার রূপ বদলের প্রয়োজন হয়েছে। দেবতা নির্ভরতার যুগে লোকায়ত পৃথিবীতে ঘটেছে দেবতাদের মানবায়ন, তবে তাঁদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ছিল একটু বেশিই। এই কারণেই বহুরূপীরা প্রথম পর্যায়ে পুরাণ-ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারতের দেবদেবী সাজতেই ভালোবেসেছে। বৌদ্ধ সাহিত্য-মঙ্গলকাব্য-চর্যাপদেও বহুরূপ ধারণের একটা চেষ্টা চরিত্রের কোনো কোনোটির মধ্যে

রয়ে গেছে। জাতকের কাহিনি-শিবপুরাণ-অন্নদামঙ্গল-বৈষ্ণবসাহিত্য-শাক্তসাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বুপবদলের প্রয়োজন হয়েছে কোনো কোনো চরিত্রের। আসলে ধারণা একটা ছিলই, তবে 'বহুরূপী' সেজে তখন কেউই জীবিকা নির্বাহ করতো না। অবশ্য ভ্রামনিক নটেদের দেখা মিলেছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু 'বহুরূপী' বৃত্তি হিসেবে গৃহীত হয়েছে অনেক পরে এবং বৃত্তিটি রুটি ও রুজির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত।

আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে 'সঙ্' যেভাবে এসেছে, 'বহুরূপী' সেভাবে জায়গা দখল নিতে পারেনি। অথচ তাদের জীবনে ও শিল্পে সাহিত্যের উপাদান কোনোভাবেই কম ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসন 'অলীকবাবু'ই এক্ষেত্রে প্রায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। যদিও বহুরূপী সেখানে নেপথ্যচারীই। আন্তরিকতার স্পর্শে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ছিনাথ বউরূপী' সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবেই স্মরণীয়। কিন্তু সেখানেও দরিদ্র শ্রীনাথকে যা খুশি তাই বলার পর তার লেজটি কেটে নেওয়া হয়েছে। এটি আপাতদৃষ্টিতে বাঘের লেজ হলেও এটিই ছিল বহুরূপীর আত্মসম্মান। গ্রামবাংলার দলিত গ্রামীণ-চরিত্র হিসেবে ছিনাথের এই উপস্থিতি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের একটি কোণে মাত্র। তবু এই চরিত্র লেখকের চোখে দেখা। অসহায় গ্রামীণ-মানুষের এমন ছবি তিনি দেখেছেন। তথাপি নির্মল হাস্যরস পরিবেশনের জন্যই লেখক 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীনাথ বহুরূপীকে এনেছেন, আর এনেও উপযুক্ত জায়গা তাঁকে দেওয়া হয়নি। আসলে তৎকালীন সময় ও সমাজে দরিদ্র বহুরূপী শ্রীনাথ বা দরিদ্র কৃষক গোফুরদের জয়ের কোনো সুযোগ ছিল না, পরাজয়ের ভেতর দিয়েই তারা জীবনের গ্লানি বহন করে আনতে বাধ্য হয়েছে বাংলা সাহিত্যের বহুদূর পর্যন্ত। 'দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাংলা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই—না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী।' বহুরূপীর আড়ালে যে অসহায় 'ছিনাথ' নামের মানুষটি, তার কোনো যন্ত্রণাময় জীবনের ছায়াপাত কিন্তু নেই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কোথাও।

তারাশঙ্করের 'মতিলাল'ও সঙের মানুষ, বহুরূপী নয়। বিস্তীর্ণ রাঢ় বাংলায় আজও গাজনে—ধরমে 'সঙ্' সাজে প্রান্তীয় মানুষজনেরা নির্মল আনন্দ পরিবেশনের জন্যই। লোকদেবতার ভক্তদের দলে ঢোল-ঢাক-কাঁসি-বাঁশির সঙ্গে গ্রামপরিক্রমায় যায় সেই সঙের মানুষেরা। তারা ভালুক-হনুমান ইত্যাদি সাজে। মতিলাল গাজনের দলে ভালুক সাজে। তারাশঙ্কর বলেছেন—সঙের দলের ভালুকটিই মতিলাল, জাতিতে সে হাড়ি, বাড়ি তার ডোমপাড়ায়। বস্তা দিয়ে তৈরি ভালুকের পোশাক আছে তার, পেত্নি সাজার ছেঁড়া কাঁথাও আছে। কুৎসিত দর্শন মতিলালের মনে আছে সন্তান কামনা, সেকথা সে তার স্ত্রী ভোবনকে বলেছেও, কিন্তু ভয় হয়—যদি সেই সন্তান তার মতোই ভয়ঙ্কর কুৎসিত হ'য়ে জন্মায়। আসলে 'মতিলাল' লেখকের একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের চরিত্র। অনেকটা বহুরূপীর মতোই। কিন্তু গল্পের নায়ক হওয়ার জন্য জীবনের যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে মনোবিশ্লেষণেরই প্রয়োজন পড়েছে বেশি। তথাপি বলা যায় তারাশঙ্কর যা দেখেছেন, তাকেই শিল্পের সাজ পরিয়ে সাহিত্যের আঙনে জায়গা ক'রে দিয়েছেন। মতিলালও তার ব্যতিক্রম নয়। বুদ্ধ পূর্ণিমায় বৈশাখ মাসে ধরমপুজোর সময় মতিলাল শিশুদের মন ভোলানোর জন্য এক ভয়ঙ্কর সাজ সাজে। লেখকের বিবরণে—'ঢাকের সম্মুখে তালে.তালে নাচিতে নাচিতে আসিতেছিল

বিকট এক মূর্তি। মাথায় এক আঁটি খড়ে কালো রং মাখাইয়া পরচুলা পরিয়াছে, বিকটাকাব মুখে দুই গালের পাশে গজদন্তের মতো দুই দাঁত, রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা পরনে, জানু পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে দুই স্তন, সর্বোপরি ভয়াল তাহার দুই হাত, প্রত্যেকটি চার-পাঁচ হাত করিয়া লম্বা, এক হাতে একটি ঝাঁটা।'

এই বিকট দর্শন মূর্তি দেখে শিশুরা ভয়ে সেঁধিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট বাবুর চাপরাশী মতিলালকে লাঠিপেটা করে। 'ঝাঁটাবুড়ি'র নিষেধ হয়ে যায় গ্রামে ঢোকা। কাজেই শ্রীনাথেরই লেজ প্রথম কাটা যায়নি। আসলে এই শ্রেণির লোকশিল্পীরা-নটেরা সামাজিক অবিচারের শিকার হয়ে আসছেন সেই প্রাচীনকাল হতেই। তাঁদের জীবন-যন্ত্রণার ছবিটি চিরকাল একই রকমের।

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসেও লবটুলিয়ার জঙ্গলমহলের কাছারিতে একদল নট-মানুষের দেখা পাওয়া গেছে। তারা ঠিক বহুরূপী নয়, সঙের মানুষও নয়, 'ছক্করবাজি' নাচ-গানের দল। 'ননীচোরা নাটুয়া'র নাচ মুঙ্গেরের গেঁয়ো নাচ। তথাপি এই নাচই 'আরণ্যক' উপন্যাসে বহুরূপীর ঘরাণাকে মনে পড়িয়ে দেয়। ফসল ওঠার সময়ে দু'টো বেশি রোজগারের আশায় সেইসব নট-মানুষেরা আসেন। নক্ছেদি ভকতের দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী জানিয়েছে—'এই দেখবেন ফসল কাটা হয়ে গেলে আপনাদের এখানেই কত দেশ থেকে কত লোক আসবে। কত বাজিয়ে, গাইয়ে, নাচনেওয়ালী, কত বহুরূপী সঙ্—'। 'ননীচোরা নাটুয়ার জীবন দরিদ্র বহুরূপীরই জীবন।' সেই বৃদ্ধ লোলচর্ম মানুষটি পেটের তাগিদেই ননীচোরা-বালক সেজে ব্যর্থ মনোরঞ্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার সাজের উৎস স্থলে রয়েছে 'ক্ষুধা', যার নিবৃত্তির পথ খুঁজতেই ষাটোর্ধ্ব নাটুয়ার এই পথে নামা। তার দারিদ্র্যের ছবিও ধরা পড়ে লেখকের বর্ণনায়—'লোকটা পোঁটলা খুলিয়া দেখাইল তাহাতে আছে ছোট্ট একখানা টিনমোড়া আর্শি, একটা রাংতার মুকুট—ময়ূরপাখা সমেত গালে মাখিবার রং, গলায় পরিবার পুঁতির মালা ইত্যাদি কৃষ্ণঠাকুর সাজিবার উপকরণ। বলিল, "দেখুন তবুও বাঁশি নেই হুজুর। একটা টিনের বড় বাঁশি আট আনার কম হবে না। এখানে নলখাগড়ার বাঁশিতে কাজ চালিয়েছি।'

দেশ বিভাগের কালকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে আন্তরিক এক বহুরূপী উঠে এসেছে সমরেশ বসুর হাত ধ'রে। 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা' ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত। সমরেশ বসুর এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'সুচাঁদ' একজন বহুরূপী। বাংলাদেশের বিলডিহি গ্রামের মানুষ সুচাঁদ উৎখাত হ'য়ে কলকাতার বুকে আসার পরই তার অন্তরে জেগেছে এক ভিন্ন স্বদেশ প্রেম। ঢাকা জেলার বিলডিহি গ্রামের প্রান্তসীমায় এক উঁচু টিলার জমিতে বৈরাগীর ভাঙা-ভিটেতে তার বাস। জাতিতে সে সঠিক পিতৃপরিচয়হীন নমশূদ্র। চর্যাপদেও দরিদ্র শবরদের বাসও ছিল গ্রামান্তের উঁচু টিলাতেই। একালের বিশিষ্ট বহুরূপী সুবল দাস বৈরাগ্যেরও জন্ম পরিচয় বেশ অন্যরকম। মা মুখার্জী, বাবা ব্যানার্জী, পালকপিতা জাত বৈষ্ণব। সে নিজেও হয়েছে জাত-বৈষ্ণব। সুচাঁদও যাকে 'বাবা' বলে জানে সে মানুষটা ছিল স্থানীয় ভুঁইয়াদের মাইন্দার। বহুরূপী বৃত্তি তাদের নয়। সুচাঁদের বহুরূপীর গুরু হলেন বিলডিহি গ্রামের ডাক-পিওন কুতু রায়। চৈত্র মাসে কুতু রায় বহুরূপীর কালী সাজে সখে। সেই কুতুই সুচাঁদের দীক্ষাগুরু। কুতু রায় নিজে কালী সেজে সুচাঁদকে সাজাতো মহাদেব, তারপর নাচ হতো। কালীর দাঁতে কামড়ানো থাকতো টিনের লাল রঙ করা একটি জিভ্, গলায় ঝোলানো

থাকতো ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তৈরি নরমুণ্ডের মালা, গোটা গায়ে কালি মাখানো হতো, হাতে থাকতো টিনের দা। এইসব নিয়ে নাচতো কালী। বাঘের ছাল, ত্রিশূল, ন্যাকড়ার সাপ দিয়ে সাজানো হতো শিবকে।

সুচাঁদ আগে সিরাজদিঘির কার্তিক পালের কেষ্টযাত্রার দলে সখি সেজে নাচ-গান করতো। পরে সেসব ছেড়ে ছুড়ে হয়েছে বহুরূপী। হনুমান সেজে এই সুচাঁদ-ই নসরত ভুঁইয়াকে ভেংচি কাটে, সংলাপ বলে—

'সেলাম আলেকোম ভুঁইয়া সাহেব, হনুমানের নাম সুচান্দ বউরূপ্যা।
দেইখ্যা শুইন্যা একখান চক্চইকা সিকি দেন। ডালা ভইরা উড়ুম (মুড়ি)
দেন, এক দলা গুড় দেন, পালি ভইরা জল খাইয়া তাড়াতাড়ি যাইগা ॥'

ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করতে সুচাঁদ বহুরূপী এলো কলকাতায়, শহরে। কিন্তু পেট ভরানোর জন্য এত লড়াই? সুচাঁদ ভাবতে বসে—

'সেইখানে বউরূপী আছিলাম, সঙ আছিলাম। এইখানে আইয়া
ভিখারী হইছি। এইখানে আমার সঙ্ কেউ দ্যাখতে চায় না ॥'

প্রায় উপবাসী বহুরূপী সুচাঁদকে শহরে চোরাকারবারীদের মেয়ে বাসন্তীও বুঝিয়ে দিয়েছে বহুরূপী শিল্পের অযৌক্তিকতা। কালী-দুর্গা সেজে দশ হাত-জিভ্ লাগিয়ে শরীরের লোম চেঁচে ফেলে লোকের দরজায় গিয়ে বহুরূপী বকা খায়, তাড়া খায়, হয়তো দু'পয়সা ভিক্ষেও পায়। কিন্তু বাসন্তীর কাছে সেটা আদৌ সম্মানের নয়। এই বাসন্তী জানে শহরের লোক সঙ্-বহুরূপী দেখতে চায় না, তারা মেয়ে-পুরুষের লাফানি-ঝাঁপানি-কোমর দোলানি, উদ্‌লা গায়ে মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে শোয়া এসব পছন্দ করে। তাদের কি এই সুচাঁদের কালী-দুর্গা-হনুমান ভালো লাগে? বাসন্তী উপসংহারও টেনে দিয়েছে—'লাগে না'।

সুচাঁদ বহুরূপীর বৃত্তি ভিক্ষার সমতুল। নারী সেজে তার বিকৃতকাম পুরুষদের কাছে লাঞ্ছনারও সীমা থাকেনি। বিলডিহির সুচাঁদ বহুরূপী একজন দরিদ্রের প্রতীক মাত্র। বহুরূপী দেখিয়ে কলকাতা শহরে উপবাসে অর্ধ-উপবাসে দিন কেটেছে তার। যে মানুষ নিজের পেটটুকু ভরাতেই অসমর্থ, সে মানুষ বহুরূপীর পোশাক-আশাক কিনবে কোত্থেকে। তাই বাঘছালের অভাবে পুরনো বালিশের ডোরাকাটা খোল্ পরেই কেঁদুলির মেলায় তাকে মহাদেব সাজতে হয়।

বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' বইটির একটি বিশেষ দৃশ্যে নায়িকা কিশোরী-সীতা সুবর্ণরেখা নদীর তীরে শালবনের ভেতর আবিষ্কার করে ফেলে একটি পরিত্যক্ত এরোড্রাম। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এই বিমান ঘাঁটি আবিষ্কারের আনন্দে সে যখন উৎফুল্ল, ঠিক তখনই তার সামনে হঠাৎই হাজির এক ভয়ঙ্কর কালীমূর্তি। সাময়িকভাবে ভয় পেলেও সীতা জানতে পেরেছে ওটি আসলে কালী নয়—কালীর রূপধারী বহুরূপী। সত্রাজিৎ গোস্বামী বলেছেন—'বাংলা চলচ্চিত্রে এই প্রথম বহুরূপী এলো, এবং আজও পর্যন্ত সার্থকভাবে বোধহয় সেই একবার মাত্র।' ঋত্বিক ঘটক পরম প্রলয়ের প্রতীক হিসেবে ছোট্ট সীতার সামনে এনেছেন ভয়ঙ্কর কালীমূর্তিকে, সংহার শক্তিকে। তাই সেখানে বহুরূপীর জীবন ও শিল্পের কোনো প্রেক্ষাপট নেই। নবেন্দু ঘোষের 'সরিসৃপ' ছবিটিতেও বহুরূপীর কালী

চরিত্রটি এসেছে, কিন্তু ওই আসা পর্যন্তই। তার জীবনের ব্যাখ্যাদান সরিসৃপেও নেই, কালী বহুরূপী তাই এখানে একটি আরোপিত চরিত্র মাত্র। বরং সংহার-শক্তি যে আমাদের চারদিক থেকে গ্রাস করতে শুরু করেছে সেটাই সত্যি, বাস্তব সত্যি। সমাজ সংস্কৃতির সংকটের এই বিবর্ণ সময়কালে লোকশিল্পী বহুরূপীও সর্বাংশে সামিল।

আসলে 'সংকট' সবদিক থেকেই এসেছে। ক্ষুধাকাতর দারিদ্র্যক্লিষ্ট প্রান্তবাসী মানুষজন আর কোনোভাবেই টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হচ্ছে না এই বহুরূপী শিল্পটিকে। সেই পুরনো বিবর্ণ সাজপোশাক, সেই পৌরাণিক কালী-কৃষ্ণ-রাম-শিব-মহীরাবণ-কালকেতু...। সমকালীন দর্শকেরা সাময়িকভাবে এই নাট্যায়ন দেখে কৌতুকানন্দ উপভোগ করলেও, দীর্ঘস্থায়ী শিল্পছাপ তাদের মনে বহুরূপীরা রাখতে পারছেনা কোনোভাবেই। আর যুগোপযোগী আবেদন নেই বলেই উত্তেজক শরীর প্রদর্শনকারী সংস্কৃতির কাছে হটে যাচ্ছে বহুরূপী। আপাত দৃষ্টিতে মনোরঞ্জনের ক্ষমতা হারানো বলেই মনে হতে পারে, মনে হতে পারে এই লোকশিল্পের কোনো সম্ভবনা বা শিল্পগত উৎকর্ষতা নেই। যখন দেখি মহারাষ্ট্র-উত্তরপ্রদেশে এবং খোদ্ দিল্লি-কলকাতাতেও খদ্দের ধরতে বাণিজ্য বিপনীতে হোটেলে এমনকী বইমেলাতেও বড়ো বড়ো ছক্কাবক্কা জামা-পাজামা পরিয়ে জোকারের মতো বহুরূপীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই বহুরূপী রণপায়ে উঠে দিব্যি সবার থেকে উঁচু হ'য়ে হেঁটে যাচ্ছে, অঙ্গভঙ্গী করছে, নমস্কার করছে। আর এতেই ৮ থেকে ৮০ বছরের সবাই আনন্দ পাচ্ছে। ভিড় বাড়ছে দোকানেও। এসব ক্ষেত্রে মুখোশের ব্যবহার কম হলেও বিচিত্র রঙের আঁকিবুকিতে সাজানো হয় মুখটিকে। যা কিনা অনেকটাই বহুরূপী সাজের অঙ্গ। ইংল্যান্ডের বসন্তোৎসবে, জার্মান-ফ্রান্স-ইতালির কার্নিভ্যাল লোকোৎসবে ড্রাগন-সান্তাক্লজ-জোকার সাজার রীতি বেশ জনপ্রিয়। **ইংল্যান্ডের ফ্যান্সিবল উৎসবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একবার বাংলার জমিদার সেজেছিলেন**। প্রাচীন ভারতে এমনকী রাজা-জমিদারদের যুগেও বাজিকর-বহুরূপী-পটুয়া-সঙাল প্রভৃতি লোকশিল্পীদের গুপ্তচরের কাজে লাগানো হতো। শিবাজী থেকে নেতাজী সবাই প্রয়োজনে ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। যদিও এইসব 'প্রয়োজন' উৎসব বা কূট-রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ও যুক্ত। বহুরূপীদের মতোন জীবন ও জীবিকার সঙ্গে তা যুক্ত নয়। জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েই বেঁধেছে গণ্ডগোল, বহুরূপীরা শিল্পীর চেয়েও ভিখিরি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বেশি। কারণের উৎসমূল অবশ্য রয়েছে সেই—দারিদ্র্যেই।

কিন্তু শুধুই শিল্প নয়, বহুরূপীর সামাজিক মূল্যও তো রয়েছে। তারা যখন পোড়া বউ, খুনে স্বামী, প্রেমিক মজনু, হঠাৎবাবু, ছেঁদো মস্তান, প্রভৃতি সেজে আসে এবং উপযুক্ত সংলাপ ব'লে যায় তখন সমাজের নগ্ন দিকটির দিকে আমাদের নজর চলে যায় অনায়াসেই। গোয়ালিনী দুধে জল মেশায়, স্বামী স্ত্রীকে পণের জন্য পোড়ায়, মজনু প্রেমের জন্য পাগল হয়ে যায়, হঠাৎই হাতে পয়সা বেশি হ'লে হঠাৎবাবুরা 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করে, এইরকমই আরও কতো শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে বহুরূপী প্রদর্শনের আড়ালে। সেই হিসেবে পটুয়া-সঙাল-বাউলের মতোই বহুরূপীকে 'লোকশিক্ষক' বলা যেতেই পারে। সে সামাজিক মানুষকে সচেতন করে, সজাগ করে, প্রতিরোধ করার মনোবল জোগায়। মানুষকে সত্যের মুখোমুখি এনে হাজির করে। বহুরূপী তথা লোকশিল্পীদের এই গণজাগরণী শক্তিকেই কাজে লাগিয়ে রাজনীতির ঝানু ব্যক্তিত্বরা ভোটপ্রচারের কালে এইসব গ্রামীণ লোকশিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে

প্রচার চালাতে শুরু করেছেন সম্প্রতি। আসলে লোকশিল্পীরা নিজেরাও প্রান্তবাসী জনগণদেবতাদেরই তো একান্ত অংশীদার এবং গ্রামীণ লোকজীবনের চলমান বিদূষক। সেই লোকশিল্পীরা যদি প্রচারক হয় তাহলে অনেক কঠিন কাজই সহজে সমাধান হয় নিশ্চয়।

রিস্‌লে তাঁর 'দি ট্রাইবস্ এণ্ড কাস্টস্ অভ বেঙ্গল' গ্রন্থে বহুরূপী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—'বহুরূপীরা মনে করেন—তারা উমর-ই-যার নামক এক রাজসভার বিদূষকেরই উত্তরসূরী'। সত্যাসত্য বিচারে না গিয়েও বলা যায় যে—বহুরূপীরা গণজীবনের গতিময় বিদূষকই। অথচ লোকশিল্পীর কোনো মর্যাদা সেভাবে মেলেনি বহুরূপীদের। বরং 'ভিক্ষুক' হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে বেশি। পুরীর মন্দিরের সামনে ভিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত বজরংবলী হনুমান, প্রয়াগের সঙ্গমস্থলে এলাহাবাদে শিব সেজে ভিক্ষা অথবা সাঁইথিয়া—বোলপুর রেলপথে, পাঁশকুড়া স্টেশনে, বাঁকুড়ার পিচ্‌ঢালা পথে কিংবা তারকেশ্বর—হরিপালের পথে শিব বা কালীর ভিক্ষা চাওয়ার দৃশ্য সর্বত্রই এক। কোথাও-ই এর কোনো রকমফের নেই, আছে পেটভরানোর জন্য বিভিন্ন পথ ও পন্থা। বহুরূপী তাই হয়তো হ'য়ে উঠেছেন শিব-কালী বা অন্যকিছুর সাজ-পোশাক পরা ভিক্ষুকমাত্র। সামাজিক অধঃপতনের নাগরিক অহংবোধের ভুবনায়নের ক্ষেত্রে একটি শিল্পকে তথা দুর্বল লোকশিল্পকে শেষ ক'রে দেবার পক্ষে এইই যথেষ্ট। উপেক্ষার চেয়ে তো সত্যিই কোনো বড় শাস্তি আর হয় না।

বাংলার সামন্ততান্ত্রিক কালে বহুরূপীদের উদ্ভব বিবেচনান্তে আজ স্পষ্টই বলা যায় বহুরূপী মানুষগুলি যথার্থই দরিদ্র তথা 'লোক' পর্যায়ের। অতীতে এদের পূর্বপুরুষরা কেউ কেউ যাযাবর থাকলেও এখন এরা কেউই আর সে অর্থে যাযাবর নয়। প্রায় প্রত্যেকেরই সামান্য হলেও ঘরবাড়ি আছে, ঠাঁই-ঠিকানা আছে। কোথাও কোথাও দুর্বল হলেও সংগঠনও আছে। উন্নাসিক তথাকথিত উন্নত নাগরিক মনের মানুষেরা বহুরূপী বৃত্তিকে এখনো ভিক্ষাবৃত্তি বলেই মনে করেন। কিন্তু তাদের জানা দরকার, শিল্পের চেয়ে জীবন অনেক বড়ো। আদিম সমাজে জীবন-সংগ্রামের অনুষঙ্গেই শুরু হয়েছিল শিকারের, শিকার উৎসবের। কিন্তু আড়ালে তো ছিল সেই ক্ষুধা। শিকার করা পশু-পাখিকে তারা খেয়েছে পুড়িয়ে, রান্না করে, কিংবা কাঁচাই। সহজে শিকার পেতে তারাই এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত করেছিল জাদুক্রিয়ার। এই জাদুক্রিয়াগুলির ভিত্তিভূমিতেই দাঁড়িয়ে আছে মানুষের শিল্প সৃষ্টির আদি-উৎসভূমি। সুতরাং বহুরূপী বৃত্তির মধ্যেও পেট ভরানোর তাগিদ থাকাটাই স্বাভাবিক। তাকে 'ভিক্ষাবৃত্তি' বললেও আড়ালে তো সেই রুজি-রোজগার। এখনো তো মহালয়ার প্রভাতে প্রয়াত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে শুনি 'ধনংদেহি, রূপংদেহি, যশংদেহি'। মা দুর্গা তুমি আমাদের ধন ভিক্ষা দাও, রূপ ভিক্ষা দাও, যশ ভিক্ষা দাও। বৈষ্ণব বাউলেরাও 'মাধুকরী' করেন, সেও ভিক্ষারই নামান্তর। কাজের শেষে কর্মীরা পেয়ে থাকেন সাম্মানিক, আসলে ওটাই বা কী? ব্রাহ্মণ সমাজেও পৈতে হলে অন্ধকার গৃহবাসের পর বাইরে আসার দিন প্রভাতে ব্রহ্মচারী গাঁয়ে বের হয় ভিক্ষায়, সর্বপ্রথম যিনি ভিক্ষে দেন সেই মহিলাই হয়ে ওঠেন 'ভিক্ষে মা'। জন্মদাত্রী মা, 'ধাইমা, আবার ভিক্ষে মা'। মায়ের পর্যায়ক্রম আরকী। বৌদ্ধ সংস্কৃতিতেও 'ভিক্ষা'র একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। পুরাণের সর্বত্রই প্রায় শিব ভিক্ষুক। কর্ণের কাছেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন কবজ-কুণ্ডল ভিক্ষায়। সুতরাং 'ভিক্ষা' ব্যাপারটিও অগ্রাহ্যের মতোন কিছু নয়। কিন্তু ভিক্ষার সঙ্গে উপেক্ষা-করুণা এসব যুক্ত হলেই ভিক্ষার আর মর্যাদা থাকে না।

বহুরূপীদের ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটে যাচ্ছে প্রতিদিন। শিল্পীর সম্মান আর ভালোবাসা হতে বঞ্চিত হয়ে তারা ক্রমশই পরিণত হচ্ছে পথের ভিক্ষুকে। আসলে পরিবর্তনশীল সমাজের অর্থনীতির ঊর্ধ্বায়নে পিছিয়েপড়া শ্রমজীবী মানুষ অস্তিত্বরক্ষার নির্মম সংগ্রামে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে বাধ্য হয়ে নেমে যাচ্ছে ভিক্ষায়। এ তাদের অসহায় অবস্থার করুণ পরিণতির শেষ দৃশ্যও হতে পারে। কারণ এমন ভিক্ষাবৃত্তি আর তেমন পছন্দের নয় বহুরূপীদের উত্তর প্রজন্মের। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে চাকরির সঙ্গে দিনমজুর খাটতেও রাজী, তবু মুখে রং মেখে বহুরূপী সেজে আর ভিক্ষায় বেরোতে রাজী নয়। বহুরূপীদের সন্তান-সন্ততিরা মানুষ হিসেবে ন্যূনতম সম্মান আশা করেই বোধহয় সরে আসতে চাইছে এই বৃত্তিটি থেকে। মর্যাদা-সম্মান এগুলিতো প্রত্যেকেরই কাম্য।

বহুরূপী সন্দেহাতীত ভাবে বাংলার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী লোককলা। যদিও বহুরূপী-বৃত্তির উদ্ভবের ইতিহাস তাদের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ার সঙ্গে তথা অভাব-দারিদ্র্যের সঙ্গেই সংযুক্ত। অর্থ কৌলীন্য না থাকার কারণেই বহুরূপী শিল্প এবং শিল্পীরা সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকা মানুষেরই দলে। জাতি-বিন্যাস আজকের সমাজে অনেকটাই মুছে এসেছে অর্থ-গৌরব আসার সঙ্গে সঙ্গে। কুল-কৌলীন্য অর্জনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থানের একটা বিশেষ স্থান চিহ্নিত হয়েই রয়েছে। বহুরূপীদের অর্থহীনতাই তাদের সম্মানীয় হ'য়ে উঠতে বাধার-বিন্ধ্যাচল রূপে সামনে এসে থামিয়ে দিয়েছে। তাদেরও রাবণের মতো ভিক্ষুক হ'য়ে ওঠা হয়নি, পথে নামতে হয়েছে বাধ্য হয়েই পেটের তাগিদে করুণাপ্রার্থী ভিক্ষুকের বেশে। তাই বহুরূপীবৃত্তি আর ভিক্ষাবৃত্তি অনেকটাই সমার্থক এখন। সাজ-পোশাক ছেঁড়া-বিবর্ণ-তাপ্পি দেওয়া, মুখে ঠিক মতো সংলাপ নেই, ক্ষয়প্রাপ্ত শরীর ও চেহারা। অশিক্ষা আর সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ও কৃষিব্যবস্থায় সামিল না হ'তে পেরেই বহুরূপী বৃত্তির স্বল্প-প্রয়াসী উপার্জনের কাছাকাছি এসেছিল একদিন পাখমারা-বহুরূপীরা। যা আজ ভিক্ষার অনেকটাই কাছে।

যূথবদ্ধতার শিল্প-বৈশিষ্ট্য বহুরূপীর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল না, পরবর্তীকালে মঞ্চের প্রয়োজনে এসেছে। তীব্র জীবন-সংকট থেকে মুক্তি পেতেই বহুরূপী লোককথার শিল্পপ্রয়াস। 'লোক' পর্যায়ের এই মানুষগুলি সর্বার্থেই গ্রামীণ এবং আর্থ-সামাজিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির। মূলত কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে অনেকটা অপারগ অথচ শ্রমজীবী পর্যায়ের মানুষের হাত ধরেই বহুরূপীর সৃষ্টি হয়েছে। এরা সামন্ত রাজার গুপ্তচর বৃত্তিতেও নিযুক্ত থেকেছে। তারপর রাজা-জমিদার নির্মূল হবার পরই শিল্পবৃত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে বহুরূপী। যদিও প্রাচীনকাল হতেই সঙ, মুখোশ, বহুরূপ ধারণের একটি প্রবণতা মানুষের ছিলই।

বহুরূপ গ্রহণের থেকে বহুরূপী লোককৃতি গ্রামিণ সমাজ-বিন্যাসে সঙ-লোকনাট্যের একটি শাখা হিসেবেই বিবেচিত। যাযাবরত্বও এই বহুরূপীদের একটি প্রিয় সংস্কার। পরবর্তীকালে ভিক্ষার অপ্রতুলতা হেতুও স্থানান্তর যাত্রার প্রয়োজন পড়েছে। এমন ভবঘুরে নটেদের কথা 'তিত্তির জাতক'-এর কাহিনি-পরম্পরায় রয়ে গেছে। তারাও জীবিকার্জনের জন্যই লোকনাট্য শাখার বিদূষক নট্ সেজে গ্রাম-নগর পরিক্রমা করতো। এই বিচিত্র শাখার জীবিকা গ্রহণকারী নটেদের মধ্যেই পাচীনকাল থেকে আজকের বহুরূপীর সূত্র—সন্ধান মিললেও মিলতে পারে।

'জাতক' গ্রন্থকে ৩৭০ খ্রি.পূ. রচনা বলে অনুমান করেন পন্ডিতেরা। জাতক সংকলনেব ৪৩৮ সংখ্যক 'তিত্তির জাতকে' এমন-ই এক ভবঘুরে-নট তাপসের কথা আছে, যিনি কিনা নিজের অন্ন-সংস্থানের জন্য ভারবাহী মজুর, ভবঘুরে, বণিক, কসরৎবীর থেকে নিন্দিত যোগী পুরুষের ছদ্মবেশও ধারণ করেছেন। যে চরিত্রটি বহুরূপীর অনেক কাছাকাছি।

ভ্রমিল কলিঙ্গ দেশে করিয়া বহন
বণিকের পণ্যভাণ্ড; নিজেই আবার
সাজিয়া বণিক গেল দেশ-দেশান্তরে
দুর্গম বন্ধুর পথে, ...
মিশিয়া নটের দলে কিছুদিন তরে
দেখাইল দণ্ড-যুদ্ধ দর্শক সমাজে?
আবার ব্যাধের সঙ্গে হইয়া মিলিত
ধরিল বনের পশু বাগুরা বিস্তারি।
....
ধরিল জীবিকা-হেতু ফাঁদ পাতি পাখি;
কয়ালের কাজ করি, ধান্যাদি মাপিয়া
করিল অর্জন কিছু, ...
আজীবক হ'ল শেষে, ... ॥ (তিত্তির জাতক : ৪৩৮নং)

যোগী-সন্ন্যাসী-সাধুরা ঈশ্বর অনুসন্ধানী হয়েও অন্ন-সংস্থানের কারণে সুলভ-পন্থা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে গ্রহণ করেছেন। বাউলেরাও ভিক্ষা করেন, তাদের ভিক্ষাকে 'মাধুকরী' বলে। চর্যাপদেও ভবঘুরে নটের অস্তিত্ব আছে। গ্রামীণ কৃষিজীবী দরিদ্র মানুষজন অবসর সময়ে সুলভে অর্থাগম এবং লোকায়ত শিল্পের চর্চা হিসেবে বিনোদনের নটবৃত্তিকে গ্রহণ করেছে। এইসব নটশ্রেণির একটি সম্পন্ন শাখাই হ'লো বহুরূপী।

অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশে মনোরঞ্জনের বিষয় হিসেবে উত্থান ঘটেছে বহুরূপী'র, উনিশ শতকে বহুরূপীর অস্তিত্ব নিয়ে আর কোনো বিতর্ক আসেনি। মধ্যযুগ শেষ হচ্ছে ভারতচন্দ্রে, আধুনিক-যুগের সূচনালগ্নটিও চিহ্নিত হচ্ছে তাঁরই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এই ভারতচন্দ্রই 'রঙ্গচিতা' দলের মধ্যমণি শিবকে একেবারে 'সঙের-মানুষ' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, তাঁকে বহুরূপীও বলা যেতে পারে। ভারতচন্দ্র কৃত অন্নদামঙ্গলে রয়েছে—

দূর হৈতে শোনা যায় মহেশের শিঙা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গ-চিঙ্গা ॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥
কেহ বলে ভাল ক'রে শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও ॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই-মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥ (অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র)

এখানে দেবতা নয়, শিব সাজা মানুষটিই গৃহীত হয়েছে গ্রামীণ-সমাজে। তার-খড়-কাপড়-রঙ দিয়ে বানানো সাপটিকে দেখেও তাই ভয় নয়—মজারই উদ্রেক ঘটে মানুষের। এই শিব সঙের শিব, বহুরূপীর শিব।

তথাপি লোকায়ত এইসব নাট্যকর্মী কৌটিল্য বা পতঞ্জলির সময়েও গণিকাশ্রেণির সমপর্যায়ের চেয়ে বেশি সম্মান পায়নি। জাতকেও নিষাদ বা চণ্ডালশ্রেণির নটেদের স্থান সমাজের বাইরেই থেকেছে। সময়ের প্রেক্ষিতে আজ তাদের ভিক্ষাজীবী ভিন্ন আর কিসেই বা উন্নীত হবার ছিল! বহুরূপীরা নিজেরাও বৃত্তিটিকে ভিক্ষাবৃত্তিরই প্রকারভেদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এখন। এতে তাঁদের অনেকেরই কষ্ট আছে, তবে পেটও চলছে। মাসে ৬০০/৭০০ টাকা উপার্জনও হচ্ছে।

বহুরূপী সে অর্থে আঞ্চলিক নয়, সারা রাজ্যেই এমন কী তিব্বত ত্রিপুরাতেও বহুরূপীর অস্তিত্ব আছে। রংদার তিব্বতি বহুরূপী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লাল-সিং-পাতিয়ালার দোকানে নাচ-গান করতে দেখে এসেছেন লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধানী মানুষ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিপুরার জিংলাতলী গ্রামের হরিপদ চক্রবর্তীর মুখে তিনিই শুনেছেন—'তাদের গ্রামে তিনি একজন বহুরূপীকে ছোটোবেলায় দেখেছেন, তিনি নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের চাষী পরিবারের মানুষ ছিলেন, শিব-কালী-ভূত-প্রেত প্রভৃতি সেজে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন'। মূলত জীবিকার সন্ধানে পেটের অনিবার্য টানে ধুলো মাটির পথে নেমে এসেছে বহুরূপী, অভাব-জর্জর প্রান্তবাসী একজন মানুষ মাত্র।

নানান রূপসজ্জার জন্য দামী-বাহারী সাজ-সরঞ্জাম প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের জোটে না। থাকে মাত্র একটি ছোটো টিনের বাক্স। তার ভেতর ফিতে-পরচুলা-কমদামী পাউডার-টিপ-খুনরঙ-আঠা-রঙিন কাগজ-তুলি-চিরুনি-আয়না-নকল গয়না-দাড়ি গোঁফের ক্রেপ ইত্যাদি থাকে। গুঁড়ো রঙ-ভুঁষো কালি-খড়ি-হরিতাল-নীলও থাকে, এসবগুলো গুলে নিয়ে তারা হাত-মুখ-পেটের রঙ করে। পুঁটুলিতে থাকে রাজা-জমিদারবাবু-রাক্ষসী-কালী প্রভৃতির পোশাক। কোনোদিনই তা ইস্ত্রি হয় না, পরিষ্কার করা হয় না। চুমকি-জরি বসানো সে সব পোশাকের অনেকটাই আসে যাত্রাদলের বাতিল পোশাক থেকে। রূপসজ্জার ব্যাপারে পৌরাণিক চরিত্রের প্রতিই বহুরূপীদের টান বেশি। রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য-লোকপুরাণের শিব-কালী-রাম-হনুমান-মহীরাবণ-তারকা রাক্ষসী-কৃষ্ণ-হরগৌরী প্রভৃতি চরিত্রগুলি তাদের সর্বাধিক প্রিয়। গোয়ালা-গোয়ালিনীও প্রিয় চরিত্র, পয়সা তোলার ক্ষেত্রে এই চরিত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। বহুরূপীরা বলেন তাঁদের ৫২ রূপ। তবে নির্দিষ্ট কিছু নেই। রূপ প্রতিদিনই বদলে যেতে থাকে।

পৌরাণিক : হরিশ্চন্দ্র, কালকেতু ব্যাধ, দুর্গা, শিব, পুতনা রাক্ষসী, কালী, রাজা, বসুদেব, বিষ্ণু-দশভূজা, নন্দ, বেহুলা, নারদ।

রামায়ণ : তাড়কা রাক্ষসী, লক্ষ্মণ, সীতা, রাম, রাবণ, মহীরাবণ।

মহাভারত : কৃষ্ণ, অর্জুন, রাধা।

আধুনিক : ডিস্‌কো ডাকু, গব্বর সিং, লায়লা-মজনু, কলেজগার্ল, নরকঙ্কাল, হঠাৎবাবু, গোয়ালা-গোয়ালিনী, খুনি, রঘু ডাকাত, ক্ষ্যাপা-পাগল, ক্ষেপি, অর্ধনারীশ্বর, হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, মিঠাইওয়ালি, খেম্‌টাওলি, বাঈজী, তান্ত্রিক, পুলিশ, ভালুক-নাচিয়ে, লোকনাথ বাবা, ভণ্ড সাধু, দস্যু রত্নাকর, চার্লি-চ্যাপলিন।

পশু : হনুমান, বাঘ, সিংহ, ভালুক, জাম্বুবান, মহিষ।

বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জের ন'কড়ি শীল বহুরূপী 'জমিদার' সাজতেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সে গল্প শুনিয়েছিলেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বীরেশ্বরবাবু আমার কাছে তা উল্লেখ করেছেন।

বহুরূপীর রূপসজ্জায় বাড়ির স্ত্রী বা মায়েরা জামা-পোশাক সেলাই থেকে কোমরবন্ধ বেঁধে দেওয়া, মাথার পাগড়ি-চূড়া পরিয়ে দেওয়া, রঙ গুলে দেওয়া, ফিতে লাগিয়ে দেওয়া, চুল বেঁধে দেওয়ার মতো কাজগুলো করে দেয়। তাছাড়া বাড়ির রান্না-বান্নার কাজই করে থাকে। ছোটো কিশোরী মেয়েরা রাম-লক্ষ্মণ সেজে ভিক্ষেতেও বের হয় ট্রেনে। ছেঁড়া-ফাটা-পুরনো-বিবর্ণ পোশাক পরেই বহুরূপীদের রাজা-জমিদার-বাঘ-সিংহ-হনুমান সাজতে হয়। ঝলমলে বর্ণময় পোশাকের স্বপ্ন শুধু তাদের দু'চোখের মণিবিন্দুতে আঁকা থাকে বছরের পর বছর।

গ্রামীণ লোকনাট্যের এইসব কুশীলবেরা—বহুরূপীরা পথ-অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংলাপও বলে থাকে বেশ গুছিয়ে। তবে সবক্ষেত্রে তা একই রকম নয়। বদ্‌লে যায় মুখ থেকে মুখে। সবক্ষেত্রে অবশ্য সংলাপের প্রয়োজনও পড়ে না, সেখানে আনুসঙ্গিক লাফ-ঝাঁপ বা সাজটিই যথেষ্ট। যেমন হনুমান-বাঘ লাফ মারে, মা-কালীর লাফ-ঝাঁপ বা সংলাপ সবই অপ্রয়োজনীয়। শ্রোতা-দর্শকদের উদ্দেশ্যেই বহুরূপীর সংলাপ নিবেদিত। বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন কথোপকথনেরও কোনো সুযোগ নেই। কল্পিত চরিত্রের সঙ্গেও বহুরূপী কথাবার্তা বলে। সেইই তার সংলাপ, সেইই তার অভিনয়। সংলাপগুলি কোনো শিক্ষিত মানুষের রচনা না হওয়ায় তার সাহিত্য পাঠযোগ্যতা অনেক কম। এগুলি নিরক্ষর, স্বাক্ষরমাত্র বহুরূপীদেরই রচনা। এই বৃত্তিধারী যারা কিনা ক্ষুধা এবং জীবিকার প্রত্যক্ষ তাগিদেই মুখে রঙ মেখেছে। তাদের সাজসজ্জায় দেবদেবীর প্রতি একটি চোরা টান লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সর্বত্রই নিয়তিতাড়িত চরিত্ররাই আধিপত্য করেছে, সুতরাং সেখান থেকে সরে এলে লোকজীবন গ্রহণীয় হ'য়ে নাও উঠতে পারতো। মানব মনের দুর্বল জায়গাতেই আঘাত হানতে চেয়েছে বহুরূপীরা। পটুয়ারাও একারণেই মূলপট দেখানোর শেষে যমপট দেখিয়ে থাকেন। জনচিত্ত জয়ের প্ররোচনায় বহুরূপীরা নিজেরাই নিজেদের মতোন ক'রে সংলাপ-বক্তব্য বেঁধেছে। আর 'লোক' সাধারণের প্রাণের ভাষাই তো লোকসাহিত্য, বহুরূপীর নাট্য-সংলাপ সে পৃথিবীর বাইরে পা রাখবে কেন? কারণ সেও তো লোক-নাট্যেরই অঙ্গ। সামান্য মোটা দাগের সে সব সংলাপের মধ্যেও মধুসূদনের ধুতি-চাদরের মতোই বহুরূপী মানুষটির ক্ষুধাকাতর রূপটিই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। জেগে থাকে রক্ত মাংসের দরিদ্র মানুষটিই।

গলা থেকে পা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা, মুখের মুখোশের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা দু'টো থার্মোকলের দাঁত, কব্জিতে লাল কাপড়ের টুক্‌রো বাঁধা, বুক থেকে পেট পর্যন্ত নেমে আসা বালিসের মতো দুটো স্তন, হাতে টিনের খোপে বড়ো ক'রে আঙুল কাটা, চড়া গলায় নাকিসুরের বুলি। এমন তারাসুন্দরী বা তারাক্ষেপিকে দেখে প্রথম দর্শনে ভয় পাবারই কথা।

তারাসুন্দরী : ১. তারা সুন্দরী নামটি আমার, লঙ্কাপুরে ধাম।
ঠোঁট দু'টো মোর লাল টুক্‌টুক্, যেন মালদহেরই আম।।
মুখটি আমার শালকেতে ভরা, হাতে পায়ে জমা হাঁজা।
এমন রূপের চটক দেখে আমার—
বিয়ে করবো বলেছিল বদ্দমানের রাজা।।
পণ লাগবে দশটা টাকা, আর পাঁচ'পো চাল।
আজ যাবো পাশের গায়ে, আসবো আবার কাল।।

২.	পাড়াব নামুনেরা আমাকে লায়লী বলে ডাকে
বলে প্রেম কববে আমার সঙ্গে,
আমাকে পেতে হলে ভূতকাঠি গাছেব তলায়
তপিস্যে করগা রে হারামজাদারা।

রঘু ডাকাত : ১	আভি জান লেলিয়া হু শঙ্করকা,
আপনারও রেহাই নেই।
কোনো দিকেই পালাবার পথ নেই,
বোম, পিস্তল সবই রেডি আছে।
বহুত দূর সে আয়া হু মেই
খালি হাতে ফিরে যাবো না।
আপনার যা কিছু আছে ঢেলে দিন ঝোলায়
নাহলে জান লিয়ে লেবো।

২.	মেরা নাম হ্যায় রঘু ডাকু,
মারেগা চাকু।
কাঁহা গিয়া হ্যায় শঙ্করবাবু,
খুনের বদ্‌লা খুন চাই।

রাম . ১.	হ্যাঁ, কোথায় ভাই দেবরাজ লক্ষ্মণ
আজ আমি রণে ক্লান্ত। চল ভাই আর খানিক দূরে যাই,
যদি সীতারে পাই।

২. আপনারা কী দেখেছেন, আমার সীতাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? সাত সাগর আর তেরো নদীর পারে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাকে এক্ষুনি খুঁজতে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি ৫/১০ টা টাকা দিন।

৩. কোথায় সেই দানব রাবণ। তুই মোর সীতাকে করেছিস হরণ। আমার হাত থেকে তোর মুক্তি নাই। সীতারে যদি ফিবে না পাই, একবাণে বধিব তোরে নিশাচর রাবণ।

খুদি গোয়ালিনী : ১.	নামটি আমার খুদি গোয়ালিনী,
এক সের দুধে দু'সের পানি।
ছ'পোয়া দুধে ন'পোয়া জল,
এই তো ঘোষের মজার কল।
আমার নাম হচ্ছে রাধারানি,
আমার দইয়ে লাগে না চিনি
খাবার সময় টানাটানি।

২.	দুধ নিয়ে যান গো মা, দুধ নিয়ে যান।।
সকলের মাঝে আমি দুধ দিয়ে যাই।
কে গো মা দুধ নিয়ে যান।।

যাদের লাল গোরু বালতি শুদ্ধ দুধ উল্টে দেয়, তারা আমার দুধ খায়।
যাদের বাড়িতে সব মেয়ে, তাদের আগে ভাগে খাইয়ে দিই।
আর কালো ছাগলের ছানাপোনারা আমার দুধ খায়।

৩. দই দই ভালো দই।
বলি ভাগ্নি, আমি তোমার মামী হই।
আছি ভাল, কাপড় কালো, দু'দিন ধরে বাদল গেল।
এখন দশটা টাকা ফেলো।

৪. আমার নাম ফুলেশ্বরী, বিন্দাবনে বসত করি।
জষ্টি মাসের জামাই ষষ্ঠীর দিন দুধ-দই দিয়ে গেলাম।
দুধ-দই খেয়ে মুখ মুছেছো, পয়সা দিবার কথা মনে রেখেছো?
আজ পয়সা না নিঙে উঠছি না, হ্যাঁ।

গোয়ালাদের নন্দ ঘোষ :

১. দই নিবেন গো, দই।
আমার নাম নন্দ ঘোষ, চরাই ছ'কুড়ি ন'টি মোষ,
মোষেতে দুধ দেয় না, এইটে বড় দোষ।
ধারে দুধ-দই খেয়েছেন অনেকদিন,
আজ সব সুদে—আসলে মিটিয়ে দিন।

২. দই নিবেন গো, দই।
ভালো দুধের দই।
আমার দই-এর এমনি গুণ,
মামী পাগল ভাগ্নি খুন।
যে খাবে সে মজে যাবে,
বাকী দামটা এখন দিতে হবে।

তারকা রাক্ষসী :

সূর্পনখার মাসি আমি তারকা রাক্ষসী,
হাতি খাই, ঘোড়া খাই বড়ো বড়ো মানুষ খাই।

খুনি : জ্বলে গেল—জ্বলে গেল
আর সহ্য করতে পারছি না।
আমাকে চাকু মেরে চলে গেল
ধরুন, ধরুন আপনারা ধরুন।
আমাকে বাঁচান। ওষুধ কেনার কিছু টাকা দিন।

ক্ষেপি : পান খেয়েছি, পিচ ফেলেছি. দাঁত করেছি ছোলা,
আমার বন্ধুর নাম রেখেছি বকুল ফুলের মালা।

বলি ও মাস্টারমশাই হো-টি-টি গাছে জল দিয়ে কী হবে?
ও লংকা গাছে দড়ি দিয়ে আমার মরণ হবে।
ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং।

মজনু :

লায়লে—লায়লে—লায়লে। হো আকবর মিঞা, মেরে জানকো ছোড় দে—লায়লে না মিলে তো এ দুনিয়া ছোড়কে চলে যায়েঙ্গে। লায়লে—লায়লে।

ব্যাধ কালকেতু :

শিকার, শিকার, শিকার। সকাল থেকে বনে বনে ঘুরেও একটা শিকার মিল্‌লো না। আমার নাম ব্যাধ কালকেতু। বনে-জঙ্গলে বাস করি, পশু-পাখি শিকার করে খাই। স্বর্ণ-গোধিকার মুখ দেখে এসেছি আজ, তাই একটিও শিকার মিলছে না। ফুল্লরা আজ ছ'দিন উপবাসী আছে। আপনারা কিছু কিছু সাহায্য দিন আমাকে।

শিব :

ব্যোম কেদার,
গাঁজা খাও দেদার।
যে খায়না গাঁজাগুলি,
তাকে কি মানুষ বলি?

ব্যোম শঙ্কর ব্যোম ছট্‌কা,
উড়ে যা বড়ো ঘরের মটকা।

যে বলে খাচ্ছি গাঁজা,
তার সাত গুষ্টি বাঁজা।
গাঁজাই তো পুঁজি,
তার মহাজনকে খুঁজি।

যে বলে গাঁজা ভালো
সে দেখুক দিনের আলো।

মহীরাবণ :

আমার নাম পাতাল সম্রাট মহীরাবণ। রাবণ গেলেও আমি আছি পাতাল সম্রাট। তাই করিয়াছি ভদ্রকালীর পূজার আয়োজন। দেবো আজি মায়ের নামে রাম-লক্ষ্মণে বলি। শেষ বলিদান।

একক অভিনয় হলেও সংলাপে আঞ্চলিকতা, সংক্ষিপ্ততা, ক্ষিপ্রতা এবং অসংলগ্নতাও বহুরূপীর বক্তব্যকে অনেকখানিই মানবিক ও জীবন্ত ক'রে তোলে। কোথাও কোথাও তান্ত্রিক সাধক সেজে বসে থাকে ধ্যানে বহুরূপী, সামনে কলার পাতায় থাকে মানুষের রক্তাক্ত কাটা মুন্ড। রক্ত গড়িয়ে আসে কলাপাতা থেকে মাটিতে। এ অবশ্য বহুরূপীর ভোজবাজি। আবার-

কখনো শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মা-কালী, স্টেশনে-হাটে বা কালীর থানে। কখনো বা খড়-বিচালির ওপর কাপড় জড়িয়ে সতী বানিয়ে, তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্যতে মগ্ন হ'য়ে ওঠেন দক্ষযজ্ঞের শিব। শিব সাজা বহুরূপী। কখনো বা সীতা হারানো রাম দুঃখ ও হতাশায় ভেঙে পড়লে পাশে এসে দাঁড়ায় ভাই এবং দোসর লক্ষ্মণ।

শহরের দোকানে মা-কালী জিভ খুলে রেখে চা খাচ্ছেন, এ দৃশ্য অনেকেরই দেখা। মা-কালী কখনো কখনো বিড়িও খায়। চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছেন কুচ্‌কুচে কালো মা-কালী। সারা শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা, নাকে নথ্। গলায় রক্তাক্ত মুণ্ডমালা। পিঠ থেকে উঁচিয়ে আছে দু'খানি হাত। অর্থাৎ মা-কালীর সাকুল্যে চারখানি হাত, এক হাতে কাঁচা কাটা রক্ত ঝরা মুণ্ড। উপরের হাতে চক্‌চকে অস্ত্র। মাথাটা বেঞ্চিতে রেখে, বিড়ি আর দেশলাই বের করে মা-কালী। তারপর বিড়ি শেষ করেই উঠে পড়লো বাসে। বহুরূপী।

সারাদিন নেচে-কুঁদে বাড়ি ফেরা। মা কালীর কাঁধের ঝোলা উজার ক'রে মেলে দেড়-দু'কিলো চাল আর কিছু খুচরো পয়সা। পয়সাগুলো গুণলে ২০/২২ টাকা হয়। অথচ বাড়ির মানুষজনেরা তথা বহুরূপীর মা-বাবা-স্ত্রী-ছেলে-মেয়েরা সবাই তাকিয়ে থাকে ওই ঝোলাটির দিকেই। ওই দিয়েই পরিবারের সকলের জন্য দু'বেলার দু'মুঠো ভাত, সাজের সস্তা সিঁদুর-পাউডার। পুঁতির মালা, চোখের কাজল পেন্সিল, চিরুনি, আয়না সবই। খল্‌পা বা মাটির দেয়ালে বহুরূপীদের ঘরে ঝোলে বাঘ-সিংহ-মা কালী-রাক্ষসীর মুখোশ, বাঁশবাঁধা আলনায় তোলা থাকে ছেঁড়া-বিবর্ণ রাজ পোশাক। শিবের ডুগডুগি, ত্রিশূল, বাঘছালের কাপড়ও থাকে সেখানেই।

এত করেও লোকশিল্পীর মর্যাদাটুকু মেলে না বহুরূপীর। কোনো এলাকায় গেলেই আগে থাকতে থানায় জানিয়ে আসতে হয়, তারাই বলে দেয়—সন্ধ্যার পর আর নয়। জনসাধারণের নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হ'তে পারে। প্রাত্যহিক জীবনের এমনই রোদ্-ঝলসানো শরীরটাকে টেনে টেনে প্রতিদিন ডেরায় বা বাড়িতে নিয়ে আসা, আবার সকাল হতেই মুখে রঙ মেখে পথে নামা। লোকজীবনের চলমান বহুরূপী জনমত গঠনেব ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও বেশ খানিকটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'ছিনাথ বউরূপীর' ল্যাজটাই কাটা যায়। বারাসতের শ্রীনাথ বহুরূপীর খড়ে কাপড় জড়ানো ল্যাজটি আসলে তার আত্মসম্মান, সেটিই কেটে নিয়েছে তথাকথিত সমাজের সভ্যরা। আবার শ্রীনাথ বহুরূপীরাও অন্যকেউ নয়, লোকসমাজের একজন দরিদ্র লোকশিল্পীর প্রতীক মাত্র। সুতরাং উন্নাসিক-সভ্য সমাজের স্বীকৃতি আদায় করার ক্ষেত্রটি আজ টিভি-ডিভিডি-সিডি-সেল্‌ফোনের বিশ্বায়নে ঝল্‌মলে। সেখানে বিবর্ণ বহুরূপীর অনধিকার অনুপ্রবেশ আগামীতে কতটা কার্যকরী হয় সেটিই দেখার।

বহুরূপীদের জীবনকথা

সুকুমার চৌধুরী, আনন্দ চৌধুরী আর দিলীপ চৌধুরীদের বিষয়পুর :

'বিষয়পুর', ওই যে গো বহুরূপীদের গ্রাম। এখন বহুরূপীদের জন্যই এ গ্রামের খ্যাতি ও খাতির। বীরভূম জেলায় লাভপুর ব্লকের হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই গ্রামটি এখন 'বহুরূপীদের গ্রাম' নামেই পরিচিত। সাঁইথিয়া-লাভপুর পিচরাস্তায় অমৃতবাঁধ মোড়, একদা এই মোড় পথিকের কাছে—বাসযাত্রীদের কাছে ছিল ভয়ঙ্কর আতঙ্কের বিভীষিকাময় স্থান। চুরি-ছিনতাই-ডাকাতি-খুন এসব ছিল এ মোড়ের তখন নিত্যকার ঘটনা। বিষয়পুর গ্রামেও রাজনৈতিক কারণে গোটা আঠেক খুন হয়ে গেছে অতীতে। অবশ্যই সেসব পুরনো কথা। এখন ময়ূরাক্ষী নদীর চরবেলায় নিবিড় পল্লি বাংলার একটি শান্ত গ্রাম বিষয়পুর। যদিও ভালোভাবে মেরামত আজও হয়নি গ্রামের রাস্তাটি, আসেনি এখনও টেলিফোন। বহুরূপীদের পাখমারা পাড়ায় বর্ষায় হাঁটাচলা করাও মুসকিল হয়ে ওঠে। এই ভালকুঠি-বিষয়পুরকে কেন্দ্র করেই এক সময় প্রাক্-স্বাধীন যুগে বিপ্লবীদের 'অনুশীলন সমিতির'র শক্ত ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। এখন পথটি পিচের, বাস যাচ্ছে দাঁড়কা দিয়ে।

'ধরম দেবতা' রাঢ়ের জাতীয় দেবতা। এই 'ধর্ম' বা ধরমপুজোয় অব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য বেশি। কোথাও কোথাও অবশ্য এখন ব্রাহ্মণ পূজারীর চল্ হয়েছে। তবে দেয়াশীন এবং ভক্তরা প্রায় সবাই-ই বাউড়ি-বাগ্‌দি-ডোম-হাড়ি-ভল্লা-জেলে এমন কী পাখমারা সম্প্রদায়েরও বংশোদ্ভুত। এই লৌকিক উৎসবটি একই কারণে তাদেরই, অনার্যদেরই। এমনই চল্ হয়ে আসছে বীরভূম জেলাতেও। মঙ্গলকাব্যের একমাত্র পুরুষ মঙ্গল-দেবতা হলেন 'ধরম', তাঁর পুজোর অন্যতম প্রধান উপকরণ ছিল 'পিটুলি', এখন যা মদে পরিণত হয়েছে। তাছাড়াও 'ভর' নামা, 'বানফোঁড়া', 'ফুলখেলা', 'বলিদান', লম্বা গলার কাঠের ঘোড়া নিয়ে দুর্ধষ্য নাচ সবই ধরমপুজোর অঙ্গ। সঙ্গে থাকে 'ভাঁড়াল' নাচ। ভাঁড়াল হল মদ ভর্তি মাটির কলসী মাথায় নিয়ে নাচ। বীরভূমের সিজেকড্ডাং, বড় সাংড়া, ঈশ্বরপুর, কালিপুর, কড়িধ্যা, মালিগ্রাম, বেলে, সুরুল, কেঁদুলি, মেটেলা, তাঁতিপাড়া, রাতমা, বিষ্ণুপুর, কামারহাটি, জলন্দি, হাটসেরান্দি, ভালকুঠি-বিষয়পুর, এমন কী সদর শহর সিউড়িতেও পাড়ায় পাড়ায় ধরমপুজো হয়। ধরমপুজোর জন্য এ জেলাটি সবিশেষ বিখ্যাত। ধরমের থানে মাটির ঘোড়া বেঁধে দেওয়ার রীতিও এজেলায় প্রচলিত। বিষয়পুরে বহুরূপীদের নিজস্ব একটি ধরমপুজো আছে।

গ্রামে ঢুকতেই বিষয়পুরের ধর্মরাজতলা। বাঁধানো মন্দির, ছায়াসুনিবিড় গ্রামীণ শান্ত পরিবেশ। গ্রামেরও মূলকেন্দ্র এটিই। এখানেই বিচারসভা বসে, বিকেলে শিশু-কিশোরেরা খেলে বেড়ায় আবার বড়োরা মন্দিরের চাতালে তাস খেলে—আড্ডা দেয়। বুদ্ধপূর্ণিমাতে

বৈশাখ মাসে প্রচুর ধুমও গাঁয়ে। ঠিক ওইরকম তিথি হিসেব করে গ্রামে গিয়েই দেখলাম 'খোঁড়াবাবাকে' কাঁধে নিয়ে বেরিয়েছে ভক্তরা। 'খোঁড়া-বাবা' ধরম ঠাকুরের নাম। যেন আপনজনকে একটু আদর করে ডাকা। ৮/১০টি ঢাক, কাঁসি-বাঁশির আওয়াজে ম-ম করছে গ্রামের বাতাস। বেরিয়েছে কাঠের ঘোড়া, ছেলে-মেয়েদের সঙ্। অংশ নিয়েছে গ্রামের বহুরূপীরাও। সব মিলিয়ে বিষয়পুরের ধরমপুজোর বৈশিষ্ট্যই আলাদা।

এ গ্রামেই পাখমারা বা ব্যাধপাড়ায় বহুরূপীদের নিজস্ব একটি ধরমপুজো আছে। সেখানে বলিদানও হয়। দুর্গাপুর নামের আর একটি পাড়াতেও বাগ্‌দিদের নিজস্ব ধরমপুজো আছে। সব মিলিয়ে গ্রামে তিনটি ধরমপুজো। তিনজন ধরমদেবতা মিলিত হয়েই একসঙ্গে যায় 'মুক্তিস্নানে'। নাচ-গানের মধ্য দিয়ে ভক্তদের এই স্নানযাত্রা। 'মাকুরা'র কাছে একটি কান্দর গিয়ে মিশেছে বীরভূমের প্রাণ-প্রবাহিনী নদী ময়ূরাক্ষীতে, সেখানেই 'জাদুঘাটা'। সেই জাদুঘাটাতেই হয় ধরম দেবতার মুক্তিস্নান। মুক্তিস্নান অর্থ ধরম দেবতাকে সেখানের জলে স্নান করানো। ভক্তরাও স্নান করে, আর ঘটও ভরে আনা হয় সেখান থেকেই। ধর্ম ও বানেশ্বর শিব দু'জনেই লৌকিক দেবতা। বিষয়পুরে এক সিংহাসনেই তাঁরা অবস্থানও করেন।

লাভপুরের জমিদাররা এই বিষয়পুরের ধরমপুজোর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এদের অনেকেই তখন জমিদারী কাছারীতে কাজও করতেন, জমিদার বাবুদের পাইক-ও ছিলেন কেউ কেউ। এই পাইকরাই জমিদারী চলে যেতে চাকরি হারিয়ে রায়বেঁশের দল গড়েছিলেন। ভালকুঠি-বিষয়পুরে রায়বেঁশেদেরও একটি সুসংহত দল ছিল। বিষয়পুরের তিনটি ধরমের তিনটি পৃথক নাম আছে। মূল ধরমটির নাম 'খোঁড়াবাবা', দুর্গাপুরের ধরমের নাম 'খেলারামবাবা' আর ব্যাধ বা পাখমারাদের ধরমের নাম 'ফটিক বাবা'। আসলে এসব মানুষেরই নাম। অনার্য সভ্যতায় লোকায়ত আগুনে মানুষই দেবতা হয়ে ওঠে। বেশ বোঝা যায় বৈশাখি বুদ্ধপূর্ণিমার দিন বিষয়পুরে পুজো হয় জনগণদেবতার।

এক সময় লাভপুরের জমিদারদেরই এলাকাভুক্ত গ্রাম ছিল বিষয়পুর। এখনও 'বিষয়পুর' উচ্চারিত হ'লে লোক বলে 'ভালকুঠি-বিষয়পুর'। দুটি লাগোয়া গ্রামকে পৃথক করা শক্ত। এক সময় বহু বিখ্যাত রায়বেঁশে ওস্তাদের বাড়ি ছিল এই 'ভালকুঠি-বিষয়পুব'। তারাই ছিল তখন জমিদারদের শক্তি-সমর্থ-বল, সম্বলও।

'ধরম' বলতে ছোটোবড়ো কয়েকটি প্রস্তর খণ্ড। আবার একই কাঠের সিংহাসনে শিব-মনসা-যম-বা চণ্ডির সঙ্গেও তাঁর অবস্থান। ধর্ম বা ধরম দেবতা বেশ সহনশীল। বৌদ্ধ যুগের পেছনেও নাকি এই ধর্মপুজোর শেকড় ছড়ানো আছে। তারপর ব্রাহ্মণ্য-তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব প্রভাবের ধারা তার উপর দিয়ে বয়ে গেলেও ধর্ম দেবতার বিনাশ হয়নি একেবারে। যদিও সনাতনে নানান রূপান্তর এসেছে। কোথাও কোথাও কৃষিদেবতা শিব বা সূর্যের সঙ্গে মিলিজুলি ভাবও দেখা গেছে এই দেবতার। সিউড়িতে মালাকারদের মালিপাড়ায় প্রায় দুশ বছরের প্রাচীন ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ধর্মরাজপুজোয় সিউড়ির খ্যাতিমান উকিল ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনা ছিল। তিনি একটি টাকা দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠার কালে! যার চার আনায় একটি পাঁঠা এবং বাকী বারো আনায় পুজোর অন্যান্য খরচ তখন স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে গিয়েছিল। লৌকিক দেবতা ধরম রাঢ় বঙ্গের প্রধান লোকোৎসব।

মিলনমহোৎসব। এমনিতেই লোক-আঙনের উৎসব মানেই সম্প্রীতির উৎসব। জনসাধারণের উৎসব। বিষয়পুরের বহুরূপীরা এমনিতেই গ্রামের বাইরে থাকে সারা বছর। তথাপি ধরমপুজো আর নবান্ন উৎসবে তারা আসবেই। যে যেখানে থাকে এই সময় চলে আসে গ্রামে—বিষয়পুরে। ধরমপুজোয় মদের মচ্ছব চলে পাখমারা পাড়ায়। একই সঙ্গে বহুরূপী আর সঙ্ সেজে শোভাযাত্রায় বেরও হয় অনেকে।

কাঠের সিংহাসনে বড়ো ধরম 'খোঁড়াবাবা' ব'সে শোভাযাত্রার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে সবাইকে। বিষয়পুরে এই খোঁড়া বাবার চতুর্দোলা বয়ে নিয়ে যায় চারজনে। সুন্দর করে লাল-হলুদ-নীল ফুল দিয়ে মখমল-জরির কাপড়ের সঙ্গে সাজানো থাকে সিংহাসন। বাহন কাঠের ঘোড়াটিও যায় ভক্তের কাঁধে। সমস্ত গ্রাম আনন্দে উজার হয়ে আসে ধরমতলায়, হেঁটে যায় শোভাযাত্রার পাশে পাশে। আসলে খোঁড়াবাবা, খেলারাম বাবা এবং ফটিক বাবা উপলক্ষ্য মাত্র। আড়ালে জীবন্ত লৌকিক জনগণদেবতারই আসন পাতা। রাঢ়বঙ্গে বঞ্চিত মানুষের উৎসবই ধরম, ধরমপুজোর উৎসব।

'নমস্কার, চটাৎ করেই আপনাদের গ্রামে এল হঠাৎবাবু। দেন, চেয়ার ভাড়াটা দেন ১০ টাকা।' অবাক দৃষ্টি নিয়ে মানুষজন দেখছিল সে দৃশ্য। চমৎকার। সুন্দরভাবে সাজানো একটি চেয়ারে ধুতি-বিদ্যাসাগরি জুতো পরা দু'টো পা সামনের দিকে ঝোলানো। পা'দুটো অবশ্যই নকল। কিন্তু একদেখাতে বোঝবার উপায় নেই। দিলীপ বলেছিল 'খড় দিয়ে তৈরি।' মূল পা' দুটো খাড়া দাঁড়িয়ে কাপড়-কাঠ-বাতা দিয়ে তৈরি চেয়ারটিকে বয়ে নিয়ে চলেছে। দেখে মনে হচ্ছে চেয়ারের উপর একবাবু দিব্যি বসে আছেন। ধুতি-পাঞ্জাবী-হাতে রোদ চশমা। এমন দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হতেই হয়। এই দৃশ্যায়নের নাম বহুরূপীরা দিয়েছেন—'হঠাৎবাবু'। নিত্যানন্দ, দিলীপ, শৈলেন, সবাই-ই এই 'হঠাৎবাবু' সাজে। সাজটির মধ্যে একটি আলাদা মজা আছে। বিষয়পুরের **দিলীপ চৌধুরীর প্রিয় সাজ এই 'হঠাৎবাবু'**। দিলীপ চৌধুরী ব্যাধ। বয়স ৩৬ বছর। বাড়ি বিষয়পুর। থানা লাভপুর। 'ওই যে গো ভালকুঠি-বিষয়পুর'। অমৃতবাঁধের মোড় ঘুরে মোরাম মাটির পথ। ক'বছর আগে একটি স্থানীয় পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল—'তিহার জেল থেকে পালিয়ে এক দাগী খুনি আসামী সাঁইথিয়ার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থানা পুলিশ সব তটস্থ।' আসামীর বিবরণ ছিল এইরকম—'মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পাতলা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, মুখ দিয়ে সবসময় লালা ঝরে। ' অবশেষে ধরা পড়ল সেই খুনি আসামী। নাম তার শৈলেন চৌধুরী ব্যাধ, বয়স ২৯ বছর, বাড়ি বিষয়পুর। ঠিক ধরছেন, খবরের নিচে ছোটো করে লেখা ছিল 'বহুরূপীর রূপায়ণ'। সাঁইথিয়ায় এই বহুরূপীকে বহুজনই দেখেছেন। এত ভালো সেজেছিলেন শৈলেন যে পুলিশকেও কার্ড না দেখিয়ে বিশ্বাস করানো যায়নি।

বিষয়পুর গ্রামে ২৩ ঘর পাখমারা ব্যাধেদের বাস। লোকসংখ্যা শত খানেক। সবাই বিষয়পুরেরই ভোটার। এদের মধ্যে জনা তিরিশ সাজে বহুরূপী। কৃষি কাজে বা অন্যান্য কাজে তাদের মন বসেনা। প্রত্যেকেরই রেশন কার্ড আছে। তবে কবে, কখন থেকে তারা এই বিষয়পুরে বসবাস করছে সে তাদের অজানা। ব্যাধ-পাখমারা-বহুরূপীদের এই পাড়াটি 'পাখমারা. পাড়া' বা 'পাখেরা পাড়া' নামে পরিচিত। গ্রামের প্রায় পশ্চিমপ্রান্তে একটি

পুকুরকে ঘিরে বহুরূপী ব্যাধেদের বসতি। কখন এই ব্যাধ-যাযাবর সম্প্রদায় বিষয়পুরে বসতি স্থাপন করেছে বর্তমান ব্যাধেদের মোড়ল **আনন্দ চৌধুরী** ব্যাধেরও তা জানা নেই। আনন্দ তথাপি বলতে পারে তাদের ১২২ বছরের ইতিহাস।

'বহুরূপীটাকে নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের **ব্রজেশ্বর রায়** এখানে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের এটা জাত ব্যবসা ছিল না।' আনন্দ অবশ্য তার পিসতুতো দাদা আশুতোষ চৌধুরীর কাছে বহুরূপীর করণ-কারণ রপ্ত করেছে। আশুতোষ চৌধুরী হলেন দিলীপ চৌধুরীর বাবা। আগে ধনেশ পাখি নিয়ে বাতের তেল-জরি-বুটি বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করতো এই ব্যাধেরা। বিষয়পুরের কোনো কোনো ব্যাধ পরিবার এখনও বাইরে থাকে এবং সেই জরি-বুটি বিক্রী আর পাখি শিকার করেই সংসার চালায়। বিষয়পুরের বহুরূপী ব্যাধেদের মাত্র তিনজনের সামান্য জমি আছে। খাসের জমিও পেয়েছে কেউ কেউ, তবে সে সেই গোপালপুরের ডাঙায়। দূরে বিচ্ছিন্নভাবে বিষয়পুরের বহুরূপীরা থাকতে নারাজ। তাই ডাঙা পতিতই পড়ে আছে। ঘর হয়নি একটিও। আগে তো এই ব্যাধেরা জানতোইনা তারা কোন জাতি? তাতে অবশ্য কোনো অসুবিধাই হয়নি তাদের, শুধু সুবিধাগুলো সব হাতছাড়া হয়ে গেছে। ২০০০ সালে বিষয়পুরের বহুরূপীরা 'ব্যাধ' হিসেবে সার্টিফিকেট পেয়েছে। ১১ হাজার টাকা করে অনুদানও পেয়েছে প্রায় প্রত্যেকেই। যাযাবর উপজাতি গোষ্ঠীর তক্‌মা পেয়ে বিষয়পুরের পাখমারা পাড়ায় আজ খুশির হাওয়া বইছে। এদের কেউই অবশ্য কৃষিকাজে দক্ষ নয়। সবাই-ই দরিদ্র। বহুরূপী দেখানোই তাদের জীবিকা, পেশা। তাই এখন 'চৌধুরী' উপাধির পাশে বিষয়পুরের বহুরূপীরা 'ব্যাধ' লিখে রাখে ব্রাকেটের মধ্যে। বিষয়পুরের প্রায় ৩০/৩২ জন পুরুষ গ্রামের বাইরেই থাকেন বছরের বেশিরভাগ সময়। **সেন্টু চৌধুরী ব্যাধ** বলেছিল—'আমরা তিনবার গাঁয়ে আসি। আসবোই। একবার হল বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধরমপুজোর সময়, একবার লবানে আর ভোট থাকলে একবার।' আগে বহুরূপী ব্যাধেদের বিয়েতে পণ লাগতো না। কণ্যাপণ ছিল। তবে লাগতো—পাখি ধরা জাল, শিকারের সাতনলা, তীর-ধনুক, পাঁচ পোয়া ধান, পাঁচ সিকে পয়সা, এইসব। মদ ছাড়া অবশ্য উৎসব নেই। বিয়ে বা পরব সবেতেই মদের মচ্ছব চলতো। সব বদ্‌লে গেল এই ক'বছরে। এখন ৮/১০ হাজার টাকা লাগে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে। মদ তো লাগেই। আরও কত কী লাগে। আংটি-ঘড়ি-সাইকেলও চাইছে অনেক পাত্রপক্ষ।

বহুরূপী দেখিয়েও আগে ভালো রোজগার হতো, এখন খেয়ে-পরে দিন চলে যায় মাত্র। সেন্টু ব্যাধ এখনই ভাবতে বসেছে—মেয়েটার বিয়ে দেবে কিভাবে? তবে সবটাই হতাশার খবর নয়। ইতিমধ্যেই বিষয়পুর গ্রাম থেকেই ১৩ জন বহুরূপীর একটি দল কলকাতায় গিয়ে মধুসূদন মঞ্চ মাতিয়ে দিয়ে এসেছে। একা একা বা দলবদ্ধভাবে ওরা ঘুরেছেও বহু জায়গায়। গৌহাটি-বহরমপুর-সিউড়ি-লাভপুর-বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-কাকদ্বীপ-কলকাতা-বর্ধমান-আসানসোল-রাণীগঞ্জ-কাটোয়া-দিল্লি-আমেদাবাদ ভারতের সর্বত্র। আর ভাতঘর সাঁইথিয়াতো আছেই। এখন বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে বিষয়পুরের পাখমারা পাড়ায়। সেন্টু ব্যাধ অবশ্য তার ছেলেকে লেখাপড়া করাচ্ছে চাকরি করানোর জন্য। আবার হীরু ব্যাধ তার ছ'বছেরর মেয়েকে এখনি কিনে দিয়েছে বহুরূপীর পোশাক। এই বিষয়পুরেরই

সুকুমার ব্যাধ কলকাতা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পুরস্কার অর্জন করে এনেছে। ব্যাধ-বহুরূপীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার রেওয়াজ কম হলেও **সুকুমারের মেয়ে বাণী ব্যাধ লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স সহ গ্র্যাজুয়েট হয়েছে**। বাণী এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের করোস্‌পনডেন্স কোর্সে বাংলায় এম-এ পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সুকুমারের অন্য ছেলে খোকনও বি-এ পাশ ক'রে এখন একটি চাকুরি পেয়েছে। ছিনাথ বহুরূপীর আমল থেকে বহুরূপীর কথা জনমহলে প্রচারিত হলেও বহুরূপের আড়ালে এই বহুরূপীর জীবন কিন্তু যথেষ্টই কষ্টের। জীবিকা হিসেবে বহুরূপী কিন্তু সমাজে ভিক্ষুকের চেয়ে খুব বেশি সম্মান আজও অর্জন করতে পারেনি।

মুখে রং মেখে সং সাজাই সাব, ভালভাবে সংসারও চলে না বহুরূপী দেখিয়ে। তথাপি বংশ গৌরব টিকিয়ে রাখতে বহুরূপী-শিল্পীর কষ্টকর জীবনও আঁকড়ে ধরে রেখেছেন বিষয়পুরের ব্যাধ-পাখমারারা। ৩২টি পরিবারের এখানে একমাত্র জীবিকা হল সারা বছর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বহুরূপী দেখিয়ে বেড়ানো। তাদের কারণেই বহুরূপীদের-গ্রাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে বীরভূম জেলার লাভপুর থানার প্রত্যন্তে অবস্থিত এই বিষয়পুর গ্রামটি।

অতীত দিনের সম্মান আর নেই। পেটের ভাতটুকুও ঠিক মতো রোজগার হয় না। তবু নিজেদের 'বহুরূপী' বলে পরিচয় দিতে রীতিমতো গর্ব বোধ করেন **সুকুমার চৌধুরী ব্যাধ, দিলীপ চৌধুবী ব্যাধ, আনন্দ চৌধুরী ব্যাধেরা**। বীরভূম জেলা 'তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর' থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত দিলীপ এবং রাজ্য 'তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর' থেকে পুরস্কার পেয়েছেন সুকুমার চৌধুরী। তাদের বক্তব্য—'পেটের জন্য এখন মানুষের দরজায় দরজায় ভিক্ষে করি ঠিকই, কিন্তু আমরা তো শরৎচন্দ্রের শ্রীনাথ বহুরূপীর বংশধর—বহুরূপী শিল্পী।'

শিল্পী পরিচয়ের আড়ালে যে যন্ত্রণা তাও চাপা থাকেনি সুকুমার বহুরূপীর বি-এ পাশ মেয়ে বাণী ব্যাধের কণ্ঠে। বাণীই বহুরূপী-পাড়ায় সর্বোচ্চ শিক্ষিতা। তার বক্তব্যে অভিমান বর্ষিত হয়—'আমাদের অনেকের বাড়িতেই ঝুলি ভর্তি সরকারি বেসরকারি শংসাপত্র রয়েছে। কিন্তু সে সব আমাদের পেট ভরাতে কোনো কাজেই লাগে না। বছরে দু'বছরে এক-আধবার ডাক আসে, তখন কিছু সাম্মানিকও মেলে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সংসার চালানোর কোনো স্থায়ী সমাধান হয় না। পেটের জন্য সারা বছর-ই ছেলে-বুড়ো সবাইকেই মুখে রং মেখে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হয়। এই রং মেখে সং না সাজলে বহুরূপীরা খেতে পর্যন্ত পাবে না।'

বিষয়পুরের বহুরূপী পাড়ায় কোনো পরিবারেই স্বচ্ছলতা নেই। সবার বাড়িতেই খড়ের ছাউনি, মাটির দেওয়াল। দু'একজনের মাত্র খুপরি-টালির-টিনের ঘর। বহুরূপীদের সব বাড়িতে এখনো বিদ্যুৎ আসেনি। অন্ধকার, স্থায়ী আঁধার সেখানে। চালা ঘরগুলিও ক্ষতবিক্ষত। সর্বাংশেই জৌলুষ বিহীন। তাই বাড়ির প্রতি তেমন কোনো টানই নেই বহুরূপীদের। তবে আনন্দ-সুকুমার-দিলীপের বাড়ি তারই মধ্যে ভাল।

বিষয়পুরের বহুরূপী **নবকুমার চৌধুরী ব্যাধ** তিনপুরুষ ধরে বহুরূপী দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। স্কুলের পাঠ নেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। ছেলেদেরকেও পড়ানোর ব্যবস্থা করতে

পারছেন না নবকুমার। স্ত্রী জ্যোৎস্না এবং দুই ছেলে লাল্টু আর মথুরাকে নিয়ে সারা বছর বাইরে বাইরেই কেটে যায় তার। বাড়িতে বা এক জায়গায় থাকতে না-পেলে ছেলেদের পড়াশোনা হবে কীভাবে? আর বাড়িতে বসে গেলে তো খেতেই পাওয়া যাবে না। নবকুমার বললেন—'সে সম্মান আর নেই। লোকে ভিখিরিই ভাবে। তাই সারাদিন মুখে রং মেখে সং সাজাই সার হয়, সবদিন সবার পেটের ভাতও জোগাড় হয় না। আর সেই কারণেই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কথা আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবতে পারি না। তার চেয়ে তাদেরকেও সং সাজিয়ে পথে নামিয়ে দিই। ভিক্ষে করে দু'টো পয়সা তো আনতে পারে।'

বাস্তবিকই যাযাবরের জীবন যাপন করতে করতেই ঘরের টান নষ্ট হয়, যোগসূত্র ছিঁড়ে যায় বাড়ির সঙ্গে। পাড়ার অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই বর্ণপরিচয়ের রঙিন মলাট না দেখে বাল্যাবস্থাতেই চিনে যায় 'সং সাজার রং'। তারপর কচি কচি হাতে রং তুলে নিয়ে কেউ সাজে রাম, আবার কেউ হয়ে যায় রামভক্ত হনুমান। এইভাবেই হাতেখড়ি হয় বিষয়পুরের বহুরূপীর। তাদের মায়েরাও সযত্নে সাজিয়ে দেয় সন্তানকে। পোশাক ছিঁড়ে গেলে তা সেলাই-ও করে দেয়। শিশু বহুরূপীরা ট্রেনে-বাসে গেলে পাশেপাশে থেকে তাদের সবসময় লক্ষ্যও রাখে মায়েরা। এভাবেই হারিয়ে যায় বিষয়পুরের বহুরূপীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, সোনালি-শৈশব। তারা অ-আ-ক-খ-র পরিবর্তে মা-বাবা এবং অন্যান্য বড়োদের কাছ থেকে শিখে ফেলে 'রাম' কিংবা রামভক্ত 'হনুমানে'র' সংলাপ এবং তাদের চাল্‌চলনের কৌশল। সদ্য সাক্ষর হয়েছেন **শৈলেন চৌধুরী ব্যাধ**। তার এবং তার স্ত্রী অঘ্রানির বক্তব্য হল—'কী করবো, এটাই বিষয়পুরের ব্যাধ পাড়ার ভবিতব্য! ছোটোবেলা থেকেই বাপ-মায়ের সঙ্গে ঘুরেছি, স্কুলে আর যাওয়ার সময় পেলাম কই! আমাদের ছেলেমেয়েরাও একইভাবে আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

এ ছবি শুধু শৈলেন—অঘ্রানি বা নবকুমার জ্যোৎস্নার পরিবারের নয়, কী শীত-কী গ্রীষ্ম সারা বছরই বহুরূপী পাড়ার অধিকাংশ পরিবার ঘরবাড়িতে তালা দিয়ে বেরিয়ে যান রুজির সন্ধানে। কারও বাড়ি আগ্‌লায় বৃদ্ধ বাবা-মা। বছরে মূলত দু'বার ধবমপুজো এবং নবান্নে বাড়ি আসে বিষয়পুরের বহুরূপীরা, তখনই দিন কয়েকের জন্য স্বজন-পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। অক্ষম বাবা-মায়ের যৎসামান্য রসদ রেখে আবার বেরিয়ে পড়া। মন ভরে না, পেট ভরে না, তাহলে বৃথা এ সং সাজা কেন? শৈলেন ব্যাধ সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন তার—'কী করবো, **আমরা তো ছিনাথ বহুরূপীর বংশধর, আমরা তো আর মাঠে মুনিষ খাটতে পারি না।'**

বহুকষ্ট করেও ছেলে আর মেয়েটাকে শিক্ষিত ক'রে তুলেছেন সুকুমার চৌধুরী ব্যাধ। তারা স্বামী স্ত্রীতে বাইরে গেছেন, বাড়িতে থেকেছে বাণী আর খোকন। ছেলেমেয়েকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যায়নি কোনোদিন তারা। ভাইবোন মিলে তারা পড়াশোনা করেছে ঘরে বসে, কষ্টও করেছে অনেক। আজ দু'জনেই গ্র্যাজুয়েট, দু'জনেই বহুরূপী পাড়ার গর্ব, অহংকার। এখনও ভাইবোনে থাকে বিষয়পুরে, মা-বাবা চলে যান উখরা বা আমোদপুরে। আর অসুবিধা হয় না। নির্দিষ্ট সময়ে সুকুমার নির্দিষ্ট জায়গায় টেলিফোন ক'রে ছেলেমেয়ের

খবর নেন্। এখন তো দু'জনেই বড়ো হয়ে গেছে। এক সময় তো ছোটো ছিল, তখন ওদের ছেড়ে থাকতে কষ্টই হয়েছে সুকুমার আর তার স্ত্রী কল্যাণীর। কিন্তু উপায় কী। রোজগারের একমাত্র পথই তো বহুরূপী সাজা।

বাণী আর খোকনের সঙ্গে বারবার কথা বলে দেখেছি ওদের ভেতরও একটি অভিমান আছে। বাণীই অবশ্য বেশি প্রতিবাদী। সেই তো বড়ো। ভাই খোকনের অনেকটা দায়িত্বই নিতে হয়েছে তাকে। রান্না ক'রে খাইয়ে ভাইকে স্কুলে-কলেজে পাঠিয়েছে সে। তারপর ভেবেছে নিজের কথা। —'আমাদের লেখাপড়ার জন্য দাদু আর মায়ের ভূমিকাই বেশি। তাও যদি মাকে কাছে পেতাম আরও ভালো হতো। পড়ে বুঝলাম। আমার বাবার যাযাবরের জীবন। দাদুও বহুরূপী সাজেন। মা যদি ওঁদের সঙ্গে না যায় তবে দাদু বা বাবা খেতে পাবে না। ওদের রান্না ক'রে খাওয়ানোর জন্যই মায়ের যাওয়া দরকার। আমিই পারবো এখানে চালিয়ে নিতে। শক্ত হলাম। ভাইকেও পড়াতে লাগলাম। দাদু **(দুঃখহরণ)** বলতেন, 'দেখো, আমাদের মতো যেন তোমাদের মুখে রং মেখে বেড়াতে না হয়।' বর্ধমান জেলার গুসকরার কাছে জালপাড়ায় মায়ের বাপের বাড়ি। মা ভালোবাসেন লেখাপড়া। তিনিও চেয়েছিলেন তার ছেলেমেয়ে যেন লেখাপড়া শেখে। তাদের যেন বাবার মতো বহুরূপী সেজে ভিক্ষুকের জীবনযাপন করতে না হয়। ছেলে মেয়েদের বাড়িতে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে বহুরূপী দেখাতে যেতে হয় নিরুপায় ভাবেই। খেয়ে-পরে সংসার চালানোর অন্য ব্যবস্থা থাকলে এভাবে কেউ চলে যেতো না। কষ্ট তো মা-বাবারও কম হয় না। কিন্তু অভাবের জন্যই যেতে বাধ্য হয় বিষয়পুরের বহুরূপীরা। বাণী আর খোকনের মতো সবাই-ই বোঝে দাদু-বাবা-কাকাদের বাইরে রান্না করে খাওয়ানোর জন্য মায়েদের যাওয়ার দরকারও আছে। মায়েরা যদি বিষয়পুরে বসে থাকে তাহলে বাবারা খেতে পর্যন্ত পাবে না। আর তাঁরা তো বাড়ির জন্য-সন্তানদের জন্য সবসময় ভাবছেন, খবরাখবর রাখছেন, চাল-টাকাও পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এভাবেই চলছে বিষয়পুরের বহুরূপীদের সংসার। তবে এমন প্রতিকূল অবস্থায় লেখাপড়া সেভাবে এগোচ্ছে না বহুরূপীদের সন্তান-সন্ততিদের। বাণী আর খোকন অবশ্য সর্বদা স্বীকার করে দাদু আর মায়ের অবদান, তাঁরাই ওদের লেখাপড়া করানোর জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগই বাণী আর খোকনকে এগিয়ে দিয়েছে অনেকটা। তবে তারাও কষ্ট করেছে অনেক। সম্প্রতি খোকন একটি চাকুরিও পেয়েছে।

সুকুমার বহুরূপীর পূর্বপুরুষও জরিবুটি বিক্রী করতো, মাংস বিক্রী করতো, পাখি ধরতো, অলৌকিক বিশ্বাস করতো। কিন্তু বহুরূপীর কাজ করতো না। ভাস্তোরের ব্রজেশ্যাম-ই বিষয়পুরের ব্যাধপাড়ায় বহুরূপীর প্রচলন ঘটিয়েছে। তারাও আস্তে আস্তে পাখি ধরা-জরিবুটি বিক্রী করা পেশাটিকে বিসর্জন দিয়ে বহুরূপী পেশাটিকেই জীবন ও জীবিকার জন্য আঁকড়ে ধরতে থাকে। নিজেদের দারুণ অভাবের মধ্যে বন্যায় ভেসে আসা খড়কুটোর মতো তারা বহুরূপী পেশাটিকে গ্রহণ ক'রে মুখে রং মেখে পথে নেমেছে। বিষয়পুরের বহুরূপীরা অবশ্য তিন পুরুষের আগে সেভাবে বহুরূপী সাজেনি। এ গ্রামের আশুতোষ চৌধুরীই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসে ছিলেন বহুরূপী পেশাটিকে। তিনিই শিখেছিলেন

ভালোভাবে, তারপর শিখিয়েছেন অনেককেই। আশুতোষের ছেলেই হল **দিলীপ চৌধুরী ব্যাধ**। দিলীপ খুব বেশিদিন বাইরে থাকে না। সে বাড়ি থেকেই সকালে সেজে বের হয়, আবার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে।

দুঃখহরণ চৌধুরী



সুকুমার চৌধুরী + কল্যাণী চৌধুরী



বাণী
(ব্যাধ সমাজের প্রথম গ্রাজুয়েট,
সে এখন এম-এ পড়ছে)

খোকন
(ব্যাধ সমাজের অন্যতম গ্রাজুয়েট,
সম্প্রতি একটি চাকরি পেয়েছে খোকন)

বাণী অনেক কথা বলেছে, শুনিয়েছে তার অভিজ্ঞতার কথাও। —'দু'ভাই বোনে একা থাকি বিষয়পুরে, মা-বাবা বহুরূপী দেখিয়ে বেড়ান। তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি, কোনো সুযোগ-সুবিধা পাই না স্কুলে। হেড স্যার বললেন—'তোরা তো ট্রাইব্যাল, দরখাস্ত কর অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবি।' দরখাস্ত করলাম, ঠিকানা ভুল হয়ে গেল, চিঠি ঘুরে এল। আমরা কী জাতি তাই ঠিক হল না। বারবার চিঠি লিখি, দরখাস্ত করি, কেউ সাড়াশব্দ দেয় না। হতাশ হই, তথাপি থামি না। লাভপুরের পঞ্চায়েত সভাপতি প্রণব রায়কে সঙ্গে নিয়ে ২৫/৩০ জনের একটি দল বিষয়পুর থেকে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ গেছিলাম দল বেঁধে। ওরা বলল, 'কোন্ জাতি হ'তে চাও?' আমরা বললাম, 'ট্রাইব্যাল'। ওরা 'ও-বি-সি' ক'রে দিতে চাইলো, আমরা বললাম 'না-হবো না'। রেডিও শুনে চিঠি লিখলাম আবার। দরখাস্ত লিখে লিখে আঙুলে কড়া পড়ে গেল। দিল্লি-কলকাতা-লাভপুর-সিউড়ি কোথায় না চিঠি-দরখাস্ত লিখেছি। দিল্লি থেকে ইন্কোয়ারি হল। তারপর তারা আলোচনা করে দেখল। বহুজন এসে দেখে গেল আমরা 'ব্যাধ' জাতির বটি কিনা। অবশেষে সেটা প্রমাণ করা গেল। প্রমান হল 'ব্যাধ'। অরুণ চৌধুরীও খুব সহায়তা করলেন আমাদের। শেষমেশ প্রমাণিত হল বহুরূপী চৌধুরীরা আসলে 'ব্যাধ' প্রজাতির মানুষ। কিন্তু আবার অসুবিধা শুরু হলো। লোধা-শবর-নিষাদ-কোড়া-সাঁওতাল-বেদিয়া সব ট্রাইব্যালের তালিকায় থাকলেও 'ব্যাধ' বলে কিছু নেই। তখন সহায়তা করলেন মানসকমলবাবু। তিনিই প্রমাণ করলেন, 'ব্যাধেরা হল গিয়ে বেদিয়া সাব কাস্টের ট্রাইব্যাল গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। তারপর থেকেই আমরা 'ট্রাইব্যাল' বলে গণ্য হলাম। আমাদেরও 'চৌধুরী' পদবীর পাশে 'ব্যাধ' লিখতে হলো। এরপর থেকেই আমরা সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি। ব্যাধ সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা আছে সাঁওতালদের মতোই, তা কিন্তু আজও গণ্য বা গৃহীত হয়নি। তবে অনেক লড়াই-এর শেষে আমরা 'ট্রাইব্যাল' (S.T.)-এর স্বীকৃতি আদায় করেছি, এ আমাদের জয়। বিষয়পুরের ব্যাধ পাড়ায় তাতেই আনন্দের হাওয়া, জয়ের জলসা জ্বলছে। বাবা-মা উখরায় থাকে। ভাইবোনে উলেমিলে রান্নাবান্না ক'রে খেয়ে লাভপুরে কলেজ করেছি। তবে অনেক মাস্টারমশাই-ই বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। এবার সবাই 'সিডিউল ট্রাইব'-এর অনুদান পাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পাকা ব্যবস্থা। লতা যদি একটা অবলম্বন পায় তবে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। আমরাও অবলম্বন পেয়েছি এবার। অনেক মানুষ

এসেছেন আমাদের পক্ষে। নির্মল মণ্ডল বিনা পয়সায় টিউশনী পড়িয়েছেন আমাদের, পড়শী বিশ্বজিৎ পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আবার অনেকে এখনো ছোঁয় না, জলখেলে কল—জল দিয়ে ধুয়ে দিতে বলে, 'পাখমারা' বলে ঘেন্নাও করে, পাশ দিয়ে হাঁটলে নাকে রুমাল দেয়। এসব নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। আগের থেকে এখন অনেকটা সুখেও আছি। কারণ ওইরকম নিকৃষ্ট মনের মানুষের সংখ্যা অনেক কম, ভালো মানুষের সংখ্যাই এখনও বেশি।'

এই বাণী চৌধুরী ব্যাধ-ই বহুরূপী সমাজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। সে ২০০৫ সালে 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়' হতে বাংলা অনার্স সহ স্নাতক হয়েছে। আমোদপুর স্টেশনের এক অস্থায়ী আস্তানাতেও তার বহুদিন কেটেছে আর্থিক অনটনে আর সামাজিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই ক'রে। লাভপুরের 'শম্ভুনাথ কলেজে' সে এবং তার ভাই পড়তো। লাভপুরের এই কলেজ থেকেই সে স্নাতক হওয়ার গৌরব অর্জন করল। এখন তার স্বপ্ন বাংলায় এম-এ করার। তার ভাই খোকন জানিয়েছে—'বি-এ পাশ ক'রে আর মুখে রং মেখে বহুরূপী সাজতে পারবে না।' অথচ এই খোকন আর বাণীর বাবা সুকুমার চৌধুরী ব্যাধ-ই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 'লালশুকরা ওরাঁও স্মৃতি পুরস্কার ২০০৩ পেয়েছেন বহুরূপী দেখিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সই সম্বলিত ব্রোঞ্জপদক পেয়েছেন তিনি কলকাতার 'রবীন্দ্রসদনে' ২৪/০১/২০০৪ তারিখ। পদক প্রাপ্তির উত্তরে বিকেল ৫-৩০ মিনিটে সুকুমার বহুরূপী তার আনন্দ ও খুশির কথাও জানিয়েছিলেন সেদিন। তার শংসাপত্রে ছিল—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ



॥ **লালশুকরা ওরাওঁ স্মৃতি পুরস্কার** ॥

শ্রীসুকুমার চৌধুরী ব্যাধ

আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গীত-নৃত্য-নাটকের ক্ষেত্রে আপনার জীবনব্যাপী অনলস সাধনা ও অসামান্য অবদানের জন্য দেশবাসী গর্বিত। আপনার সেই অবদানের স্বীকৃতি-স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ প্রবর্তিত বরেণ্য সঙ্গীতকার ও শিল্পী লালশুকরা ওরাওঁ-এর নামাঙ্কিত এই পুরস্কার ২০০৩ সালের জন্য আপনাকে অর্পণ করা হ'ল।

মহাকরণ, কলকাতা — সই / বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

২৪ জানুয়ারী, ২০০৪ — মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ আদিবাসী সম্প্রদায়ের চারু-কারু শিল্প-সাহিত্য এবং অভিকরণ শিল্পের ক্ষেত্রে গুণীজনের সম্মাননা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে রাজ্যস্তরে তিনটি পুরস্কার প্রবর্তন করে। তারই একটি মূল্যবান পুরস্কার সুকুমার চৌধুরী ব্যাধ বহুরূপী দেখিয়ে পেয়েছেন ২০০৩ সালের প্রেক্ষিতে। পুরস্কার পাওয়ার সময় সুকুমার সম্পর্কে একটি বিবরণীতে সরকারি তরফেই লেখা হয়েছিল কিছু কথা, সেটি সেদিনের সভায় বিতরণও করা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—

সুকুমার চৌধুরী ব্যাধ :

১৯৬০ সালে বীরভূম জেলার লাভপুর থানার বিষয়পুর গ্রামে জন্ম। পিতা প্রয়াত দুঃখহরণ চৌধুরী ব্যাধ। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া। বহুরূপীর হাতেখড়ি বাবার কাছে। ছোটবেলা থেকে বাবার সঙ্গী হিসেবে গাঁয়ে গাঁয়ে বহুরূপী সেজে বেড়িয়েছেন। এটাই তাঁর পেশা। ঐ পেশায় বর্তমানে তিনি একজন দক্ষ শিল্পী হিসাবে বীরভূম-বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সুপরিচিত। বহুরূপী সাজার ক্ষেত্রে পৌরাণিক বিষয়বস্তুর সাথে সাথে সমকালীন বিষয়বস্তুকেও তিনি উপজীব্য করেছেন। শ্রী ব্যাধ 'বেদে' পর্যায়ভুক্ত নিষাদ গোষ্ঠীর সন্তান। ২০০৩ সালের জন্য লালশুকরা ওরাওঁ স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে সুকুমারের হাতে।

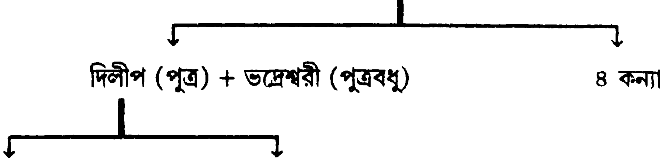
২৪. ০১. ২০০৫ তারিখের 'রবীন্দ্র সদনে' অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছিলেন রাজ্যের সংস্কৃতি-মনস্ক মুখ্যমন্ত্রী বুধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যটি ছিল আদিবাসীদের নিয়েই এবং তাদের উন্নতির লক্ষ্যেই নিবেদিত। মুখ্যমন্ত্রীর সেদিনের বক্তব্য ছিল পুরস্কৃত আদিবাসী শিল্পীদের জন্যই, যাদের মধ্যে সুকুমার বহুরূপীও একজন। কলকাতার দৈনিক 'গণশক্তি' পত্রিকার ২৫ জানুয়ারি ২০০৪ সংখ্যায় বুধদেব ভট্টাচার্যের সেই মূল্যবান বক্তব্যটি ছাপাও হয়েছিল। পত্রিকার পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছিল—

'মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যের অধিকাংশ আদিবাসী মানুষের বাস রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া এবং বীরভূম জেলায়। তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য 'পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ' গঠন করেছে রাজ্য সরকার। ঐতিহাসিক ও সামাজিক নানা কারণেই তাঁরা পিছিয়ে রয়েছেন। সমাজের মূল স্রোতে এঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত করাই রাজ্য সরকারের অন্যতম কর্মসূচী। ....

পুরস্কার বিতরণের এই অনুষ্ঠান প্রতীকী। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঝড় আমাদের শিকড় থেকেই উপড়ে ফেলতে চাইছে। তার মোকাবিলা করার জন্যই আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে এইসব স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতিতে, যে সংস্কৃতির জন্য আমরা গর্ব বোধ করি।'

বাণীর দাদু তথা সুকুমার চৌধুরী ব্যাধের বাবা দুঃখহরণ মারা গিয়েছিলেন ২০০২ সালে, তিনি সন্তানের এই গৌরবগাথা শুনে যেতে পারেননি। সুকুমার বহুরূপী বা আনন্দ বহুরূপীদের এখনও বিশ্বাস-দুর্গাপুজোয় গ্রামে তাদের প্রবেশাধিকার নেই, তাদের পুজো হ'ল ধরম। তখন আসতেই হবে। আসলে বহুরূপী দেখাতে বেরিয়ে দুর্গাপুজোর সময় আর ফেরা হয় না ঘরে। কারণ তখনই তো দু'পয়সা বেশি রোজগার হয়, দশমীর পরুবি পাওয়া যায়। সুকুমার চৌধুরী ব্যাধের বক্তব্যও এ ব্যাপারে বেশ স্পষ্ট—'শিকারের নৈপুণ্য দেখে কোনো রাজা-বাদশা তাঁদের পূর্বপুরুষকে গুজরাত থেকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। সে প্রায় সাত পুরুষ আগের কথা। তাঁরাও এসে বাংলায় বসবাস শুরু করেন, তারপর ক্রমে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে তাদের মেলামেশা শুরু হয়। কিন্তু সব মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়নি। গ্রামে পুজো-পার্বণে আমরা ছিলাম অচ্ছুত্। ধরম পুজোই আমাদের একমাত্র পুজো। এই পুজো উপলক্ষ্যেই আমরা নতুন জামা-কাপড় পরি। ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়, ঘরদোরও সাধ্যমতো সংস্কার করা হয় ধরমপুজো উপলক্ষ্যেই। নানান বঞ্চনার গানও গাওয়া হয় তখনই। মদও খাওয়া হয় প্রচুর।'

দিলীপ চৌধুরী ব্যাধ হলো বাণীর জামাইবাবু। দিলীপের স্ত্রী ভদ্রেশ্বরী বা ভাদু হল বাণীর মামাতো দিদি। আসলে এই ব্যাধ পরিবারের বিয়ে হতে হয় অনেকটা নিজেদেরই মধ্যে। খুব দূরে খুব বেশি মানুষও নেই তাদের জাতির।



বিশ্বজিৎ (সপ্তম মান পড়া) বিষ্ণুপ্রিয়া (অষ্টম মান পর্যন্ত পড়ার পরে বিয়ে হয়ে গেছে)

আশুতোষ চৌধুরীই ছিলেন বিষয়পুরের বহুরূপীর গুরু। তিনিই বহুজনকে শিক্ষা দিয়েছেন বহুরূপীর। তাঁর একমাত্র ছেলে দিলীপ এখন প্রতিষ্ঠিত বহুরূপী। সে জেলা থেকে পরিচয়পত্রও পেয়েছে। একটি ছোটো মাটির বাড়ি আছে তার। দেওয়ালে নানান শংসাপত্র টাঙানো, উঠোনে একফালি বাগান। তার স্ত্রী ভদ্রেশ্বরী বা ভাদু খুব পাখি ভালোবাসে, এটা বোধহয় তাদের রক্তে। ভাদুর একটি পোষমানানো টিয়াপাখি আছে। পাখিটি তার ঘাড়ে-মাথায়-হাতে স্বাধীনভাবেই থাকে সবসময়।

Government of West Bengal
Office of the P.O. Cum-D.W.O., B.C.W., Birbhum (Suri)

<u>To Whom it may concern.</u>

Sri/Smt Dilip Chowdhury (Byadh) S/o, D/o, W/o Late Asutosh Chowdhury (Byadh) of village Bishoypur, P.O.-Bhalkuti under Lavpur Development Block in the district of Birbhum is a traditional 'BOHURUPI' (a folk art). He/She deserves all sorts of help and co-operation from common people to promote, flourish the art in the society.

Sd/-
Tapan Kumar Kisku
Dy. Magistrate & Dy. Collector
Birbhum & P.O. Com. D.W.O., B.C.W.
Birbhum (Suri)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে বিষয়পুরের বহুরূপীদের জীবন। ভিক্ষের চালমুড়ির উপরেই তাদের ভরসা। ঠিক মতো পোশাক নেই। যা আছে তা সব পুরনো, ছেঁড়া। কিনবার পয়সা নেই। সরকার যদি পোশাক কেনার ক্ষেত্রে খানিকটা হলেও সাহায্য করতেন বা 'লোন' পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন, তাহলে বিষয়পুরের বহুরূপী পাড়ায় প্রাণের জোয়ার আসতো। তবে দিলীপ স্বীকার করে 'ছেলেমেয়ের বই-এর

জন্য আর অসুবিধা হয় না। বহুরূপীদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলে অনেকেই বই সাহায্য করেন। কিন্তু ঠিক মতো খাবারেরই সংস্থান নেই যাদের, তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবে কীভাবে? তাই ছোটো ছোটো বাচ্চারা স্কুলে না গিয়ে মুখে রং মেখে বহুরূপী সেজে ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ শিশু শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। এই তো বিষয়পুরের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাগ্যবিধান।'

গোপালপুর ছোটো লাইনের (ন্যারো গেজ) একটি ততোধিক ছোটো স্টেশন। আমোদপুর-কাটোয়া ন্যারোগেজ রেলপথে এই হল্ট স্টেশন। এখানেই বিস্তৃত গাছ-গাছালি ঘেরা ডাঙায় ভেস্টের জায়গা পেয়েছে বিষয়পুরের বহুরূপীরা। রাজ্যসরকারের টাকায় বাড়িও বানিয়ে দেওয়া হবে তাদের। কিন্তু তারা কেউই যেতে চাইছে না সেখানে। ব্যাধ-বহুরূপীদের বক্তব্য—'আমরা ছাড়াছাড়ি ক'রে বাঁচতে পারি না। আমরা যৌথভাবে বাঁচি। সরকার আমাদের বিষয়পুরেই ব্যবস্থা করে দিক।' এমনটাই দেখেছি বীরভূম-ঝাড়খণ্ডের সীমান্তে ময়ূরাক্ষী নদীর উপকণ্ঠে কেঁদুলির ডাঙায়। সেই ডাঙায় ইংরেজদের সঙ্গে অসম লড়াই-এ বহু সাঁওতালের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর থেকে ডাঙাটি 'সাঁওতাল কাটার ডাঙা' নামেও পরিচিতি পেয়েছে। এই ডাঙার কোলে সাঁওতাল আদিবাসীদের বসবাসের জন্য বাড়ি বানিয়ে দিলেও কোনো আদিবাসী সেখানে বাস করতে আসেনি। বাড়িগুলির দরজা-জানলা সব ভেঙে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। আসলে আদিবাসীদের রক্তের মধ্যেই আছে যূথবদ্ধতা, মিলনের মহান সঙ্গীত। তাই শিকার-উৎসব বা গণভোজের মতো পরব পালিত হয় তাদেরই সমাজে। যদিও এখন তাদের মধ্যেও পাওনাগণ্ডার বিষয় নিয়ে বহুক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। বিষয়পুরের বহুরূপীরা এই বিষয়টিতে দু'একবার লাভপুরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ পর্যন্ত এগিয়েছেন।

'উপরতলার জনপ্রতিনিধিরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেন, কিন্তু নীচু তলার নেতারা—পার্টির লোকেরা আমাদের কোনো সুযোগ দেয় না। কোনো কোনো মাস্টার মশাই বলতেন—'ব্যাধের ছেলে, পাখ্‌মারাদের ছেলে শিক্ষিত হবে'? আবার অনেক মাস্টার মশাই আদর ক'রে বিনিপয়সায় পড়াতেন, বই দিতেন। পায়ে চটি প'রে গাঁয়ের রাস্তায় হাঁটলেও ঠাট্টা করতেন অনেকে।' হাতে বালা, গলায় হার, ভালো জামা-প্যান্ট জুতো পরতে ভালোবাসতো **রাজেন্দ্র চৌধুরী ব্যাধ**। সেইসব পরেই সে স্কুলে যেতো। তা নাকি সহ্য হত না ভালকুঠির হাইস্কুলের শিক্ষক ধনঞ্জয় দাসের। সেসব কথা মনে পড়ছিল সব রাজেন্দ্রর। গল্প করতে করতেই সে আরও বলেছিল—'একদিন অফিস ঘরে অন্য স্যারদের তিনি বলছিলেন—ব্যাধের ছেলে শিক্ষিত হবে এবার, আর তো মানবে না আমাদের।' এইসব শুনে পড়াটা ছেড়েই দিল রাজেন্দ্র। সে এখন বহুরূপী সাজে। ডাকাত-কালী-কৃষ্ণ-মহীরাবণ-হঠাৎবাবু কত কী।

২৩ ঘর বহুরূপী ব্যাধ ছিল বিষয়পুরে। এখন ভাগ হয়ে বেড়েছে একটু। মুর্শিদাবাদের ভাস্তোর গ্রাম থেকে **ব্রজেশ্বর রায়** (মতান্তরে—ব্রজশ্যাম)-এর কাছে বহুরূপী বিদ্যাটি শিক্ষা ক'রে এসে দিলীপের বাবা আশুতোষ চৌধুরীই সম্ভবত বিষয়পুরে নিয়ে আসেন বহুরূপী শিল্পটিকে। তারপর ব্যাধপাড়ায় এই লোকশিল্পটি গৃহীত হয় পেশা হিসেবে। সে হিসেবে তিন পুরুষের বেশি নয় বীরভূমে বহুরূপীর বয়স। ১৯৯৭ সালে ৬৫ বছর বয়সে আশুতোষ

চৌধুরী বিষয়পুর গ্রামেই মারা যান। দিলীপ একাই তাঁর ছেলে, বাকী চার বোন দিলীপের। দিলীপ বাবার কাছেই বহুরূপীর শিক্ষা নিয়েছে। চার বোনেরই বিয়ে হয়েছে বিষয়পুরেই। ভগ্নিপতিরাও সবাই বহুরূপী সাজে। তাদেরও শিক্ষা গুরু আশুতোষ চৌধুরীই। বহুরূপী শৈলেন ব্যাধ-ও একজন ভগ্নিপতি, সেও বেশ জনপ্রিয়। দিলীপের মা ছায়া ব্যাধ (৬৪) এখনও বেঁচে। পাড়াতেই একটি ছিটেবেড়ার ঘরে একাই থাকে, ভিক্ষে করে খায়। ছেলে-জামাইরাও মাঝে মাঝে কিছু দেয়। ১০০-র বেশি এখন জনসংখ্যা পাখমারা পাড়ার, যার মধ্যে ৩০/৩২ জনই সাজে বহুরূপী। এইই তাদের পেশা এবং একমাত্র জীবিকা।

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ মহকুমার মিঠিপুর থেকে বিষয়পুরে এসেছিলেন **গোপেন চৌধুরী**, তিনি বহুরূপী সাজতেন। তবে গোপেন চৌধুরীর ছেলে জান্টু চৌধুরী কোনোদিনই বহুরূপী সাজেনি। তিনি বিষয়পুর ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছেন বর্ধমান শহরে। সেখানে জান্টু চৌধুরী জড়িবুটির ওষুধ বিক্রী ক'রে সংসার চালায়। আগে পাখি ধরতো। এখন পাখি ধরা নিষিদ্ধ হওয়ায় অনেকটাই অসুবিধা হচ্ছে। নীলকণ্ঠ পাখি বা ট্যাস্‌কোনা পাখিও কমে এসেছে অনেক। ধনেশ পাখি বেঁধে রাখাও যাচ্ছে না। এইভাবেই তথাপি চলছে সংসার। গোপেন চৌধুরী মারা গেছেন বহুদিন, বাবা জান্টু চৌধুরীও বর্ধমানে। কিন্তু জান্টু চৌধুরীর ছেলে প্রশান্ত রয়ে গেছেন বিষয়পুরেই। **প্রশান্ত চৌধুরীর** বয়স এখন তিরিশের কাছে, তিনি নিজে একজন সুখ্যাত বহুরূপী। তার বহুরূপীর গুরু হলেন আশুতোষ চৌধুরী, দিলীপের বাবা। বর্ষায় প্রশান্ত চাষবাস করে। আবার ২০ বছর ধরে বহুরূপীও দেখাচ্ছে সে! কলকাতার মধুসূদন মঞ্চ, সিউড়ি, লাভপুর প্রভৃতি জায়গায় বহুরূপী দেখিয়ে এসেছে প্রশান্ত। সে সাজে হনুমান, রাম, মহীরাবণ, হঠাৎবাবু, পাগল, কৃষ্ণ, ব্যাধ, তারকা রাক্ষসী প্রভৃতি।

গোপেন চৌধুরী (মিঠিপুর থেকে এসেছিলেন বিষয়পুরে)

↓

জান্টু চৌধুরী (বহুরূপী সাজে না। বর্ধমান শহরে জরিবুটি বিক্রী করে)

↓

প্রশান্ত চৌধুরী ব্যাধ (২৯) বিষয়পুরের খ্যাতিমান বহুরূপী।

প্রশান্ত হনুমান সেজে লাফ ঝাঁপ দিতে দিতে অভিনয়ের মাধ্যমে সংলাপ বলে যায়—

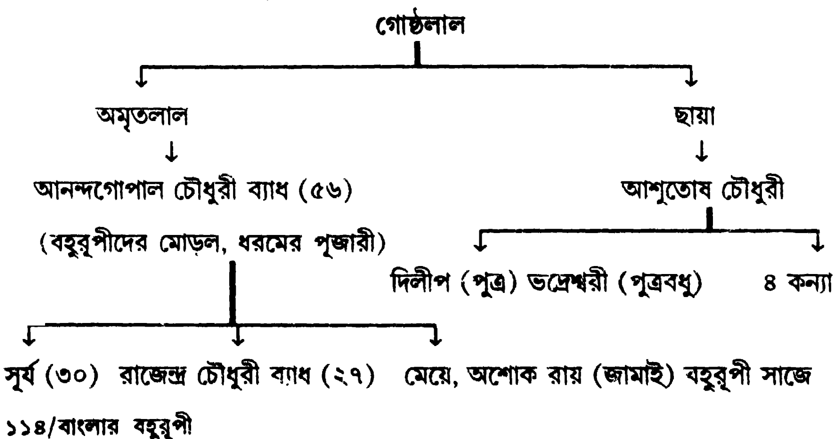
'রামচন্দ্রের ভক্ত হনুমান এসেছি। সীতাকে খুঁজতে যাবো লঙ্কায়।
পুড়িয়ে ছাই করতে হবে তো লঙ্কা। তার জন্য পাঁচ-দশ টাকা দিন।'

সেন্টু চৌধুরী (৪৯)-র বাড়ি খুজুটিপাড়ায় (বীরভূম)। বিষয়পুরের বহুরূপীদের মেয়েকে বিয়ে করে সে বিষয়পুরেই থেকে গেছে, তাদের পদবীও গ্রহণ করেছে। সেন্টু বলেছিল—'আগে বহুরূপী দেখিয়ে রোজগার ভালই হতো, এখন কোনোরকমে খেয়ে পরে দিন চলে যায় মাত্র। তাই ভরসা পাই না ছেলেকে এপথে নিয়ে আসতে। ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। যদি পড়াটা করতে পারে তো করুক।' সেন্টুও বিষয়পুরের জনপ্রিয় বহুরূপী। সে রাম সেজে অভিনয় করার সঙ্গে বক্তব্য বলে—

'সীতা সীতা, কোথায় আমার সীতা। আমি কি এখন আর সীতার সন্ধান পাবো না! ভাই লক্ষ্মণ, কেন সীতাকে ছেড়ে এসেছো? বনের তরুলতা বলো বলো, আমার সীতা কোথায়? বুঝেছি, রাবণ মোর সীতাকে করেছে হরণ। যাবো সাগরের পারে জানকী উদ্ধারের তরে। পথ-খরচ হিসেবে আপনারা পাঁচ-দশ টাকা আমার হাতে দিন।'

সেন্টু চৌধুবা ব্যাধ রাম ছাড়াও লক্ষ্মণ, হঠাৎবাবু, নারদমুনি, নর-রাক্ষস, পুত্না রাক্ষসী, এসব সাজে। তিনি বহুরূপীর শিক্ষা নিয়েছেন শ্বশুর নিমাই চৌধুরীর কাছে। সেন্টু বহুরূপী দেখিয়ে এসেছেন কলকাতা-গৌহাটি-আমেদাবাদেও। মধুসূদন মঞ্চের আমন্ত্রণে কলকাতায় বহুরূপীর খেলা দেখিয়ে এসেছেন। তথ্যদপ্তর থেকে নির্বাচিত বিষয়পুরের ১৪ জন—সুকুমার, দিলীপ, সহদেব, বিবেক, হীরু, কাজল, লালু, রাজেন্দ্র, আনন্দ, সনাতন, রাম, কার্তিক, নাড়ুগোপাল এবং উত্তম। এসবই বহুরূপী লোকনাট্যের অগ্রগতির কথা, জগৎ জয়ের কথা। সেই জয়েরই আনন্দে হীরু, হীরু বাগ্দি বিদ্যাধরী (বীরভূম) থেকে বিষয়পুরে এসে, বিষয়পুরের বহুরূপীদের মেয়েকে বিয়ে ক'রে বিষয়পুরেই থেকে গেছে এবং নিয়মিত বহুরূপী দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। সেও গ্রহণ করেছে স্ত্রীর পদবী। হয়েছে **হীরু চৌধুরী ব্যাধ** (৩০)।

বহুরূপীদের গ্রাম বীরভূমের এই বিষয়পুরে তিন পুরুষ ধরে বহুরূপী সেজে জীবিকা নির্বাহ ক'রে আসছেন অনেকেই। তবে উর্ধ্বতন চারপুরুষের ক্ষেত্রে এই পাখমারা সম্প্রদায়ের বহুরূপী সাজার তেমন স্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে না। কবে, কখন বিষয়পুরে এসে পাখমারা সম্প্রদায়ের মানুষজন স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে, সে কথা কেউ জানে না। বর্তমান বহুরূপীদের **মোড়ল আনন্দ চৌধুরী ব্যাধ** ১২২ বছরের ইতিহাস জানে ব'লে দাবী করেছে। তার বয়স এখন ছাপান্ন। আনন্দ চৌধুরী (৫৬) দর্শকদের চাহিদা অনুসারেই বহুরূপী সাজেন। রাম-রাবণ-মহীরাবণ-ভদ্রা-দুর্গা-শিব-কালী-কৃষ্ণ-পাগল-খুনি-হরিশ্চন্দ্র-দস্যু-রত্নাকর-লাদেন সবই সাজেন আনন্দ। দেখে শুনেও সাজেন, আবার বইপত্র পড়ে ছবি দেখেও সাজেন তিনি। তাঁর মতে—'বিষয়পুরে বহুরূপীটা এনেছিলেন নবাবী আমলে ব্রজেশ্বর রায়। সিউড়ির কেন্দুয়াব অধর মাস্টার ছিলেন মাধ্যমিক পাশ, আমাদের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করে এখানেই চলে আসেন। এই অধব মাস্টার বহুরূপী শিখেছিলেন ব্রজেশ্বর রায়ের কাছে। তখন তাদের পদবী ছিল 'পাল'। ১২২ বছর আগের রেকর্ড-এও 'পাল' পদবীই আছে।' আনন্দ অবশ্য বহুরূপীর কলা-কৌশল শিখেছে পিসতুতো দাদা আশুতোষ চৌধুরীর কাছে।



বহু আগে আনন্দর পূর্বপুরুষেরা ধনেশ পাখি নিয়ে তেল-জড়িবুটি বিক্রী ক'রে সংসার চালাতো, এখন শুধু বহুরূপী দেখিয়েই সংসার চলে। বিষয়পুরের বহুরূপীদের মোড়ল আগে তাদের নিজস্ব ধরমের পুজো করতো, এখন ভিন্‌গা থেকে ব্রাহ্মণ এনে ধরমের পুজো করানো হয়। নারায়ণঘাটির (বীরভূম) অবনী ভট্টাচার্য, হাতিয়ার (বীরভূম) ধনঞ্জয় চক্রবর্তী, ইন্দিরার (বীরভূম) বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বিষয়পুরে এসে পাখমারাদের ধরমের পুজো করে গিয়েছেন। এই ধরমে 'ফুলখেলা' এবং 'পাঁঠাবলি' হয়। বলির মাংস-প্রসাদ ব্যাধ পাড়ায় সবার বাড়ি বাড়ি বিতরণ করা হয়। আনন্দর শ্বশুর বাড়ি পানাগড়ে। সেখানেও কয়েকঘর পাখমারাদের বাস থাকলেও তারা আর কেউ বহুরূপী সাজে না, অন্যসব কাজকর্ম করে।

বিষয়পুরের পাখমারা পাড়ার 'ব্যাধ' শ্রেণির বহুরূপীদের বাদ দিলে আরও দু'চার ঘর সদ্‌গোপ-কৈবর্ত-বৈরাগ্য শ্রেণির মানুষজন আছেন, যারা সময় সুযোগে একটু বেশি রোজগারের আশায় বহুরূপী সাজেন। মুর্শিদাবাদের মিঠিপুর, সিঙার, নবগ্রাম বা বীরভূমের ইলামবাজার, দেবীপুর গ্রামে বিষয়পুরের বহুরূপী ব্যাধেদের আত্মীয়-স্বজন থাকলেও, তারা আর বহুরূপী সাজতে আগ্রহ বোধ করে না। তাদের অনেকেই 'চৌধুরী' বা 'রায়' পদবী ব্যবহার করলেও নিজেদেরকে আর 'ব্যাধ' বা 'বেদ' হিসেবে বেদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বলেও গণ্য করতে চান না। এখন তারা মূলস্রোতের সঙ্গে প্রায় সবটাই মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছেন। কুলিয়ার সুবলদাস বৈরাগ্য তো ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব থেকে বহুরূপী দেখিয়ে বিদেশ পর্যন্ত ঘুরে এলেন। আসলে অভাব থেকেই এই পেশা গ্রহণ বলেই মনে হয়।

বিষয়পুরের প্রবীন বহুরূপী বিজয় মণ্ডল সদ্‌গোপ বংশের মানুষ, একদিন অভাবের কারণেই বহুরূপী পোশাক পরেছিলেন—রং মেখেছিলেন মুখে। 'কিন্তু তাতেই বা কী হলো? সবার কাছেই 'ভিক্ষুক' সেজে গেলাম।' বিজয় মণ্ডলের ছোটো ছেলে বহুরূপী সেজে ভিক্ষে করতে রাজী নয়, তাই সে নেমে পড়েছে চাষের কাজে। তবে বড়ো ছেলে উত্তম মণ্ডল বহুরূপী পেশাটিকে ভালোবেসেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এভাবেই অভাবের মধ্যদিয়ে দিন চলে যাচ্ছে সুখে-দুঃখে। বিজয় মণ্ডলের শেষ উপলব্ধি—'তবে বহুরূপী সেজে আর সুখ নেই! টিভি-ভিসিডি সব চলে এসেছে বাজারে। কদর কমেছে বহুরূপীর। তেমন আগ্রহ নিয়ে কেউ আর বহুরূপী দেখতে চান না। অবহেলায় আট আনা-একটাকা দেয় মাত্র'।

বিষয়পুরের ব্যাধেদের পাখমারা পাড়ায় সবাই যে হতাশায় ভুগ্‌ছে এমন নয়। বহুজনই লোকনাট্যের এই শাখাটিকে অবলম্বন ক'রেই সুখে আছে, স্বচ্ছন্দে আছে। তারা অন্য পেশায় যেতেও চায় না। সারা বাংলার মধ্যে বীরভূম জেলার এই গ্রামটিতেই যে সমস্ত ব্যাধ-বহুরূপীরা বসবাস করেন, তারাই এখন উঠে পড়ে লেগেছেন কিভাবে এই সংস্কৃতির উন্নতি করা যায় তার চেষ্টায়। হুগলি-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদেও কেউ কেউ আছেন, তথাপি এমন যূথবদ্ধতায় ৩২ থেকে ৪২ জন মানুষ কোথাও-ই একসঙ্গে বহুরূপী সাজে না। তারা একসঙ্গে সকালে বেরিয়ে আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসে বাড়িতে, আবার অনেকেই চলে যায় মাস-দু'মাসের জন্য বাইরে-দূরে। কিন্তু পেশা সেই বহুরূপী। জীবিকার জন্য, জীবনের জন্য বহুরূপী দেখানোই তাদের একমাত্র পেশা। বেঁচে থাকার অনন্য রসদ।

সুবলদাস বৈরাগ্য (৬২) :

তখনও সুবল দাস বহুরূপী হন্‌নি। জীবনের নানান ঘাটে-আঘাটে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে যাত্রাপালার স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেন। রাত প্রতি আট টাকা মাইনে। যেদিন যাত্রা হবে এবং সুবল 'ফিমেল রোল' করবেন, সেদিনের জন্য পাবেন আট টাকা। যাত্রাও প্রতিদিন তো হয় না। চরম অভাব। বোলপুরের 'মহামায়া নাট্য সংঘে' কাজ করেছেন সুবল। তখনও তার গ্রাম কুলিয়াতে বহুরূপীরা আসতো। ওই লাভপুর থানার বিষয়পুর থেকেই। বহুরূপী ওদের বংশগত পেশা। 'চৌধুরী' টাইটেল লেখে, কিন্তু ওরা ব্যাধ। পাখমারা। যেমন ওখানের সুকুমার চৌধুরী। ওর বাবাও বহুরূপী ছিল। কিন্তু সুকুমার তার ছেলেমেয়েকে আর বহুরূপী হতে দেয়নি, লেখাপড়া করিয়েছে। কথা হচ্ছিল ৬২ বছর বয়সের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহুরূপী সুবল দাস বৈরাগ্যের সঙ্গে।

সুবল বৈষ্ণবের ছেলে নয়। ব্রাহ্মণ, খাঁটি ব্রাহ্মণ। 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বংশে জন্ম সুবলের। কিন্তু বাল্যবেলাতেই ভাগ্যের চরম পরিহাসে ঘরবাড়ি ছাড়া। সে এক অন্য আলেখ্য। অজ্ঞান অবস্থাতেই বাবা চলে যান। মায়ের সঙ্গে বোলপুরে থাকতেন সুবল। সেখানেই তার বড় অসুখ করে। বোলপুরের বাবুলাল পাসি নামের এক ব্যবসায়ীর কাছে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেন বাল্যবেলায় সুবল। মা-ও তাকে ফেলে কলকাতায় চলে যান একটি বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়ে। সেখানেও অত্যাচারিতা হন তিনি। তারপর আবার চলে আসেন বোলপুরে। সুবল ফিরে পায় মাকে। মা নিজেও এবার ঠিক ক'রে নিয়েছেন 'আর লোকের বাড়ির কাজ নয়, বৈরাগীর ভেখ্ নেবেন আর ভিক্ষে ক'রে খাবেন।' 'এই সময়ে আমরা বোলপুরের কাছেই সিঙ্গি গ্রামে যাই, সেখানেই আলাপ হয় রাধারমন বৈরাগ্যের সঙ্গে। সিঙ্গি রাধারমন বাবাজীর শ্বশুরবাড়ি। সেখানে আমার মা কান্নাকাটি করায় রাধারমন বৈরাগ্য বললেন— 'আমার সঙ্গে চলে এসো। তোমার ছেলেকে নিয়ে আমার আশ্রমে থাকবে।' এই কুলিয়া সেই তাঁরই আশ্রম। এটাই আমার সব। তিনিই আমার বাবা, পালিত বাবা।'

বাবা মারা যাবার পর অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সুবল ব্যানার্জীর মা বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন। ভেখ্ নেওয়ার পর মাত্র ন'বছরের সুবলকে নিয়ে এসে উঠেছিলেন তিনি রাধারমণ বৈরাগ্যের কুলিয়ার আশ্রমে। সেই থেকেই সুবল হ'য়ে উঠেছেন রাধারমণের পোষ্যপুত্র। পরিচিতিও হয়েছে সেই সূত্রেই। তিনিই বাবা। নামও বদলে গেছে তখন থেকেই। হয়েছে সুবল দাস বৈরাগ্য।

যাত্রাজগতের প্রতিই সুবলের প্রথম প্রেম। বোলপুরের 'মহামায়া নাট্য সংঘ' ছাড়াও 'শ্রীদুর্গা অপেরা' এবং কলকাতার 'রয়েল বীণাপানি' যাত্রাদলে মহিলার অভিনয় করেছেন সুবল। গ্রামের নানান যাত্রাপালাতেও অংশ নিয়েছে সে। যাত্রাতেই তখন তার বিশেষ ঝোঁক। বয়স সবে পঁচিশ-ছাব্বিশ। যাত্রায় 'ফিমেল রোল' করা ছাড়া অন্য কাজে তেমন মন বসে না। এই সময়ই বিয়ে হল সুবলের। হিন্দু মতে সুদেবীর সঙ্গে। মা দয়াময়ীও মারা গেলেন। আর উপায় থাকলো না। সংসারী হতেই হল।

যাত্রাপালায় বিভিন্ন রূপের সাজসজ্জা ক'রে আর বিষয়পুরের বহুরূপীদের দেখেই জীবিকা নির্বাহের জন্য 'বহুরূপী'কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভেবেছেন সুবল। নানান সাজ

সেজে গ্রাম-শহরে ছেলেমেয়েদের একটু আনন্দ দেওয়া আরকী। 'তবে যে দশ অবতার বহুরূপীর মধ্যে আছে, সে বহুরূপী হবার ক্ষমতা আমার নেই। কারোর নেই।' এমন কথা সুবল বলেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বারাসতের বহুরূপী ছিনাথ এবং মেজদা'র গল্প পড়েই তার মনের মধ্যে বহুরূপী সাজার বাসনা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। 'মনে হয় আমিও পারবো।'

এমন ভাববার কালেই গ্রামে বহুরূপী দেখাতে এসেছিলেন একজন। তাঁর বাড়ি বীরভূম জেলার নানুর থানার চারকলগ্রামে। নাম **কানাই চক্রবর্তী**। তিনি ছিলেন ছিনাথ বহুরূপীর ছাত্রের ছাত্র। বহুরূপী দেখানোর সময় তাঁকে কুকুরে কামড়ে দেয়। সেই অসহায়তার কালে সুবল তাঁর যথেষ্ট সেবাযত্ন করেন। সুস্থ হ'য়ে ওঠার পর সেই বহুরূপী কানাই চক্রবর্তী বলেছিলেন—'সুবল তুমি বহুরূপী শিখবে? আমি তোমাকে বহুরূপী শিখিয়ে দেবো।' মনে তখন একটা আকাঙ্ক্ষা ছিলই, তার উপর এই আহ্বান। সন্ধান মিলে গেল জীবিকার। সেই থেকেই বহুরূপী সেজে আসছে সুবলদাস বৈরাগ্য। সেই অর্থে বহুরূপীর গুরু তার চারকলগ্রামের কানাই চক্রবর্তী। যাত্রাপালায় কুমারী-বধূ-বিধবা সব সাজার অভিজ্ঞতাই ছিল সুবলের, সেসব কাজে লাগলো বহুরূপীতে এসে। 'হরগৌরী' এবং 'অর্ধনারীশ্বর' তাই সুবলের শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ। বিষয়পুরের বহুরূপীরা এগুলি কম করে। ওরা রঘু ডাকাত, রাক্ষসী, মহীরাবণ, কালী, খুনে, রামচন্দ্র, বাঘ, সিংহ এসবই বেশি সাজে। বীরভূম ছাড়াও হুগলির তারকেশ্বরে, মুর্শিদাবাদের দু'একটি জায়গায় এবং বর্ধমানেও বহুরূপী দেখেছে সুবল। তবে বীরভূম থেকেই তারা ছড়িয়ে গিয়েছে বেশি। ডেরা বেঁধেছে বিভিন্ন অঞ্চলে।

শুধু ভয় আর আনন্দ দেবার জন্য নয়, শিক্ষামূলক ক্ষেত্রেও বহুরূপীকে ব্যবহার করার কথা ভেবেছেন সুবলদাস বৈরাগ্য। তাই গুরুদেবের কাছে শিক্ষা নিয়ে এবং নিজেও অনেক ভেবেচিন্তে সাক্ষরতা প্রকল্প, নারীদিবস, পরিবার পরিকল্পনা এসব বিষয়কে বহুরূপীর আঙ্গীকে ধ'রে রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন সুবল দাস। পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সাথী বৈঁচির **নিত্যানন্দ মহান্তের** সঙ্গে। তিনিই সুবলের সহকারী, শিষ্য। সুবলের চেয়ে ৪/৫ বছরের ছোট নিত্যানন্দই এখন সুবলের জুটি। তারা দু'জনেই জোট বেঁধেছেন বহুরূপীর।

আসলে আগে পুরোটাই একক শিল্প ছিল বহুরূপী। এই চরিত্র চিত্রায়নের ভেতর অনেকটাই আছে নাটক। মঞ্চেও এখন ডাক পাচ্ছেন বহুরূপীরা। সেকারণেই দল বেঁধেও বহুরূপী দেখানোর প্রয়োজন হ'য়ে পড়ছে। স্বাক্ষর-স্ত্রী আর নিরক্ষর-স্বামী, শহুরে-মেয়ে আর গ্রামের-মেয়ে, অত্যাচারী- পুরুষ আর অত্যাচারিতা-নারী, এমন সব বিষয়-ভাবনা বহুরূপীর মধ্য দিয়ে পরিবেশন করে চলেছে সুবল আর নিত্যানন্দ। নারীদিবস উদ্‌যাপন করতে গিয়ে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম গ্রাম দেবানন্দপুরে এমন সব সাজের বহুরূপী দেখিয়ে এসেছেন সুবল। এছাড়াও মেয়েদের শিক্ষা, কন্যার সামাজিক অধিকার এমন সব রূপসজ্জা ক'রে থাকেন তিনি। একা একা এখন বহুরূপী দেখাতে অসুবিধা হয়, ৩/৪ জনের দল হলে ভালো হয় শিল্পকলাটি দেখাতে। আবার একই 'মেক-আপ' একই 'সাজ-গোজ' দেখতেও সবসময় ভালো লাগে না মানুষজনের। তবে গ্রামে গ্রামে দেখানোর সময় কারো বৈঠকখানায়-ক্লাবে বা স্কুলের বারান্দায় ডেরা নিয়ে সেখান থেকে একেবারে সাজগোজ করেই বেরোতে পারা যায়। একগ্রামে ৭/১০ দিনের বেশি দেখানোর প্রয়োজন হয় না।

তবে মাস দু'মাস বাড়ি ফেরা হয় না। এখন কলকাতা বা শহরতলিতে পুজোর সময় বহুরূপী নিয়ে যাচ্ছে অনেকে। সুবলদাসও গেছেন ক'বার। গেছেন ভবানীপুর থানা এলাকার বকুলবাগান পুজো মণ্ডপে।

সুবলদাস বৈরাগ্য বহুরূপী পেশায় বেশ খুশি। তিনিই একমাত্র বহুরূপী দেখানোর জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশে আমন্ত্রিত হ'য়ে শিল্পটি দেখিয়ে এসেছেন। আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর বক্তব্য—'আমি প্রচুর সম্মান পেয়েছি বহুরূপী সেজে। অসম্মানের কিছু পাইনি। আমি কয়েক বারই বিদেশে গিয়েছি। ১৯৮৫ সালের 'ভারত উৎসবে' ওয়াশিংটনে গিয়ে দু'মাস ছিলাম। ১৯৯১ সালে আই-সি-সি-আর-এর মাধ্যমে জার্মান ও রাশিয়া গিয়েছি। ১৯৮৯-এ রুবি পালচৌধুরীব নেতৃত্বে লন্ডনের গ্লাস্‌গো মেলায় দশদিন কাটিয়ে এসেছি। তাসখন্দ, বার্লিন গিয়েছি তারিক সুলতানের উদ্যোগে। ভারতের দিল্লি-কলকাতা-দার্জিলিং-হ্যামিলটনগঞ্জ-রাণাঘাট-সিউড়ি সর্বত্র বহুরূপী দেখিয়ে এসেছি। তবে প্রথমবার বিদেশ যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম খড়দহের প্রবীর গুহের উদ্যোগে। তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগেও পরিচিতি পাচ্ছি অনেক। তবে বয়সের ভারে আর তেমন লাফঝাঁপ করতে পারি না। কিন্তু পরিকল্পনা আমাকে ছেড়ে যায় না। বহুরূপীর উন্নতির জন্য আমি নানান পরিকল্পনা করি। এখন রবি ঠাকুরের বিষয় নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু করেছি।'

সারা ভারতবর্ষেই বহুরূপী দেখা যায়। বিদেশেও নানান উৎসবে বিভিন্ন সাজের প্রথা রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ এবং হুগলি জেলাতেই বহুরূপীর প্রচলন বেশি। গাজনের সঙ-ও এক ধরনের বহুরূপী। তবে ওটা কিন্তু জীবিকা নয়, সারা বছরের পেশাও নয়। সময়ে অসময়ে কিছু বেশি রোজগার মাত্র। যারা শিব সাজে, তারাই আবার অন্যান্য কাজ করে। সুবলদাস জানেন, কুলিয়ার তিনি এবং বিষয়পুরের ব্যাধেরা ভিন্ন বীরভূমে আর বহুরূপী নেই। বৃত্তিনাম থেকেই বিচিত্র রূপের কথা, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা, নাট্যপ্রয়োগের কথা, লোকশিক্ষকের কথা প্রকাশিত হয়। বহুরূপীর সাজসজ্জা পোশাক, সংক্ষিপ্ত অভিনয় এবং সংলাপ-ক্ষেপন আনন্দ ও শিক্ষার উপকরণ বয়েও আনে বৈকি। জীবিকার পেশা হিসেবে বহুরূপী খুব উন্নত না হলেও বহুরূপ ধারণের এই নেশা বঙ্গসংস্কৃতির লোকায়ত আঙনটিকে পরিপুষ্ট করেছে অনায়াসেই। বহুরূপী প্রদর্শন একক বা যৌথভাবে শিক্ষা ও আনন্দের চমকপ্রদ সংমিশ্রণ হিসেবেই পরিচিত হতে পারে। তথাপি বহুরূপী ভিক্ষুকের চেয়ে খুব বেশি মূল্য পায়নি আজও। সে কারণেই বহুরূপীদের উত্তরপ্রজন্ম আর বহুরূপী সেজে ভিক্ষে করতে রাজী নয়, তারা জগতের বৃহৎ কর্মযজ্ঞশালায় অন্যত্র অন্য কোনোখানে কাজে নিযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সুবলের ছেলে ধনেশ্বর দাস বৈরাগ্যও (৩৩) বহুরূপী সাজে না, ওষুধের ছোটো ব্যবসা করে।

সুবল দাসের বর্তমান অবস্থানের গ্রাম কুলিয়ারা (কুলেরা)। লোকে বলে কুলিয়া > কুলে। পঞ্চায়েত ও ডাকঘর বঙ্গছত্র, থানা নানুর। তবে বোলপুর থেকে বাসে সহজেই যাওয়া যায়। হাটসেরান্দি, বঙ্গছত্র বা ব্যাঙচাতরা পেরিয়ে কুলিয়া-তালতলা। সুবলদাসের জন্ম ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে। তিনি এখন জাতিতে বৈষ্ণব। তাই বৈষ্ণবের নিয়ম মতো সারা

কার্তিক মাস জুড়ে তিনি কীর্তনের টহল দেন। ভোরবেলা গিয়ে ঠাকুরের, রাধাকৃষ্ণের নাম গান করেন। অঘ্রাণে নবান্নের সময় গ্রামবাসীরা তার পরিবর্তে চাল-পয়সা-সিধে সব দিয়ে থাকেন। পৌষ মাসে সোনার ধান ওঠে। ৫৪ শতক জমি আছে সুবলের। তারপর মাঘ মাস থেকে দু'চারটি গ্রামে বহুরূপী দেখিয়ে বেড়ান তিনি। সকাল আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে বেরিয়ে দুপুর দু'টোর মধ্যে ঘরে ঢুকে যান, তবে কোনোদিন বিকেলেও বেরোতে হয়। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গ্রামীণ মানুষের হাতে টাকা-পয়সাও থাকে। অনেকক্ষেত্রে চাল-ডাল-আলুও পাওয়া যায়। কেউ কেউ নেমন্তন্ন ক'রে ভাতও খাওয়ায়। 'মাঘ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত ব্যবসাটা ভালো চলে। মেকআপ নিয়ে, পোশাক পরে ঘুরতেও অসুবিধা হয় না। ছ'দিনে ছটা রূপ দেখিয়ে সাতদিনের দিন আমি জেলেনি সাজতাম। জেলেনি সেজে চাল-টাকা তুলতাম, অন্যদিন নিতাম না।' আগে অনেকে পুরস্কারও দিতো, কাপড় দিতো, জমির ফসল দিতো। এখন সে সব কমে এসেছে।

গুরু **কানাই চক্রবর্তী** বলতেন—'বহুরূপী হলো মোহিনী বিদ্যা। জীবিকা হলেও এটা শিখতে হয় ভালোভাবে। মোহিনী বিদ্যা পরিবর্তিত হয়েই হয়েছে বহুরূপী।' 'এই যে নারীপুরুষ দেখছেন, এটা আমার গুরুর কাছে শেখা। তবে উনি যেমন করে করতেন, আমি তেমন করি না। একটু মর্ডান করে নিয়েছি, অন্য বহুরূপীরা সুবলের সঙ্গে কথা করেই নারীপুরুষ, হরগৌরী, এসব প্রায় সাজেই না। অবশ্য এসব রূপায়ণে সুবলদাস বৈরাগ্যের তুলনাও মেলে না কারো সঙ্গে। ঘন ঘন কোনো গ্রামে বহুরূপী দেখাতে যান না সুবলদাস। যে গ্রামে একবার গেছেন সে গ্রামে দশ বছরে আর নয়। এখন তো বয়সের জন্য কাজ অনেক কম হচ্ছে। অনেক গ্রাম থেকেও মানুষজন ডাক পাঠায় সুবলকে। নিজের গ্রামের মানুষেরাও তার সাজ দেখতে চায়। এলাকার মানুষের দাবীকে মান্য করেই এবার তিনি ভেবেছেন এখানেই বহুরূপী দেখাবেন। নিজের গ্রাম এলাকায় বহুরূপী দেখিয়েও তৃপ্তি পান সুবলদাস। ১৫/২০ বছর আগেও তো মঞ্চে বহুরূপী হতো না। ওই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরেই বহুরূপী দেখিয়ে বেড়াতে হতো। তাতেই কোনোভাবে কষ্টে-শিষ্টে সংসার চলতো। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া ৫০০ টাকা মাসে মাসে অনুদান পায় সুবলদাস। ছেলেও সংসারে টাকা দেয়, ৫৪ শতক জমি থেকেও কিছু আয় হয়। সব মিলিয়ে চলে যায় সংসার। বাড়িতে রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে, তাছাড়াও রাধাকৃষ্ণের ছবি আছে। হিন্দুধর্মের শাস্ত্রানুসারেই খাঁটি বৈষ্ণবের জীবনযাপন করেন বহুরূপী সুবলদাস বৈরাগ্য। উত্তরবঙ্গে কোনো বহুরূপী নেই বলেই তার ধারনা। ওয়াশিংটন থেকে ঘুরে আসার পরই রাজ্যের বিভিন্ন মঞ্চে বহুরূপী দেখানোর ডাক পেয়েছেন তিনি। তার আগে মঞ্চে হতো না।

পালিত বাবার কাছে মানুষ হয়েছেন সুবল। ১৪ বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ। তখন নেশা পড়েছিল গাঁয়ের যাত্রাদলে, সেখান থেকে বোলপুরের যাত্রা পার্টিতে ফিমেলের রোল। স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন। এই সময় গুরু ছিলেন মহাদেবপুরের দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁরই সহায়তায় নামী শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ আসে। কলকাতার দলেও ঠাঁয় হ'য়ে যায়। তারপর বহুরূপীর পেশা। গুরু কানাইলাল চক্রবর্তী আমাকে দিয়ে কাজ করাতো,

টাকাপয়সাও বেশির ভাগটাই তিনিই নিতেন। তখন একদিন গুরুকে বলেছিলেন সুবল— 'গুরুদেব, জাত যাবে পেট ভরবে না, এ কেমন ক'রে হয়!' গুরুদেব বললেন—'আমি শিখিয়ে দিয়েছি, এবার তুমি তোমার পথ খুঁজে নাও'। কিন্তু শিক্ষার কী শেষ আছে? 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' যাই হোক, গুরুর সঙ্গ ছেড়ে পুরনো পরিচিত যাত্রাদল থেকে তাদের বাতিল হওয়া কিছু পোশাক সংগৃহীত হলো। তারপর লাজ-ঘেন্না-ভয় পরিত্যাগ করে নিজের এলাকা এবং শ্বশুর বাড়ির এলাকায় প্রথম বহুরূপী দেখান সুবল। নিজের এলাকার বিভিন্ন স্কুল-গ্রাম এবং বোলপুর শহর ছাড়া বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানা এলাকার ছোড়া গ্রামে সেই বহুরূপী দেখানো। মান-লজ্জা-ভয় সব চলে গেল শ্বশুরবাড়ি ছোড়া গ্রামে দেখানোর পর। আস্তে আস্তে পঞ্চায়েত-থানা, ডি-এম-এর অনুমোদন মিললো। সুবলদাস পুরোপুরি নেমে পড়লেন বহুরূপীতে। যাত্রা ছেড়ে দিয়ে পুরোটা সময়ই দিয়ে দিলেন বহুরূপীকে।

একদিন কলকাতার জোকার কাছে একটি গ্রামে বহুরূপী দেখিয়ে দানাপুর ট্রেন ধ'রে বাড়ি ফিরছিলেন সুবলদাস। কিছু টাকাপয়সা এবং চালও ছিল সঙ্গে। পথে চন্দননগর স্টেশনে ছিন্‌তাই হয়ে গেল ব্যাগ, সর্বস্ব হারিয়ে হতাশ হ'য়ে পড়লেন বহুরূপী সুবলদাস। ভাবলেন আর বহুরূপী করবেন না। কিন্তু বাড়িতে আসতেই সংসারের সবাই স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা সাহস দিলো, বুঝিয়ে বললো। তারপর নতুন উদ্যমে আবার শুরু হল বহুরূপী দেখানো। সেই হতাশার কালে হুগলি জেলার বৈঁচি চারাবাগানের বহুরূপী নিত্যানন্দ মহান্তও খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'শিল্পীদের জীবন দুঃখময়, হেরে গেলে চলবে?' না, হারেননি বহুরূপী সুবলদাস। মানী-মানুষের ভালোবাসা পেয়ে তার জীবন ধন্য। দিল্লিতে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মাননীয় রাজীবগান্ধীর আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং স্পর্শ পেয়ে আনন্দে বুক ভ'রে গেছে সুবলের। সেই স্মৃতিতে তিনি আজও সমুজ্জ্বল। কথা বলতে বলতে তার আলোকিত মুখ ধরা পড়েছে আমার কাছে। তাই যতদিন বাঁচবেন ততদিনই বহুরূপী লোকশিল্পটিকে ধ'রে বাঁচবেন, নিজেকে এর উন্নতিতে সার্বিকভাবে নিয়োজিতও রাখবেন বলে চরম আস্থা পোষণ করেন সুবলদাস বৈরাগ্য। এই শিল্পটির মধ্যে তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয় বলেও মনে করেন তিনি।

নদিয়া কৃষ্ণনগরের কৃষিমেলা, দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটি লোকমেলা, ক্যানিং সুন্দরবন গোসাবার কৃষিমেলা, বাণীপুর উত্তর-চব্বিশ পরগণার লোকোৎসব, দেবানন্দপুরের শরৎমেলা, এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বহুরূপী দেখিয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন শিল্পী। এই বহুরূপীর জীবন নিয়ে তার কোনো খেদ নেই। তবে আয়টা বেশ কম। সম্মানের সঙ্গে আয়টা একটু বাড়লে ভালো হত। নতুনভাবে বহুরূপীকে উপস্থাপনের চেষ্টায় নানান সংলাপও রচনা করছেন সুবল দাস। সাজিয়েছেন একফালি কবিতাও।

১. **সাক্ষরতা** :

লেখাপড়া শিখেছি রাতের ইস্কুলে।
বুড়ো বয়সে সাক্ষর হবে
এই কথা সবাই বলে,
লেখাপড়া শিখেছি রাতের ইস্কুলে ॥

শিক্ষার কী মান-সম্মান
শিক্ষার পেলাম দাম,
দেশ বিদেশে ঘুরে এলাম
অভিনয় ছলে ॥
লেখাপড়া শিখেছি রাতের ইস্কুলে ॥

বহুরূপী সুবল ভেবে কয়—
এবার চরণতলে দাও আশ্রয়
স্থান পাই চরণতলে।
লেখাপড়া শিখেছি রাতের ইস্কুলে ॥

২. **শৌচাগার** :

গাড়ু নিয়ে বদনা নিয়ে
সকাল-সাঁঝে যাবোনাকো মাঠে-ঘাটে আর,
গড়ব এবার নিজস্ব শৌচাগার।
বাড়াতে জীবনের মান
রক্ষা করুন স্বাস্থ্যবিধান ॥

নমস্কার—
ছেলেদের ভালোবাসা, মেয়েদের ভালোবাসা ॥

৩. **জলপ্রকল্প** :

বোলপুরে পৌষমেলা
শ্রীনিকেতনে টেগোর সোসাইটি
আনলো জার্মান প্রকল্পের জল
প্রাণের সম্বল ॥

নমস্কার—
ছেলেদের ভালোবাসা, মেয়েদেব ভালোবাসা ॥

প্রথম দিকে বীরভূমের বহুরূপীরা শুধুমাত্র দেবদেবী রাক্ষস-পশু এসব সাজতো, সুবলদাসই বহুরূপী সজ্জায় নতুনত্ব এনেছেন। এ দাবী করেই সুবল বহুরূপী জানান—রবীন্দ্র চিন্তাধারাকেও তিনি এবার বহুরূপীতে নিয়ে আসার কথা ভাবছেন। বহুরূপী দেখানোর ক্ষেত্রে বোলপুর-লাভপুর আর বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানা এলাকাই সুবলদাসের কাছে প্রিয় ও পছন্দের এলাকা। গ্রামের মানুষ আগেও বহুরূপী দেখেছেন, এখনও দেখ্ছেন। যদিও গ্রামদেশ বদ্‌লে যাচ্ছে দ্রুত। তথাপি এখনও বাতিলের তালিকায় যায়নি বহুরূপী। ঠিক মতো মেক-আপ সাজসজ্জা করে গেলে গ্রামীণ মানুষের বহুরূপীতে অরুচি নেই বলেই সুবলদাসের বিশ্বাস। আবার সাজ যেমনই হোক তারও একটা আকর্ষণ আছে। বহুরূপী-শিল্পী যদি শিল্পটিকে

টেকাতে সচেষ্ট থাকে, নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে আসে, তাহলেই টিক্‌বে বহুরূপী, এমন বক্তব্যও সুবল দাসের। তিনি প্রতিবার পৌষমেলায় বহুরূপী সাজেন।

সাজসজ্জা আর মেক-আপ প্রসঙ্গে সুবলদাস বৈরাগ্য জানিয়েছেন—মেক-আপে আগে জিংক-অক্সাইড পাউডার থাকতো, ভুষো কালি-আলতা-সিঁদুর এসব লাগতো। এখন আমরা লিপস্টিক নিই, 'মিনা' নামের একটা লাল রংও পাওয়া যায়। কাজলও কিনে আনি। মেক-আপও কিনতে পাওয়া যায়, একেবারে তৈরি। যাত্রা জগতের 'টিউব মেক-আপ'ও পাওয়া যায়। ফেস্‌-পাউডার, সিঁদুর, জিংক-অক্সাইড, স্পিরিট, গাম, কালো-সাদা ক্রেপ, এসবও লাগে। নারায়ণ-শিব-কালী সাজার জন্য আবার মুকুট-বাঘছালের কাপড়-ত্রিশূল-ডমরু-টিনের দা-শঙ্খ-টিনের চক্র-গদা-প্লাস্টিকের মালা-ফুল সবকিছুই তো চাই। যা সাজবো তার মতো তো পোশাক চাই। যাত্রা দলের পুরনো বাতিল এক-আধটু ছেঁড়া পোশাকও অনেক সময় কিনে নিই আমরা। তাছাড়া তৈরিও করে নিতে হয় নিজেকে। কাটোয়াতে ড্রেস-কোম্পানি আছে, ওরা কমদামে পুরনো ড্রেস-পোশাক বিক্রী করে দেয়। বোলপুরে, বহরমপুর-খাগড়ায়ও পাওয়া যায়। তাছাড়া কলকাতা থেকেও আনতে হয়। সেখানে সব রকমই পাওয়া যায়, ভালোও পাওয়া যায়। বর্ষায় বহুরূপী দেখানো প্রায় বন্ধই থাকে। জলে-বৃষ্টিতে পোশাক মেক্‌-আপ সব নষ্ট হয়ে যায়, বহুগ্রামে এখনও কাদা মাটির রাস্তা। সরকারের দৃষ্টির জন্য বহুজনই এখন বহুরূপী সাজতে আসছে। তবে ট্রেনে-বাসে ভিক্ষেও ক'রে বেড়াচ্ছে বহু বহুরূপী।

'ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না, হনুমান-রাম-রাক্ষস সেজে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে। ওদের সাজসজ্জা দেখেও হাসাহাসি করে মানুষজন। এভাবে উন্নতি হয়? তবে আমি নিজে বহুরূপী সেজে খুবই আনন্দ পেয়েছি। আমারও বাড়িতে ভীষণ অভাব ছিল, পরিবারের সবাই সেসব মানিয়ে নিয়েছে। কেউ আমাকে এই শিল্প বিষয়ে বাধা দেয়নি। আমি যখন বিদেশ যাচ্ছি তখনও বাড়িতে চাল-পয়সা দিয়ে যেতে পারিনি। দুঃশ্চিন্তা ছিল। আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা বলেছে—'চিন্তা করবে না, তুমি যাও'। মনের মধ্যে বাড়ির অভাবের কথা চিন্তা করেই মঞ্চে উঠেছি। তবে আনন্দের অভাব হয়নি কখনও। এখন সবাই প্রথমেই পয়সার কথা ভাবে, তাই আমার তেমন শিষ্য নেই। শুধুমাত্র বৈঁচির নিত্যানন্দ মহান্ত আমার সহকারী। গ্রামের দু'তিনজন ছিল, ঠিক মতো মজুরি দিতে পারবোনা ভেবেই তারা আর আসে না। তা নিত্যানন্দের অনেক কাজই জানা আছে। সে হলো গিয়ে হালুইকর, ভালো মিষ্টি তৈরি করতে পারে। হরিনাম-সংকীর্তন গাইতেও আমন্ত্রিত হয়ে অনেক জায়গায় যায়। তবে আমাদের জুটির কোনো অসুবিধা নেই। সময়-সুযোগ এলেই আমরা বহুরূপী সাজি।'

নিত্যানন্দের সঙ্গে সুবলদাস জোট বেঁধেছেন মাত্র পাঁচ বছর। এমনিতে সুবলদাস বহুরূপী দেখাচ্ছেন ৩০/৩২ বছর। স্টেজে নয়, গ্রামে যখন বহুরূপী দেখাতে যান সুবল তখন তিনি কী করেন?

''প্রথমে একটা গ্রামে গিয়ে সাধুর বেশ ধরে ঘুরতে থাকি। নানান কথা বলি। কখনো বলি—'ম্যায় আ রাহা হু, ম্যায় বহুত দূর সে আ রাহা হু, ম্যায় সাধু-সন্ন্যাসী আদমি হ্যায়। সাধু সেবা লে মা—সাধু সেবা কর। সংসারের মঙ্গল হবে।' আবার কখনো বলা হয়—'মায়ের ঘরে এসেছে সাধু, সবার মঙ্গল হোক। সাধুর সেবার জন্য কিছু নিয়ে আয় মা।

জয় গুরু জয় গুরু, জয় জয় গুরুর জয়। জয় হোক, সবার মঙ্গল হোক।' অনেকে বুঝতেহ পারে না বহুরূপী নাকি ভিখিরি সাধু। এরপর আরও বহুরূপী দেখানোর পর সাতদিনের দিন জেলেনি বা গোয়ালিনী সেজে টাকা-পয়সা তোলা হয়।"

সুবল দাসের বহুরূপীর গুরু চারকল গ্রামের কানাই চক্রবর্তীরা ছিলেন যথেষ্ট গরীব। এলাকায় তাঁরা 'গণক' নামে পরিচিত ছিলেন। হাত দেখা, কোষ্ঠী গণনা, জল-অচলদের বাড়ির বিয়ে-অন্নপ্রাশন প্রভৃতিতে নান্দিমুখ করাতেন। তাঁরা ছিলেন 'অগ্রদানী' ব্রাহ্মণ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' গল্পের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে। অভাবের কারণে যিনি শুধু নিজের সন্তানকে জমিদারকে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, আপন সন্তানের মৃত্যুতে গোয়ালে বসে উৎসর্গিত 'পিণ্ডি'ও খেয়েছিলেন। অসহনীয় অভাবই তাঁদের জাত-পংক্তি থেকে নামিয়ে এনেছিল। তাঁরা নিচু শ্রেণির ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। গ্রামে তাঁদের নাম ছিল **কানাই গণক** আর **ধরম গণক**। চারকলগ্রামের এই দু'ভাই-ই বহুরূপী সাজতেন। এখন আর এ গ্রামের কেউ বহুরূপী সাজে না। কানাই গণক বা ধরম গণকের উত্তর প্রজন্মও আর বহুরূপী সাজে না। তারা এখন তাদের জাতব্যবসা নিয়ে আছে। কোষ্ঠী বিচার বা গণনাই তাদের জাতব্যবসা।

আসলে বিশেষ কোনো জাতির নিজস্ব পেশা বা জীবিকা নয় বহুরূপী দেখানো। পাখমারা গোষ্ঠীর মানুষজন এ পেশায় সর্বাধিক অংশগ্রহণ করলেও, তাদেরও জাত-ব্যবসা বহুরূপী নয়। এক সময় রাজা-জমিদারদের খবরাখবর সরবরাহের জন্য দরিদ্র শ্রেণির কিছু মানুষজন নিযুক্ত ছিলেন। তারা তখন অনেকটাই সামন্তপ্রভুদের গুপ্তচরের কাজ করতেন। গুপ্তচর বৃত্তির অবসান ঘটে রাজা-জমিদারদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে। তখনই সেইসব কর্মহীন মানুষেরা ছড়িয়ে পড়েন নানান জীবিকার সন্ধানে। পট দেখানো, ভোজবাজী দেখানো, রায়বেঁশে নাচ দেখানো, হাবুগান শোনানো, এমন কী বহুরূপী দেখানোও তখন থেকেই কিছু মানুষের পেশা হ'য়ে দাঁড়ায়। জীবিকা হিসেবে এই সমস্ত লোকায়ত মাধ্যম তারপর থেকেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তথাপি উন্নত ভিক্ষুকের চেয়ে শিল্পীদের মর্যাদা বাড়েনি এতটুকু। আর সে কারণেই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জীবনযুদ্ধে একেবারে পরাজিত হ'য়ে না পড়লে বহুরূপী পেশাতে আসছে না। সুবল দাসবৈরাগ্যের ছেলে ধনেশ্বরও (৩৩) বহুরূপী সাজে না, ওষুধের ব্যবসা করে সংসার চালায়।

কালীপদ পাল

হুগলি জেলার তারকেশ্বর এলাকায় থাকেন বহুরূপীর জনক কালীপদ পাল ওরফে কালীপদ বহুরূপী। ৪০/৪৫ বছর ধরে বহুরূপী দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। এখন বয়স ৭৪। শরীর জীর্ণ, কিন্তু মনোবলের অভাব নেই এতটুকু। তরতাজা মনটি নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে বহুক্ষণ গল্প করেছেন, চা-বিস্কুটে আমাদের আপ্যায়িতও করেছেন। দুপুরের খাবার খেতেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খাতা খুলে দেখিয়েছেন যারা এসেছিলেন তার কাছে তাদের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর। আমাদের ঠাঁই-ঠিকানাও লিখে নিয়েছেন সেই খাতায়। জানিয়েছেন—এক জাপানি মহিলা তাকে নিয়ে কাজ করতে এসে তার বাড়িতেই ৭ দিন ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'হোটেলে থাকব না, তোমার বাড়িতেই থাকব—খাব।' কালীপদর বাড়িতেই আছে নানান

বহুরূপী সংক্রান্ত খবরের কাটিং, জেরক্স করা আছে তার জীবনীও। অনায়াসে সেইসব কাগজপত্র—পরিচিতি জ্ঞাপক লেখাপত্রের জেরক্স তিনি তুলে দেন। সদাহাস্যময় আনন্দমুখর সজীব মানুষ কালীপদ বহুরূপী আজ আর একক বহুরূপীমাত্র নন, তিনি এখন তারকেশ্বরে বহুরূপীদের একটি প্রতিষ্ঠান। ১৫/২০ জনের দলের দলপতি, গুরু। এখন তাদের সংগ্রহে রয়েছে দেড় লক্ষাধিক টাকার পোশাকপত্র আর বহুরূপীর আসবাব। ৪০/৪৫ হাজার টাকার বায়না নিয়ে তাদের দল বহুরূপী দেখাতে যায়। মঞ্চেও তারা বহুরূপী প্রদর্শন করে থাকে। দূরদর্শনেও লড়াই করে অনুষ্ঠান ক'রে এসেছেন। অন্য জেলায়, অন্য রাজ্যেও আমন্ত্রণমূলক বহুরূপী প্রদর্শন করে এসেছেন। নিজের বহুরূপীর পেশা বা জীবিকাতে যথেষ্ট খুশি এবং আস্থাশীল আছেন কালীপদ বহুরূপী। তবে উত্তর প্রজন্মের প্রতি তিনি ঠিক ততটা খুশি নন। নাতিরা বহুরূপী সাজলেও তাদের ওপর কোনোই আস্থা নেই কালীপদর, তিনি সুখিও নন সে বিষয়ে। তিনি মনে করেন—'খালি পোঁদে রং মেখে হনুমান সাজলেই বহুরূপী হয় না, অনেক কিছু জানতে শিখতে হয়।'

কালীপদ এখন 'ড্রেস ডিলার'। বহুরূপীর পোশাক ভাড়া দেয় তারা। যাত্রা-সিনেমা-অনুষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে, উৎসবে তাদের পোশাক ভাড়া ক'রে নিয়ে যায় সকলে। তারা এখন একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। নিজেদের ১৫/২০ জনের দলটি নিয়েও 'হায়ারে' যায় কালীপদ। তখন কিন্তু ৪০/৫০ হাজার টাকা চাই তাদের।

তাছাড়া তারকেশ্বর এলাকায় শিব-কালীর ছড়াছড়ি। বহু দরিদ্র বহুরূপী সকালে এসে শিব বা কালীর পোশাক ভাড়া নেয়। তারপর সেই পোশাক পরে বেড়িয়ে পড়ে। সারাদিন ঘোরে দূরে-দূরান্তরে। শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বর-শিবের জল ঢালার বিশেষ উৎসব। তারকনাথের এই বাড়-বাড়ন্তের সময় বহুরূপী শিবেদেরও দু'পয়সা বেশি আয়। তবে শিব বা কালী সেজে তাদের মোট যে আয়, টাকা এবং চাল, তার সিকিভাগ পায় কালীপদ। ড্রেস-পোশাক দেবার কারণে। একসময় কালীপদর স্ত্রী নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন সেইসব শিষ্য-সখা-সন্তানতুল্যদের। কালীপদকেও সাজিয়ে দিতে হয়, কালীর মুকুট পারিয়ে দিতে হয়, জিভ লাগিয়ে দিতে হয়। এই সমস্ত কারণেই আয়ের সিকি তাদের প্রাপ্য। শিব-কালীরা যে সমস্ত ফলমূল পায় তারও ভাগ দেয় কালীপদকে. তবে কালীপদ সেসব ফল-মূল দাবী করে না। আসলে প্রাপ্য ফল-টলের দাবীদার নয় গুরু। তবে সন্ধ্যার সময় টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দেওয়া চাই। ফল-মূল দিলে ভালো, না দিলেও ভালো। তবে বিশ্বাস করতেই হয়। আয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন চলে না। এমনিতেই বর্ষার সময় আয় কম হয়, তবে তারকনাথের পুজোপাল্ থাকলে আয় বেশিই হয়। অনেকে ড্রেস-আসবাব কিনতে পারলে নিজেই কিনে বহুরূপী সাজে। বেশিজনই অবশ্য সকালে ভাড়া নিয়ে সন্ধ্যায় ফেরত দিয়ে যায়। এরই মধ্যে তারা হুগলি থেকে কলকাতা পর্যন্ত বহুরূপী দেখিয়ে ফিরে আসতে পাবে। কালীপদর ব্যবহারেও সকলেই খুব তুষ্ট। গুরুর কথাকে অমান্য করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনোটাই তাদের নেই। কালীপদকে কেন্দ্র করে তারকেশ্বরের জ্যোৎশম্ভু এলাকায় গড়ে উঠেছে বহুরূপীদের একটি 'সফিস্টিকেট ড্রেস ডিলার' প্রতিষ্ঠান। অনেকটা কলকাতার যাত্রাদলের মতোন।

যেদিক দিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়ায় তারকেশ্বর স্টেশনে, সেদিকেই ফিরে পিছিয়ে যেতে হয় রেললাইন বরাবর। ২৩নং রেল গেট। উঁচুতে উঠলেই বাসচলাচলের বড়ো রাস্তা। সেই বাস

রাস্তা পেরিয়েই ডানদিকে জ্যোৎশম্ভু। মোরাম-মাটির পথ। অনেকটাই জলা এলাকা। তাহ চারদিকে পাটের জমি। মাঝেমধ্যে দু'একটি করে পাকা বা অর্ধপাকা বাড়ি গড়ে উঠেছে। পাড়াটি সম্পূর্ণভাবেই গড়ে ওঠার মুখে। তবে স্টেশন থেকে এই জ্যোৎশম্ভু এলাকার দূরত্ব খুব বেশি নয়। কাছেই। খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হয় না। সবাই দেখিয়ে দেয় গড়ে ওঠা কালীপদর বাড়ি। না, এটি কালীপদর বাড়ি নয়। তার মেয়ে-জামাই-এর বাড়ি। মেয়ে-জামাই-এর সংসারেই থাকেন কালীপদ। জামাই ফুচ্‌কা বিক্রী করে। জামাই সাধন হালদার, মেয়ে আলপনা আর তাদের পাঁচ ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে কালীপদর সংসার। নাতি-নাতনিদের নিয়ে বেশ আনন্দেই আছেন তিনি। দুই নাতি দীপঙ্কর আর শুভঙ্কর দাদুর মতো বহুরূপী সাজে। তবে তাদের ওপর আস্থা কম কালীপদর। এখনো খালিহাতে তারকেশ্বর বাজারে গেলে বিনি পয়সাতেই হাট-বাজার সব করে আনার ক্ষমতা আছে বলে স্বীকার করেন তিনি, কিন্তু নাতিরা তা পারবে বলে তার বিশ্বাস নেই। তিনি মনেও করেন— 'নাতিরা তা পারবে না'।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের দোগাছা গ্রামে কালীপদর জন্ম। বাবা ভীমচন্দ্র পাল। বাল্য অবস্থাতেই জন্মভিটে ত্যাগ করেছেন তিনি। কোনোদিন যেতে আর ইচ্ছে করে না। সেখানে দোগাছায় ৫ বিঘে ৭ শতক জমি আছে, সেসবও দাবী করেননা কালীপদ। কষ্ট খুবই পেয়েছেন জীবনে। তবে হারেননি কখনও তিনি। এখন তো সুখে মেয়ের ৬ ছেলে-মেয়েকে নিয়ে আছেন। নাতনির বিয়ে দেবার বন্দোবস্তও করছেন। তারকেশ্বরের জ্যোৎশম্ভু এলাকায় বাড়িও করে ফেলেছেন শক্তপোক্ত। আগের দারিদ্র্যের কথা বলতে বলতে স্মৃতিচারণায় আবেগ-বিহ্বল হ'য়ে পড়েন কালীপদ। 'বহু কষ্ট করেছি জীবনে, সমানে দু'টো খেতে পরতে পাইনি।'

সর্ব প্রথমে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে-গেয়ে চানাচুর আর নকুলদানা বিক্রী করতেন কালীপদ। চৈত্রমাসে মেলা, তবু বিক্রী হয় না। সংসার চলে না। পরিবারের সবার মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে না পারার দুঃখে ক্ষতবিক্ষত হতেন তিনি। মনে হতো 'এই আমার জীবন? এ থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।' অবশেষে সেই চৈত্রমাসেই দেখলেন কালীপদ, একজন কালী সেজে আসছে। বুঝলেন—এও তো একটা ব্যবসা, এ করেও তো মানুষ খেতে-পরতে পায়। 'অমনি যদি আমি করি তাহলে আমিও খেতে পাব, দুটো পয়সাও হবে। তুমি আমার 'গুরু' বলে সেই ঝাঁপিয়ে পড়া। বহুরূপীর জীবনে।' সেই বহুরূপীর পিছনে পিছনে অহেতুক ঘুরে ঘুরে কালীপদ তার কায়দা-কৌশল দেখেছেন, রপ্ত করেছেন। না, সেই বহুরূপীর সঙ্গে কোনো আলাপই হয়নি কালীপদর। তাঁর নামটুকু পর্যন্ত স্মরণে আনতে পারলে না তিনি এখন। তথাপি স্বীকার করেন তিনিই তার বহুরূপীর গুরু। মনে করেন অনেক দুঃখকথা।

'সেই বহুরূপীর পেছনে ঘুরতে ঘুরতেই মা কালীর জামা-প্যান্টের মাপ দিয়ে দিয়েছি দর্জির কাছে। টাকা নেই সাজ কিনি। তখন সোনা ছিল ৭০ টাকা ভরি। স্ত্রী-র কানের ছ'আনার দুল বিক্রী করে সাজ কেনার কথা ভাবছি। স্ত্রীকে বলাতে সেও প্রশ্রয় দিল। বললাম—তোমার কানের দুটো বিক্রী করে মায়ের রূপ ধারণ করব। দেখি তিনি আমাদের খেতে-পরতে দেন কিনা। তাই করলাম। মায়ের মুকুট তৈরি হল। বহুরূপী দেখানো শুরু করলাম। সেও এই তারকেশ্বর থেকেই শুরু।'

বহুরূপী দেখাতে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশের হাতে পড়লেন কালীপদ। বর্ধমান শহর। পারমিশন নেই বহুরূপীর। গাড়ি থামিয়ে এক দারোগাবাবু ধরলেন কালীপদকে, গাড়ির ভেতরে তখন তাঁর স্ত্রী ছিলেন। 'আমি দারোগাবাবুর হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছি। বলছি খেতে পাইনা তাই বহুরূপী দেখিয়ে বেড়াই।' দারোগার স্ত্রীর মায়া হলো, তিনিই অনুরোধ করে বললেন—'গরীব মানুষ খেতে পায় না বলছে, একটু ব্যবস্থা করে দাও না।' 'সেই হলো পরিচয়। তারপর তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম, তাঁরা আমাকে সাহায্যও করতেন। এস. ডি. ও.কে বলে তিনিই আমার পারমিশন পাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। বহুরূপীর কার্ডও পেলাম। এখন দেড় লক্ষ টাকার পোশাক আছে, ভাড়া দিই। দল গড়েছি, বহুরূপীর শিক্ষাও দিচ্ছি। আমন্ত্রণে ৪০/৫০ হাজারে বাইরেও যাচ্ছি।' কিন্তু সেসব দিনের কথা একদিনের জন্যও ভুলতে পারেন না কালীপদ বহুরূপী। সেই চানাচুর আর নকুলদানা বেচার দিন, সেই পায়ের তালে ঘুঙুর আর গলায় নিজের বাঁধানো গান। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। তথাপি গানের সব কথা এখনও বলতে গিয়ে ভুল হয় না কালীপদর। মনে হয় সে নিজেও যেন ওই বেদে-যাযাবরদেরই কেউ, আপনজন।

১. তু হামাদের মাইয়ারে, তু হামাদের মাইয়া,
হামরা তুহার ছেলিয়া।
দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই, হামরা শিকার করে খাই,
থাকি গাছের তলে, হামরা শিকার করে খাই ॥

২. ঠাকুরদাদা জাত গোয়ালা, ঠাকরুণদিদি উড়ে,
আমার জাত গিয়েছে পুড়ে।
মা ছিল ওই বেদের মেয়ে, বাবা ছিল হেরে
মাকে নিলে তেড়ে ॥

৩. চানাচুর-নকুলদানা, ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না,
ছোক্‌রা খেলে চুল-দাড়ি আর পাকবে না—পাকবে না।
কালীপদর এই রচনা।
আমি বাংলা দেশের কানা
চক্ষু দুটি ভালো আছে ভাই, চশমাটি ভাঙা।
চানাচুর-নকুলদানা, ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না ॥

হুগলি জেলার তারকেশ্বর লাইনের নিত্যযাত্রীদের মনে পড়তে পারে, গান গেয়ে ট্রেনের কামরায় কামরায় নেচে-কুঁদে চানাচুর বিক্রী করতেন একজন। এইসব গানগুলি তিনিই বাঁধতেন আর চানাচুর বিক্রীর সময় নিজেই সুর করে গাইতেন। তাতে জমতো জিনিসটা। বিক্রীবাট্টাও ভালোই হত। পায়ে ঘুঙুর, গায়ের পোশাকেও বিচিত্র বাহার থাকতো তখন। এই মানুষটিই পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টাতেই হয়ে উঠলেন হুগলি জেলা এবং তার আশপাশ এলাকায় বহুরূপী পেশার জনক। আসলে চানাচুর বিক্রীও তিনি করতেন বহুরূপী সেজেই।

তাই যেদিন পথে বহুরূপী রূপের কালীকে দেখলেন, সেদিনই তার চেতনায় ধরা পড়ল বহুরূপী পেশার কথা। বহুরূপী দেখিয়েও তো মানুষ খায়-পরে-বেঁচেবর্তে থাকে। বাঁচতে বহুরূপী পেশাও তো মন্দ নয়। এই ভাবনার সূত্র ধরেই চানাচুর বিক্রেতা, ট্রেনের হকার কালীপদ পাল হয়ে উঠলেন কালীপদ বহুরূপী। অবশ্য এর পরে আর তাকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

আজও সেই শ্রীনাথ বা ছিনাথের বংশধরের মতোন সারা বাংলা জুড়েই ছড়িয়ে আছে বহুরূপীরা। তারকেশ্বরের জ্যোৎশম্ভু গ্রামে তেমনই বাস করে কয়েক ঘর বহুরূপী। এরা সবাই একই জাতিরও নয়। তবে সবাই-ই দরিদ্র। এলাকার প্রাচীন এবং অভিজ্ঞ ও প্রবীণ বহুরূপী হলেন কালীপদ। তার ১৫/২০ জন সখা-শিষ্য-সাকরেদ। এই তারকেশ্বর এলাকায় এরাই জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে বহুরূপী পেশাটিকে। বহুরূপী দেখিয়েই কোনোক্রমে চলে যাচ্ছে তাদের অভাবের সংসার। কালীপদর আর তেমন অভাব নেই। ৭৪ বছর বয়সের এই আনন্দময় পুরুষটি এলাকার সকল বহুরূপীর কাছেই 'গুরু' নামে বিবেচিত। 'গুরু' নামেই ডাকে সবাই। তিনিও তাদের শিক্ষা দেন, পোশাক পরিয়ে দেন, মেক-আপ করে দেন, সময় ও উৎসব বুঝে চরিত্র পছন্দ করেও দেন। মহড়ায় বসান এবং পোশাক ও জিনিসপত্রের জোগানও দেন। তারপরই মুখে-দেহে রং মেখে, ঝলমলে নির্বাচিত পোশাক পরে পথে-ঘাটে-বাজারে নেচে-গেয়ে আসর মাত্ ক'রে আসে বহুরূপীরা। প্রতিদিন গুরুর দেওয়া সাজ পরে, গুরুমায়ের কাছে মেকআপ-এর শেষ ছোঁয়াটুকু নিয়ে, গুরু এবং গুরুমাকে প্রণাম করে নগর পরিক্রমায় বের হয় বহুরূপীরা। এর বিনিময়ে অবশ্য প্রতিদিনের রোজগারের চারভাগের একভাগ দিতে হয় গুরুদম্পতিকে। প্রথম দিকে কালীপদ নিজেও শিব-কালী-পূত্না-জটায়ু-পাহাড়ি পাখি প্রভৃতি সেজে বেরোতেন। ৪০/৪৫ বছরের বহুরূপী জীবন তার। কত অভিজ্ঞতা, কত দুঃখ, কত ভালোবাসা!

তবে বহুরূপী জীবনে সারা জীবনের সম্বল দারিদ্র্য। ছোটো ঘর, বেশিরভাগই মাটির। রুগ্ন-অসুস্থ-শীর্ণ শরীর। রুক্ষ চুল, কোটরে ঢোকা চোখ, বেরিয়ে আসা চোয়াল, শুকনো মুখ। তাতেই খড়ি ঘষে, কালি মাখিয়ে দিন গুজরান। কালীপদ পাল নিজে বহুরূপীদের 'ড্রেস ডিলার' হলেও অতীতের কথা তিনি ভুলে যাননি এতটুকু। তার বিশ্বাস—'বহুরূপীরা এখন স্রেফ ভিখিরি। আগে আমাদের সোনার-দিন ছিল। বাড়িতে-উৎসবে আমন্ত্রণ আসত। আজ সেসব কই।' ভিডিও, টি.ভি., ভিসিডি এসে এই সমস্ত লোকসংস্কৃতির বিছানো আঁচলটিকে ছোটো করে দিয়েছে বলেই এইসব লোকশিল্পীদের ধারণা।

রোদে-বর্ষায়-খালিপেটে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে, বিকৃত অশ্লীল কথাবার্তা শুনে, নেচে-গেয়ে দিনের শেষে ৩০/৪০ টাকা রোজগার। শিব-কালী একসঙ্গে সাজলে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, পথ-চলতি মানুষেরা মশকরা করে, অনেক সময় গায়ে জল ছিটিয়ে মেক-আপ নষ্ট করেও দেয়। তথাপি কিছু বলা যাবে না, মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে অন্যকিছু চিন্তা করে, ঘরের দুর্দশার দৃশ্যটির দিকে চোখবুজে তাকিয়ে স্থির থাকতে হবে। চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে, নিজের আচরণকে যুক্ত করতে হবে। এসবই শিক্ষানবীশ বহুরূপীদের ক্ষেত্রে গুরু কালীপদর নির্দেশ।

মাঠে ধান পাকার সময় থেকে বহুরূপীর ৬/৭ মাসের কাজ। শীতকালে অবশ্য মেলা-মচ্ছবে এবং গ্রীষ্মে চড়কে-গাজনে আর মনসাপুজো-ধরমপুজোয় একটু রোজগারপাতি বেশি হয়, তথাপি ঘোর বর্ষা বা চরম গ্রীষ্মে গাঁয়ে-গঞ্জে বেরোনই দায় হয়ে দাঁড়ায়। বহুরূপীদের মধ্যে অধিকাংশই পঞ্চম থেকে অষ্টম মান পর্যন্ত পড়াশুনা। তাদের বক্তব্য—'লেখাপড়া তো শিখিনে যে কাজ পাবো, বাবা-কাকাকে বহুরূপী সাজতে দেখেছি তাই হাজারো কষ্টেও বহুরূপী সেজে যাচ্ছি।' কখনো কৃষ্ণ-রাম-দুর্গা-রাক্ষস-হনুমান-বাঘ-ভালুক-পাগল-ভিখিরি সাজলেও তারকেশ্বর এলাকায় তথা হুগলি-হাওড়া-কলকাতা অঞ্চলে শিব আর কালীর চলই বেশি। সাধারণ একা একাই ৮/৯টার সময় সবাই বের হয়, তবে প্রয়োজন পড়লে ৩/৪ জনের দলেও বের হতে হয়। শিব-কালীকে তো অনেক ক্ষেত্রেই একসঙ্গে যেতে হয়। তবে চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াটা বহুরূপীর ক্ষেত্রে খুবই জরুরী। আসলে যাত্রা-সিনেমা-নাটকের খণ্ডাংশ উপস্থাপনই তো বহুরূপীর কাজ। সেখানে অঙ্গ সঞ্চালনা থেকে বক্তব্য আর অভিনয় কলাও উল্লেখের দাবী রাখে। তাই ঠাকুর সাজলে ঠাকুরের মতোন আচরণ বাঞ্ছনীয়। পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনা করেই বহুরূপী সবসময় ঠাকুর-দেবতার নাম জপ-ধ্যান করে চলে। তাতেই নাকি পরিস্থিতি আয়ত্বে আসে। সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। আসলে লজ্জা-ঘেন্না-ভয় এই তিনকে বিসর্জন দিয়েই বহুরূপী হয়ে উঠতে হয়। সারাক্ষণই এই ভাবনাকে জাগিয়ে রাখতে হয় মনের মধ্যে। তিনটির একটিও যার স্পষ্ট হয়ে জেগে ওঠে, তার পক্ষে আর বহুরূপী সাজা সম্ভব হয় না। এই কারণেই কালীপদর জামাই ফুচ্‌কা বিক্রী ক'রে জীবিকা নির্বাহ করলেও বহুরূপী সাজে না। বহুরূপীর ছেলে বহুরূপী হয় না অনেক ক্ষেত্রেই।

সঠিক অর্থে এখন লোকশিল্পীর মর্যাদা মেলেনা বহুরূপীদের। তারকেশ্বর এলাকার একমাত্র 'লাইসেন্স হোল্ডার' বহুরূপী কালীপদ পাল তাই খানিকটা হতাশাগ্রস্তও। স্ত্রী কিরণ অসুস্থ, ঠিক মতো তার চিকিৎসা করানোও যাচ্ছে না। প্রতি বছর মাটির বাড়ি বর্ষার জলে-বানে ভেঙে যাওয়ার কারণে একটি ইঁটের বাড়ি অবশ্য তৈরি হয়েছে জ্যোৎশম্ভুতে। তাছাড়া বনেদি কুকুর পোষার ঝোঁক রয়েছে কালীপদর। বাড়িতে একটি বিশালকায় অ্যালসেসিয়ান কুকুর শেকল দিয়ে বাঁধা আছে তাদের জ্যোৎশম্ভুব বাড়িতে। বাড়িব সবাই-ই প্রায় বহুরূপীর নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত। স্ত্রী সবকিছুর দেখভাল করেন। বউ-রা বহুরূপীর পোশাক-আশাক বের করা, পরিষ্কার করা, ছিঁড়লে সেলাই করা, যত্ন ক'রে গুছিয়ে রাখা সমস্তই করে। দিনান্তে প্রাপ্য টাকা-পয়সার হিসেব রাখে নাতিরা। মেকআপ-এর রংও বাড়ির সবাই চিনে গেছে। তবে ভবিষ্যতে বাড়ির অনেকেই বহুরূপী সাজতে রাজি নয়। পোশাক-আশাক ভাড়া খাটিয়ে রোজগারে অবশ্য আপত্তি নেই কারোরই।

বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে শিব আর কালীই তারকেশ্বর এলাকায়, বিশেষ ক'রে তারকনাথের দেশে সবিশেষ জনপ্রিয় এবং স্থান-উপযোগী। মুখে চড়া খড়ির সাদা রং, হাতে-পায়েও তাই, পরনে বাঘছালের মতো কাপড়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটা, জটার ফাঁকে এক টুকরো চাঁদ, কপালে পোস্টার কালারের কালো রঙে আঁকা চোখ-তৃতীয় নয়ন, হাতে ত্রিশূল, পায়ে বাঁধা ঘুঙুর, সব মিলিয়ে শিব—বহুরূপীর শিব। কালী সাজা বেশ কষ্টকর। সেখানে চোখের কাজ করতে বেশ সময় লাগে। বহুরূপীদের চোখ একটি বিশেষ অস্ত্র। দেহ-ভাষার অনেক

কথাই বলে দিতে পারে এই অন্যতম প্রধান অস্ত্রটি। তাই মা-কালীর চোখকে তৈরি করতে সময় লাগে। ভুঁষো কালি মাখতে হয় মুখে। পরনের প্যান্ট-জামা থেকে মুণ্ডমালা, অতিরিক্ত দু'টো হাত এবং তাতে অস্ত্র। টিনের জিভ থেকে বাড়তি মুণ্ড, মাথার মুকুট, টিনের দা-বাটি সবই ভাড়ায় পাওয়া যায়। এসবই রাখে বহুরূপী কালীপদ, প্রবীণ বহুরূপী সংগঠক।

সাজা ঠিক্‌ঠাক হয়ে গেলে আরশি কাঁচে ফুটে ওঠে শিব বা কালীর তৃতীয় নয়ন, নবনির্মিত মুখমণ্ডল। সাজ হয়ে গেলেই হাতে কমণ্ডলু-ত্রিশূল বা ডুগডুগি নিয়ে শিবের বেরিয়ে পড়া। মাঠ পেরিয়ে পথ, সেখান থেকে ট্রেনে-বাসে আরও অন্য কোথাও জীবিকার কারণে শুরু হয় পথ চলা। কালীও সেভাবেই পথে নামে। তবে শিবের চেয়ে কালীর কষ্ট আরও একটু বেশি। পথে-ঘাটে কথা বলাও যায় না, মুখে আটকানো থাকে টিনের আল্‌তা মাখানো জিভ্‌। এভাবেই প্রতিদিনের কাহিনি লেখা হ'য়ে উঠতে থাকে বহুরূপীর। সন্ধ্যায় আবার বাড়ি ফেরার আগেই ফিরতে হয় গুরু কালীপদর বাড়ি। সেখানে পোশাক-আশাক খুলে দিয়ে, টাকা-পয়সার হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে একটু খোশ গল্প করা হলেই নিজের বাড়ির পথ ধরে বহুরূপী। সেখানে তখন স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা আবার আসার অপেক্ষায় প্রহর গোণায় ব্যস্ত। দিনের রোজগার থেকে চাল-নুন আনা। রাত্রে ঘুম। ঘুমের ভেতরই থাকে আগামী দিনের প্রস্তুতি।

আজ আর এমনভাবে দিন কাটাতে হয় না কালীপদ পালকে। তিনি অনেক কষ্টের শেষেই এখন একটু আলোর ইশারা দেখতে পেয়েছেন। বহু কষ্টেই তিল্‌-তিল্‌ করে সঞ্চয় করেছেন পোশাক-আশাক-গয়না-মালা-মুকুট ইত্যাদি। যা ভাড়া খাটিয়েই তার এখন কিছুটা আয়ও হচ্ছে। ১৫/২০ জন প্রতিদিন নিয়ে যায় এই পোশাকপত্র। বহুরূপী দেখিয়ে তাদেরও সংসার চলে, কালীপদরও দু'পয়সা হয়।

তারকেশ্বর এলাকার বহুরূপী কালীপদর প্রচারপত্র

আমি শ্রীকালীপদ পাল এবং সম্প্রদায় বিভিন্ন পূজা-পার্বন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ বা যে কোনো অনুষ্ঠানে 'বহুরূপী' প্রদর্শন করিয়া দর্শকদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকি। আমরা দূরদর্শনেও অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। আমাদের কাছে আকর্ষণীয় বহু রকমের পোশাক আছে।

প্রদর্শনীর জন্য যোগাযোগ করুন—
কালীপদ পাল লাইসেন্স নং ১৪৫২/জে/এল/৭/৬/৮৩
জ্যোৎশম্ভু, তারকেশ্বর (২৩ নং রেলগেট)
তারকেশ্বর, হুগলি
ম্যানেজার ঃ
নিতাই মালিক
প্রকাশ সাইন (রামদা), তারকেশ্বর বাসস্ট্যান্ড
তারকেশ্বর, হুগলি

মুদ্রণে : তারকনাথ অফসেট : তারকেশ্বর বাসস্ট্যান্ড, হুগলি, দূরভাষ (৯১১২) ২৭৮৩১১

বহুরূপী কালীপদর অনুমোদিত আদেশপত্র

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate : Hooghly

ORDER

No-14 2/1 Date : 07. 06. 1983

Permission is here by granted to Sri **Kalipada Pal, S/o Bhim Ch. Pal** of Vill. Jyotshanbu, P.O-Tarakeswar, Dist-Hooghly. to show himself as 'Bahurupi' within Hooghly District.

Sd/Illegible
For District Magistrate : Hooghly
Date : 7 / 6 / 83

Memo No-1452/(3)/ESTT
Copy forwarded for information and necessary action to
1. Superintendent of Police, Hooghly
O/c. Tarakeswar. P.S, Hooghly
2. Sri Kalipada Pal

Sk / 27 / 5
Sd/Illegible
For District Magistrate : Hooghly

একসময় তারকেশ্বরে এসে পথের পাশে ঝুপড়িতে শুরু করেছিলেন জীবন। বেচেছেন নেচে-গেয়ে চানাচুর-নকুলদানা, করেছেন ফেরিওয়ালার কাজ। মাত্র ৮ বছর বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে সহায়-সম্বলহীন বালক দুটি ভাতের আশায় ঘুরেছেন মহানগরী কলকাতার পথে পথে। তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে এক গোয়ালার সঙ্গে চলে এসেছিলেন তারকেশ্বরে। খিদের জ্বালায় তারকেশ্বরে ভিক্ষে করেছেন। চাষীদের জমিতে মজুরের কাজ করেছেন। তারপর কালী বেশী বহুরূপীর দেখা পেয়েছেন ট্রেনে। এত কষ্ট সহ্য করেও তারকেশ্বরে থেকেছেন কালীপদ পাল। অবশেষে বহুরূপী সেজে খুঁজে পেয়েছেন জীবনের দিশা। তাদের বংশে কেউ কোনোদিন বহুরূপী সাজেনি। অথচ আজ প্রায় ৪৫ বছর ধরে বহুরূপীর জীবনকে বয়ে নিয়ে চলেছেন কালীপদ। এখন আর তার জীবনে আনন্দের অভাব নেই, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার রসদেরও অভাব নেই। এখন সারা রাজ্যেই কালীপদ বহুরূপীর এক বিশেষ সম্মান। সে আজ বহুরূপীর একটি প্রবীন প্রতিষ্ঠান। তার মাধ্যমেই আজ লালিত-পালিত হচ্ছে ১৫/২০টি পরিবার। ৩০/৪০টি মুখে হাসি ফোটানোর প্রতিদিনের দায় এবং দায়িত্ব তারই।

ভীমচন্দ্র পাল



কালীপদ পাল ॥ ৭৪
স্ত্রী কানন পাল, কিরণ পাল-অসুস্থ



মেয়ে-জামাই-এর কাছে থাকে জ্যোৎশম্ভু এলাকায়, তারকেশ্বর। এই এলাকার একমাত্র বহুরূপীর গুরু। একদিন ভিক্ষে ক'রে, চানাচুর বিক্রী ক'রে কাটালেও এখন তাদের প্রায় দেড়-লক্ষ টাকার পোশাক আছে। ১৮/২০ জন শিষ্য। ডাইমণ্ড হারবারের কাছে দো-গাছা গ্রামে জন্ম। ৪৫ বছর ধরে বহুরূপী সাজছেন তিনি।



আলপনা হালদার (মেয়ে)
সাধন হালদার (জামাই)



মেয়ে আলপনার স্বামী সাধন হালদার ফুচ্‌কা বিক্রী করে, বহুরূপী সাজে না। তবে নাতিদের কেউ কেউ বহুরূপী সাজে। মেয়ের পাঁচ ছেলে এক মেয়ে।

দীপঙ্কর।। ২০	শুভঙ্কর।। ১৮	অয়ন	সনু	রাহুল	মামনি
(বহুরূপী সাজে)	(বহুরূপী সাজে)	(স্কুলে পড়ে)	(স্কুলে পড়ে)	(স্কুলে পড়ে)	(ছোট)

কালীপদ বহুবপী মনে করেন—'বহুরূপীরা আজও শিল্পীর সম্মান পায় না, তাদের অবজ্ঞা করা হয়। নানান মূর্তি ধারণ ক'রে দেশবাসীকে তা দেখানোই বহুরূপীদের জীবিকা। নিতান্ত অভাবে পড়েই আমার মতো অনেকেই এটাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। কিন্তু এ করেও সবার সংসার এখন আর চলে না। বহুরূপী আর ভিক্ষুকে এখন আর কোনো পার্থক্য নেই। জীবিকার তাগিদে আমরা একাজ করলেও আমরা তো মানুষকে আনন্দও দিয়ে থাকি, বহুরূপী তো একটা লোকশিল্প। মানি, দুটি ভাতের আশাতেই—অভাবেই বাধ্য হয়ে আমরা এপথে এসেছি। তথাপি আমরা কেন শিল্পীর সম্মান পাবোনা সেইটেই বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের জন্য নেই কোনো সরকারী সুযোগও। সেখানেও বঞ্চিত হচ্ছি আমরা'।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বীরভূম জেলার 'ব্যাধ' পদবীর বহুরূপীরা সরকারী কিছু সুযোগ পেয়েছেন—পাচ্ছেন। তাদের কার্ড হয়েছে, উপজাতি হিসেবে তারা পরিগণিতও হয়েছেন। এ সুযোগ অন্য জেলাগুলিতে এখনও পাওয়া যায়নি। হয়তো পাওয়া যাবে অচিরেই।

কালীপদ বহুরূপী সরকারী সুযোগ-সুবিধা বা সাহায্য-সহযোগিতা কোনো রকমের এখনও কিছু পায়নি। তবে কলকাতা দূরদর্শনের একটি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। সেই আমন্ত্রণ-নির্দেশ অনুসারে একটি সুন্দর বড়-সড় অনুষ্ঠানও করে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানটি টিভিতে দেখানোও হয়েছিল ৯.১২.৮৮ তারিখ। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বহুরূপীদের অনুষ্ঠান করার জন্য টিভি কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের জন্য সাম্মানিকের টাকা চেকে দিয়েছিলেন। কালীপদর বাড়িতে সেইসব চেক্‌গুলি দেখেও এসেছি আমরা। নষ্ট হ'য়ে গেছে সে সব, ডেট্ পেরিয়ে গেছে। তথাপি দরিদ্র বহুরূপীদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা শুধু একটু ভালোবাসা আশা করে জগতের কাছে। একটু মানমর্যাদা। শিল্পী হিসেবে যৎসামান্য সম্মান।

নিত্যানন্দ মহান্ত :

বর্ধমান হাওড়া মেইন লাইনে 'বৈঁচি' স্টেশনে নেমে রেললাইন পেরিয়ে পশ্চিমে এলেই 'গ্রাণ্ট-ট্যাঙ্ক রোড'। সেই রাস্তা ধরে উত্তরে বর্ধমানের দিকে একটু এগিয়ে এলেই পথের পাশে বিরাট বট, তার ঝুড়ি নামিয়ে বাম দিকে এক আশ্রমের মতো জায়গা তৈরি করেছে। পাশ দিয়ে চলে গেছে মোরামের পশ্চিমী পথ। জায়গাটি বৈঁচি রেল স্টেশন থেকে এক কিমির মধ্যেই। এই মোরামের রাস্তায় বাঁক নিতেই একটি আশ্রমের মতো বাড়ি। পূব পাশে বাঁশ-কাবারির বেড়া, তাতে নানান ফুলের সঙ্গে অপরাজিতার লতা। ভেতরে ঢুকতেই শান বাঁধানো রাধাগোবিন্দের সুদৃশ্য মন্দির। ছড়ানো আটচালা।

এটিই বৈঁচির চারাবাগান এলাকা। জি-টি রোড থেকে উত্তরে একটু নেমেই নিত্যানন্দ মহান্তের বৈষ্ণববাড়ি। নিত্যানন্দই গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের পূজারি, সেবক। ব্রাহ্মণের পৈতে আছে নিত্যানন্দের। গলায় আছে তুলসীর সযত্ন কণ্ঠি। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের মতোন জীবন-যাপন করেন নিত্যানন্দ। ২০০৫ সালে তার কথা মতো বয়স ৬০ (ষাট)। তথাপি উজ্জ্বলতা কমেনি দেহের। সদানন্দময় এই মানুষটির আপ্যায়ণেও মুগ্ধ হতে হয়। রাধাগোবিন্দের পূজারী নিত্যানন্দ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ থেকে বহুরূপী দেখিয়ে আসছেন। শিক্ষা চতুর্থ শ্রেণি। আসলে তার বাল্যবেলা পর্যন্ত বৈঁচিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না, বেড়ালা স্কুলে পড়তে যেতে হতো। বাবা কানাইলাল মহান্ত ছিলেন ভিক্ষাজীবী। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে সংসার চলতো অতি কষ্টে। তাই চতুর্থ শ্রেণির বেশি আর পড়াশোনা করা সম্ভব হয়নি নিত্যানন্দের পক্ষে।

পাঁচ-ছ বছর থেকে বহুরূপী নিত্যানন্দ মহান্ত জোট বেঁধেছেন সুবলদাসের সঙ্গে। সুবল দাসের সঙ্গে মনের মিলও তার খুব। কাগজে সুবলদাস বহুরূপীর কথা শুনে 'দাদা'র পিছু নিয়েছিলেন ভাই নিত্যানন্দ। কিন্তু উঁনি কিছুতেই সঙ্গে নিচ্ছিলেন না প্রথম দিকে। সুবলদাসের সঙ্গে নিত্যানন্দের যোগাযোগকে একটা 'দৈবযোগ' বলে মনে করেন নিত্যানন্দ মহান্ত।

একদিন কলকাতা থেকে ট্রেনে বোলপুর আসার পথে চন্দননগরে সর্বস্ব খুইয়ে বৈঁচির চারাবাগানে নিত্যানন্দের আশ্রমেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হন বহুরূপী সুবলদাস। ট্রেনে সবকিছু চুরি না গেলে হয়তো তিনি বৈঁচিতে নামতেন না। 'চোরের হাতে সব খুইয়েই দৈবযোগে তিনি আমার বাড়িতে এলেন। আমিও আনন্দে আটখানা। সেই থেকেই দু'জনার একসঙ্গে পথ চলা।'

দু'জনের একসঙ্গে বহু ছবি আছে স্টুডিও-তে তোলা। সুবলদাসের সঙ্গে জোটে বহু অনুষ্ঠান করেছেন নিত্যানন্দ। পথে পথে এবং মঞ্চেও।

রাধাগোবিন্দ মন্দির ও আটচালা লাগোয়াই নিত্যানন্দের বাড়ি। সেখানেই থাকে তার পরিবার পরিজন। অতিথিদের তিনি বসতে দেন রাধাগোবিন্দের আটচালাতেই। জায়গাটিও বড়ো মনোরম। সেখানে টি-ভিও আছে। অতিথিরা বসে বসে টিভিও দেখতে পারেন। নিত্যানন্দ, সুবলদাস বহুরূপীর সঙ্গী এবং পরিপূরকও। কৃষ্ণনগরের রাস্তায় শিব (সুবল) আর সতী (নিত্যানন্দ) সেজে ঘুরেছেন দু'জনে। খুব আনন্দ পেয়েছিল সেদিন নদিয়া-কৃষ্ণনগরের মানুষজন। নিত্যানন্দ একা একা নারায়ণ সেজেও কৃষ্ণনগর পরিক্রমা করেছেন। তবে তাদের জুটি-বহুরূপীর প্রশংসা কবেছে অনেক। তারা দু'জনে সেজেছেন—কালী

(সুবল) ও ভক্ত (নিত্যানন্দ), কৃষ্ণ (সুবল) ও অর্জুন (নিত্যানন্দ), দ্রোণাচার্য (সুবল) ও একলব্য (নিত্যানন্দ), দিদিমা (সুবল) ও নাতনি (নিত্যানন্দ), রাম (সুবল) ও হনুমান (নিত্যানন্দ), হঠাৎবাবু (সুবল বা নিত্যানন্দ) ও মোসাহেব (সুবল বা নিত্যানন্দ), ইত্যাদি। অশোকনগর বাণীপুর লোক-উৎসবে দু'জনে এভাবেই প্রতিবার গিয়ে গিয়ে আনন্দ দিয়ে আসেন বহুরূপী দেখিয়ে। এই লোকোৎসবের উদ্যোক্তা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের দু'জনকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, যথেষ্ট সুযোগও করে দেন। তাই বাণীপুর লোকোৎসবের 'কথা বলতে গিয়ে দু'জনকেই স্মৃতির রোদ্দুরে আলোকিত হ'য়ে উঠতে দেখেছি।

বারাসতের শ্রীনাথ বহুরূপীর গল্প শুনেই এই পেশায় আসার স্বপ্ন দেখছেন অনেকে। কানাইলাল চক্রবর্তীও তাদেরই একজন। সুবলদাস, কানাই চক্রবর্তীকে 'শ্রীনাথের ছাত্রের ছাত্র' বলে উল্লেখ করলেও নিত্যানন্দ বলেন 'কানাইবাবু শ্রীনাথের কাছেও শিক্ষা পেয়েছিলেন।' এই কানাইলালের ছাত্র সুবলদাস বৈরাগ্য ইংলন্ড-রাশিয়া-জার্মান-তাসখন্দে লোকসংস্কৃতির 'বহুরূপী' দেখিয়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। নিত্যানন্দ আন্তরিকভাবেই সুবল-অনুরাগী। জানালেন—'একের পর এক দেশে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব ক'রে এলেন অথচ তার ঘরেই দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না।' ট্রেনে সুবলের সাজপত্র-টাকা পয়সা সব চুরি যাওয়ার পর সুবল ঠিক করেছিল—আর বহুরূপী সাজবেনা। তখন নিত্যানন্দই তাকে বহু উৎসাহ যুগিয়ে আবার পথে নামিয়েছেন। সুবলের স্ত্রীও নিত্যানন্দের মতোই স্বামীকে বহুরূপী সাজতে সেদিন অফুরন্ত সহযোগিতা করেছেন। সুবল গলায় অভিমান ঝরিয়ে বলেছিলেন—'সেবার বিদেশ থেকে ঘুরে আসার পরে প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধী থেকে শুরু ক'রে কত বড়ো বড়ো মানুষজন হাত দু'টো ধরে বললেন—'দেশের গৌরব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে প্রণাম জানাই', কই তারপরেও তো কিছু জুটলো না। সেই ভিক্ষে করেই বেড়াতে হচ্ছে!'

নিত্যানন্দ বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পাননি এখনও। হুগলি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নির্বাচিত বহুরূপী শিল্পী তিনি। এই মাত্র। তেমন উল্লেখযোগ্য কার্ডও নেই। কিন্তু হুগলির পাণ্ডুয়া থেকে বৈঁচির চারাবাগান, ৪৮ বছর ধরে বহুরূপী সেজে চলেছেন নিত্যানন্দ। তার গলাতেই ফুটে ওঠে—"স্বপ্ন দেখতাম সেই ছোটবেলা থেকেই। বাড়ির বাইরে থেকে কেউ যেন আমায় ডাকছে। কারা ডাকছে বুঝতাম না। তারপর একদিন কালীপুজোর রাতে বহুরূপী সেজে বেরিয়েই পড়লাম বাড়ি থেকে। বহুরূপীর কি আর বেশিদিন ঘরে বসে থাকা সাজে? কেউ ডাকলে তো বেরিয়ে পড়তেই হয়। আমারও ডাক এলো, আমিও বেরিয়ে পড়লাম পথে-প্রান্তরে'। তবে এর মাঝে অনেক যন্ত্রণা আছে।

পরের শ্রেণিতে পড়ার মতো বই আর জুটলো না। বৈঁচিতে তখনও স্কুল হয়নি। পড়ার ইতি হ'য়ে গেল ওইখানেই। পৈতৃক ভিটে এটিই। এখানেই বাবা-দাদু ছিলেন। দাদু গুরুদাস মহান্ত প্রতিষ্ঠিত সমাধি আশ্রম। এই আশ্রমে নিত্যসেবা আছে রাধামাধবের। বাবা কানাইলালের পর নিত্যানন্দ মহান্ত সেবাকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। নিত্যানন্দের ২ ছেলে ১ মেয়ে। ছেলে সুভাষ পঞ্চম শ্রেণি এবং বুদ্ধদেব চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। মেয়ে মণিমালা বাড়ির কাজ দেখতেই বেশি ব্যস্ত। বাবার ইচ্ছে থাকলেও ছেলেরা কেউই বহুরূপী সাজে না। একবার

প্রায় জোর করেই বড় ছেলে সুভাষকে কালী সাজানো হয়েছিল। সেতো সাজপোশাক খুলে ফেলে বলেছিল—'এ নির্লজ্জতার কাজ। এ আমার দ্বারা হবে না।' তারপর থেকে সে দোকানে কাজ করে আর বুধদেব এখনও পড়াশোনা করছে। তবে স্ত্রী কল্যাণীর উৎসাহ আছে স্বামী নিত্যানন্দের বহুরূপী দেখানোর ক্ষেত্রে। তিনি এটিকে অসম্মানেরও মনে করেন না। স্ত্রীর সাহচর্য ভিন্ন নিত্যানন্দের পক্ষে বহুরূপী দেখানোই সম্ভব ছিল না।

নিত্যানন্দের দাদু এবং বাবা কীর্তন গান করে বেড়াতেন। কিছু যজমান ছিল তাঁদের। ভাগবতও পাঠ করতেন তাঁরা। সেই সূত্রে নিত্যানন্দেরও ভাগবত এবং গীতার অনেকখানি জানা হ'য়ে আছে। এসবই অনেকটা ভিক্ষার মতোনই।

পড়া ছাড়তেই নিত্যানন্দকে জুতে দেওয়া হল মিষ্টির দোকানে। শুধু কাজ শেখার জন্য খাওয়া-দাওয়ার বিনিময়ে। বিনা বেতনে। পরে অবশ্য পাঁচ টাকা বেতন হয়েছিল। দু'বছর এই পাঁচ টাকা মাইনেতে মিষ্টির দোকানে কাজ করেছেন নিত্যানন্দ। এই সময়ই গাঁয়ে একজন বহুরূপী দেখাতে এলেন। যে দোকানে নিত্যানন্দ কাজ করতেন সেই দোকানেই বহুরূপী বসতেন, চা-টা খেতেন। দেখতে দেখতে আলাপ হয়ে যায় বহুরূপীর সঙ্গে। পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতাও আসে। ছোট্ট বালক মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই বহুরূপীকে অবাক হ'য়ে দেখে, মনে স্বপ্নের ডানা গজায়। কাজ করতে করতে কাজ বন্ধ হয়ে যেতো তখন। মন বসে না কাজে। দোকানের কাজ বন্ধ ক'রে দিয়ে দু'চোখে আলোর ইঙ্গিত ফুটিয়ে বালক দেখতো সেই বহুরূপীর চলাচল-ওঠাবসা-চালচলন।

সেই বৃদ্ধ বহুরূপীর নাম সুরেনচন্দ্র বোস। বাড়ি হাওড়া জেলার সালকিয়ায়। বয়স তখনই ৮০ (আশি)। দেহ জরাজীর্ণ। এখানে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। সাজতেন। সময় পেলেই সেই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ সেসব দেখতেন। দোকানের কাজ বন্ধ ক'রে দিয়ে সেই বহুরূপীর পিছনে পিছনে ঘুরতেন। একদিন নিত্যানন্দ তাকে সাহস ক'রে বলেই ফেল্‌লেন—'দাদু আমাকে একদিন বহুরূপী সাজাবেন?' তিনি বললেন—'কালী সাজবি?' বললাম—'তাই''। কিন্তু সাজ্‌বি সাজ্‌বি বললেও সহজে সাজাননি তিনি।

পরিচয় নিয়ে বাড়িতেই চলে এলেন একদিন। বহুরূপী সাজাবার জন্য মা-বাবার মত্ নিলেন। তারপর অনুরোধ করলেন তার সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দেবার জন্য। বাবা ভিক্ষাজীবী মানুষ। এটাও ভিক্ষারই সমতুল্য। কাজেই বাবা আপত্তি করেননি। তাছাড়া ওর সঙ্গে নিত্যানন্দকে ছেড়ে দিতেও বাবা রাজী ছিলেন। কারণ ভিক্ষে নির্ভর সংসারে যা একপাতা ভাত বাঁচে! কাজেই সহজেই আমাকে পেয়ে গেলেন তিনি।

তারপর নিত্যানন্দ সেই বৃদ্ধ বহুরূপী সুরেনচন্দ্র বোসের সঙ্গে মগরা চলে গেলেন। ৮ মাস তার সঙ্গে থাকলেন বালক নিত্যানন্দ, কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি সাজালেন না তাকে। বালক চলে এলো বাড়ি। কিন্তু সেখানেই বা কী করে। সুতরাং চলো আবার তাঁর কাছে। এবার সুরেন বহুরূপী কিশোর নিত্যানন্দকে নিয়ে চললেন বোলপুরে। সেই বোলপুরেই প্রথম তিনি নিত্যানন্দকে সাজালেন 'নাত্‌নি' আর নিজে সাজলেন 'বুড়ি-ঠাকুমা'। ঠাকুমা বল্‌তে বল্‌তে চলেছে—'ডাগর নাত্‌নি আমার ঘরে থাকছে না গো। কার সঙ্গে নাকি প্রেম করেছে। তা আমি আর রাখতে পারবো না, রেখে আসবো গাঁয়ে।' এসব কথা শুনে নাত্‌নিরূপী

নিত্যানন্দের খুবই লজ্জা লাগতো। কিন্তু তিনি জানতেন লজ্জা-ঘৃণা-ভয়কে জয় করতেহ হবে। পরে অবশ্য তিনিই কালী, হঠাৎবাবু, সিপাহি সাজিয়েছেন। সিপাহির হাফপ্যান্ট, লাঠি আর লালটুপিও তিনিই দিয়েছিলেন। এভাবেই বহুরূপী দেখাতে দেখাতে গুরু সুরেনচন্দ্রের সঙ্গে নিত্যানন্দ গিয়েছেন বোলপুর থেকে গুসকরা, সেখান থেকে নোয়াদারঢাল্-রসুলপুর।

বৈঁচি স্টেশন চত্বরে তখন সবে মাটি পড়ছে। স্টেশন উঁচু করা হচ্ছে যাত্রীদের সুবিধার্থে। ৬/৭ মাস বাদে বাড়িতে আসছেন নিত্যানন্দ। বাড়িতে ছেলের জন্য চিন্তা শুরু হয়েছে। সবাই খুবই চিন্তিত। ছেলেটার কি হলো? থানা-পুলিশও হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যে বাড়িতে এসে হাজির হলেন নিত্যানন্দ। কিন্তু মন তখন পড়ে রয়েছে বহুরূপীতেই। সুরেনচন্দ্র বোস-ই সেসময় একমাত্র প্রিয় মানুষ, উপাস্য দেবতার মতো। সুতরাং ২/৩ দিনের বেশি আরা থাকা গেল না বাড়িতে। ছেলের মতি ঘরের দিকে ফেরাতে বাবাও উঠে পড়ে লেগে মাত্র ২১ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিলেন ছেলের। স্ত্রী কল্যাণী এলেন নিত্যান্দের জীবনে। বাড়লো খরচ। কিছু দিন যেতে না যেতেই বাড়িতে অশান্তি শুরু হলো। আবার মেমারীতে গিয়ে গুরু সুরেন বোসের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। গুরুও দু'হাত বাড়িয়ে ডাক দিলেন—'চলে আয়। আধাআধি বখ্রা'। স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে নিত্যানন্দ চলে যান গুরুর কাছে। অর্ধেক ভাগাভাগিতে বহুরূপী দেখানো শুরু হয়। তখন খুব কষ্ট হতো। স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে দিনের পর দিন, ১৫-২০ দিন ধরে বাইরে থাকা আর বহুরূপী দেখিয়ে রোজগার করা ভালো লাগতোনা নিত্যানন্দের। তিনিও এমন ভাবেননি যে, এইভাবে রোজগার করতে বাধ্য হতে হবে তাকে। বহুরূপী সাজা ছাড়া আর কোনো রোজগারের পথ নেই। ওদিকে দাদুর সঙ্গে আধাআধির কথা হলেও, তিনি কিন্তু কখনোই অর্ধেক দিচ্ছেন না। ৭০ কেজি চাল পেলে দিচ্ছেন ৭ কেজি, ৭০ টাকা পেলে দিচ্ছেন ৭ টাকা। একেবারে দশ ভাগের ভাগ। অথচ টাকার তখন খুবই দরকার। বাড়িতে স্ত্রীকে রাখার জন্য বাবা চাইছেন, স্বামী বাড়িতে না থাকার কারণে স্ত্রীরও হাত খরচার প্রয়োজন পড়ছে। এমন দুঃসময়ে মন বলছে—'না, এভাবে আর নয়'। এবার নিজের মেরুদণ্ডে দাঁড়াতে হবে। পথ চলতে হবে নিজের পায়েই।

গুরুর সঙ্গে একটানা ১০ বছর কাটানোর পর নিত্যানন্দ দাঁড়ালেন এসে পথে। আর কাজ করবেন না গুরুর সঙ্গে। বহুরূপী দেখাবেন না। সাজ-পোশাক কিছু নেই, মেকাপেরও কিছু নেই। অবশেষে পাণ্ডুয়ায় শশিভূষণ স্কুলের সামনে জীবন ঘোষের দোকান 'দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে' ৪৫ টাকা মাসিক বেতনে হালুইকরের কাজ নিলেন নিত্যানন্দ। খাবারের দোকান। তখন বেশ চালু ছিল। এখন উঠে গেছে। ৫-৬ মাস কাজ করার পর সে কাজও ছেড়ে দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ। মন টিকছিলোনা একেবারে।

আবার বাবার আশ্রয়ে। সম্পূর্ণ কর্মহীন নিত্যানন্দ। কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ির খরচ-খরচা নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি—অশান্তি। বাবা পরিষ্কার বলে দিলেন—তিনি বসে বসে কাউকে খেতে দিতে পারবেন না, খেতে দেবেন না। আর কারও বউ পোষার ক্ষমতাও তাঁর নেই। "খুব যন্ত্রণার মধ্যে আছি। রাত্রে ঘুম হয় না। স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা করি। উপায় খুঁজি। তখন একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখি, কেউ একজন আমার মাথার কাছে বসে আমার মাথায় হাত দিয়ে নাড়াচ্ছেন আর বলছেন—'বহুরূপী সাজগে যা'। কোথায় যাবো—'ওই গাঁয়ে

যা'। সাজপোশাক কিছুইতো নেই—'সব হবে'। তখন সেই স্বপ্ন দেখার পরদিনই মায়েব একটা চার আনা ওজনের কানের দুল চুরি করি। সেটাকে বন্ধক রেখে ২০ টাকা পাই। আর ১০ টাকা একজনের কাছে ধার করি। মোট ৩০ টাকা হয়। ত্রিবেণীতে গঙ্গার ঘাটে স্নান ক'রে শ্মশানকালীকে প্রণাম করলাম। তারপর সেই টাকায় অল্প চুড়ি-মালা-ফিতে ইত্যাদি কিনলাম। তখন ফাল্গুন মাস। হোলিখেলা সবে শেষ হয়েছে। অনেক দোকানেই কিছু কিছু রংপত্র থেকে গেছে। সেই সূত্রে দাশুর দোকানে চার আনার 'ম্যাজেণ্ডা' রং কেনা হলো। বহুরূপীর সাজ-পোশাক ওই দিয়েই তৈরি হলো। জোগাড়ও হলো একটা ভাঙা টিনের বাক্স,—তোরঙ্গ। সেই বাক্সে সে সব ঢুকিয়ে চলে গেলাম পাণ্ডুয়া থানার গান্ধীঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের 'জঙ্গলপুর' গ্রাম। গ্রামে ফাল্গুন মাসেব শেষ মঙ্গলবারে মা কালীর পুজো। এই মা কালীর পুজোর দিনেই শুরু করবো বহুরূপী দেখানো। দেখাবো 'খুন-খারাপি'।''

কালীমন্দিরের সামনে গ্রামবাসীর অবসন্ন বিকেল। ইতস্ততঃ ছেলেমেয়েরা ঘোরাফেরা করছে। খেল্‌ছে শিশুরা। এমন সময় রক্তাক্ত বহুরূপী এসে হাজির। কোনো কিছু বুঝবার আগেই সে অনর্গল বলে চলেছে—

''তুমরা সাক্ষী থেকো। অগিন মুড়োল আমাব এই দশা করেছে, আমাকে মেরেছে। আমাকে মেরেছে। আমি অখে পেলে কিন্তু ছাড়বোনা, খুন ক'রে ফেলবো। অর বাড়িতে ঢুকেছিলাম পেটের দায়ে, তা উ আমাকে বাটখারা ছুড়ে মেরেছে, আমার রক্তপাত করেছে''।

কালীতলায় বহু মানুষের চোখের সামনে ধপাস ক'রে পড়ে এক ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে। পিছনে পিছনে মানুষের সারি। একেবারে দিদির বাড়িতে। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করছে বলরামের সম্বন্ধীকে কে মারলো দেখো, ওকে ধরো ডাক্তারখানা নিয়ে যেতে হবে। দেহের রং মুছতে মুছতে বলরামের ঘর থেকে তখন বেরিয়ে আসে নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ বহুবূপী। গালের উপর তখনও লাল রং লেগে। পরের দিন 'কলেজ-স্টুডেন্ট' সাজা হলো, তারপর ক্রমান্বয়ে ক্ষেপি, ফকির, বুড়ি সব সাজা হলো। শেষদিন গোয়ালিনী সেজে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গাঁ-বেড়িয়ে ছ'দিনের মাথায় ৩০ কেজি চাল আর ২০ টাকা পাওয়া গেল। ভগ্নিপতি বলরাম যথেষ্ট সহায়তা করেছে এই সময়। আশ্রয় দিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে। মনোবল ধ'রে রাখতে পথ দেখিয়েছে। মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহস যুগিয়েছে।

তখন পোশাক নেই, সাজ নেই। তাতে কী: যা আছে তাই দিয়েই চলো বহুরূপী সাজি। ওই সম্বল করেই পাশের গ্রাম দাসপুরেও যাওয়া হলো। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেদের টিফিনের পর আর আটকাতে পারেন না মাস্টারমশাইরা। অনুরোধ এলো বহুরূপী দেখাতে হবে। ছেলেদের আটকাতে হবে। দেখালাম। ছেলেরাও থেকে গেল স্কুলে। জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো একটু একটু ক'রে। পর পর পাঁচ দিন দাসপুরে বহুরূপী দেখিয়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ হলো। আলাপ হলো সেখানের প্রধানের সঙ্গেও। প্রধান 'হঠাৎবাবু'র চেয়ার গড়াবার জন্য একটা বাঁশ দিলো। তাতে চেয়ার গড়া হলো। দেখানো হলো 'হঠাৎবাবু'। সবাই খুব প্রশংসা করলো। অনেকে বললো—'গাঁ মাতিয়ে দিয়েছো নিত্যানন্দ'। ''ছ'দিনে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, দিদির শাড়ি প'রে আদায়ে বেরিয়েছি গাঁয়ে। পাওনা হলো ৭০ কেজি চাল, ১৫০ টাকা আর ৪-৫টি শাড়ি। এভাবেই সেখান থেকে আমার বহুরূপীর শুরু। বহুরূপী সেজে সংসার চালানোর সূত্রপাত''।

দিদির বাড়িতেই আশ্রয়। জামাইবাবুর অপার উৎসাহের মধ্যদিয়ে সেই থেকেই বহুরূপী-জীবন নিত্যানন্দের। দিদি-জামাইবাবুকে ধরে তাদের বাড়ি থেকেই প্রতিদিন সকালে বহুরূপী সেজে বেরিয়ে যাওয়া। আশপাশের গ্রাম গুলি প্রায় দেখানো হয়ে গেছে। অনেকদিন বাড়িও যাওয়া হয়নি। বাড়ি যাবার ইচ্ছে হচ্ছে। এমন সময় আর একটি গ্রাম ঠিক হলো। 'শিয়ালাগোড়'। এই গ্রামটিতে দেখিয়েই বাড়ি যাওয়া হবে। অর্থাৎ আর ৬-৭ দিন বাদে। দেখানো শুরুও হয়ে গেছে। এরই ভেতর একদিন চিঠি দিয়ে দুষ্কৃতীরা এক বুড়োকে খুন করে গিয়েছে। তাদের পাশের বাড়িতে পুলিস ক্যাম্প বসলো। পাড়ায় আলোচনা হচ্ছে। বহুরূপীর বিষয়েও কথা হচ্ছে। গ্রামটি দাসপুরের পাশেই। অনেকেই পরিচিত। বহুরূপী সাজা ও দেখানো কিন্তু বন্ধ হয়নি। কেউ কেউ ভাবছে বহুরূপী বোধহয় গোয়েন্দা। অনেকে বহুরূপী বিষয়ে পুলিস ক্যাম্পে খবরও দিয়েছে। ডাক এলো পুলিস ক্যাম্প থেকে। সেদিন কলেজ-স্টুডেন্ট সেজে গ্রামে গিয়েছেন নিত্যানন্দ। গ্রামের লোকের লেখা বহুরূপীর পরিচয় ক্যাম্পে দেখানো হলো। ওরা বিশ্বাস না ক'রে প্রতিদিন দেখা করে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। তখনও কোনো কার্ড নেই, পরিচয় পত্র নেই। ক্যাম্পের সাহেব লিখে দিলেন। ওটি দেখালেই গ্রামে ছাড়। তারপর সেই শিয়ালাগোড়েই 'হঠাৎবাবু' সেজে সবাইকে অবাক ক'রে দেওয়া হলো। নকল পা লাগিয়ে চেয়ার সহ হেঁটে হেঁটে গিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ব'লে যেতে থাকলো বহুরূপী—

'হঠাৎ ক'রে এলেন বাবু, চটাৎ ক'রে চেয়ার পাছায় দিয়ে।
পেটেতে নাই ভবানী, চুল কাটা হলো ত্রিভানী।
গায়েতে কোর্ট প্যান্টালুন আঁটা, চলে এলো বাবুর বেটা ॥'

তারপর পাওনা-গণ্ডা তুলে বাড়ির পথে। অন্য গাঁয়ে। আবার শুরু হয় বহুরূপী দেখানো। পুরাণ-গীতা-ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে বিজ্ঞান-সমাজ-আধুনিকতা যুক্ত ক'রে নানান চরিত্র সৃজন ক'রে চলেছেন তখন নিত্যানন্দ। মনে অফুরন্ত উৎসাহ। এরই মাঝে কিছু মঞ্চের ডাকও পাওয়া গেল, যোগাযোগ গড়ে উঠলো মধুসূদন মঞ্চের 'লোকসংস্কৃতি আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রে'র সঙ্গেও। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি বহুরূপী নিত্যানন্দ মহান্তকে।

প্রায় ৪৫ বছর ধরে বহুরূপী দেখিয়ে চলেছেন নিত্যানন্দ। এখন (২০০০) বয়স ষাট বছর। সুন্দর পরিপাটি ক'রে সাজানো শরীর। পৈতে-কণ্ঠি-নামাবলীতে দোদুল ঝোলান চুলের বিন্যাসে নিত্যানন্দ বেশ পরিচ্ছন্ন। ধুতি পরে থাকেন সব সময়। তবে তার জানা নেই কখন কিভাবে বহুরূপীর উদ্ভব হয়েছে। কোন্‌যুগে কে এর সৃষ্টি করেছে সে সবও নিত্যানন্দের অজানা। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছেন, রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-ভাগবতে বহুরূপীর মতোন বহু চরিত্র আছে। শরৎচন্দ্রের শ্রীনাথ, ছিনাথ বহুরূপীর কথাও তিনি জানেন। 'কৃষ্ণ' চরিত্রটিকে তার বহুরূপী বলেই মনে হয়। গীতার বহু শ্লোক নিত্যানন্দের মুখস্থ, তা তিনি অনর্গল শুনিয়ে যেতেও পারেন। সোমরা বাজারের কাছে কোরোলাতে, বেরুই-এর মোড়ে আর কালনার ২নং ফটকের কাছে কিছু ঝুপড়িবাসী যাযাবর বহুরূপী আছে বলে জানেন নিত্যানন্দ। তবে তাদের সঙ্গে নিত্যানন্দের ব্যক্তিগত কোনো যোগাযোগ নেই। তারাও এক জায়গায় থিতু হ'য়ে থাকে না। আজ এখানে আছে তো কাল অন্যত্র। শুনেছেন নিত্যানন্দ, এদের অনেকেই বীরভূমবাসী এবং পাখমারা যাযাবর সম্প্রদায়ের মানুষ। ওদের ছোটো ছোটো

বাচ্চারা রাম-কালী-হনুমান সেজে ট্রেনে-বাসে-হাটে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। ভালো সাজ-পোশাকও ব্যবহার করতে পারে না। বহুরূপীকে ওরা অনেকটাই জোকারে পরিণত করেছে। সিমেন্টের বস্তা থেকে সুতো বের ক'রে হনুমানের পোশাক তৈরি করে, বাঁশের বাতা দিয়ে ধনুক। ওরা আসলে ভিক্ষুকই। যদিও বহুরূপী পেশাটি অনেকটাই সেইরকম। তথাপি এর উন্নতি চাইলে, মঞ্চে জায়গা পেতে হ'লে, লোকশিল্পীর মর্যাদা অর্জন করতে হ'লে এই উনঞ্ছবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য বহুরূপীকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েই মঞ্চে তুলেছে। ১৯৮৮ সালে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বহুরূপীদের প্রথম রাজ্য সম্মেলন। আসলে আটের দশকের আগে মঞ্চে ওঠেনি বহুরূপী। ওই রাজ্য-সম্মেলনের আগে বহুরূপীদের সেভাবে চোখ চেয়ে দেখেওনি সভ্যসমাজ। অথচ লোকসংস্কৃতির একটি উন্নত বিভাগের পোষক ও প্রচারক হলো এইসব বহুরূপীরা। যদিও এটি কোনো বংশগত পেশা নয়। পেশাটিকে উন্নত ও ব্যতিক্রমী ক'রে তোলার সুযোগও কম। তথাপি বহু দরিদ্র মানুষ এই পেশাটিকে অবলম্বন করেই রুজি-রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছে। নিত্যানন্দের মতোন বহুরূপীরা এই জীবিকাটিকে উন্নত ও আধুনিক ক'রে তোলার জন্য নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। সম্প্রীতি, পরিবার পরিকল্পনা, সাক্ষরতা, বনসৃজন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সরকারী প্রচারের নির্দেশে বহুরূপীও সাজছেন তারা। কথাও বসাচ্ছেন কথার পিঠে। যা কিনা বহুরূপীর মুখ থেকে বেরিয়ে সচেতনতা আনতে সহায়ক হ'য়ে উঠছে অজ্ঞ-অশিক্ষিত সমাজে। নিত্যানন্দের রচনা করা তেমনই দুটো সংলাপ এভাবেই এখানে তুলে আনা যায়—

১. **সম্প্রীতি** :

একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান,
মুসলিম আমার নয়নমণি হিন্দু আমার প্রাণ।
মৃত্যু নয় জীবন চাই এই হলো জনশিক্ষা,
করবোনা আর যুদ্ধ মোরা শিক্ষা নয়কো ভিক্ষা।
শোনো হে কেশব দেখে এইসব
লাগেনা আর ভালো,
সম্প্রীতির শিক্ষা তোমাদের বহুরূপী শেখালো।

২. **সাক্ষরতা** :

আর নয় টিপ্‌ছাপ্, দেখে শুনে করতে হলো সই,
ঠকে ঠকে শিখেছি, আমি আজ আর অত বোকা নই।
গাঁয়ের পাঠশালায় পড়ে শিখেছি নব বর্ণপরিচয়ের অক্ষর,
এখন আমরা হয়েছি সাক্ষর।
লিখ্‌তে-পড়তে-জানতে শিখেছি,
আমরা সাক্ষরতায় পাশ ক'রে বাবু হয়েছি।

নিত্যানন্দের বহুরূপী সাজা দেখে কয়েকজন সমবয়সী এবং কিছু ছোটোরাও বহুরূপীর পাঠ নিতে এসেছিল। তাদের সবারই অবশ্য একটাই লক্ষ্য—রোজগার। জীবনের অন্যত্র

তেমন সুবিধে করতে না পেরে তারা বহুরূপী বৃত্তি গ্রহণ করতে এসেছিল। নিত্যানন্দ অবশ্য সবাইকেই সমান মর্যাদা দিয়ে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু পেশায় তেমন সুবিধে করতে না পারায় অনেকেই এ পথ পরিত্যাগ করেছে। তবে কয়েকজন এখনও থেকে গেছে এ পথেই। তাদের মধ্যে **শিবুদাস বৈরাগ্য** (৪০) ঝাঁপানডাঙা স্টেশনের কাছে বাড়ি, এখন বৈঁচিতেই থাকে, কীর্তন গায় আবার হালুই-এর কাজও করে। সময় পেলেই শিবু বহুরূপীও সাজে। বর্ধমানের নবগ্রামের **বুদ্ধদেব অধিকারী** (৫৫) মাঠে জন-মজুরের কাজ করে, আবার সময়ে সময়ে বহুরূপীও সাজে। হুগলি জেলার মগরার **পঞ্চানন অধিকারী** (৬০) নাবালগ্রামে থাকে এবং বহুরূপীও সাজে। চাঁচায়ের **কৃষ্ণচন্দ্র খাঁড়া** (৫৫) এখন বর্ধমানের চোতখণ্ডে থাকে, সেও বহুরূপী সাজে। **কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী** (৩০) বৈঁচিতে থাকে, সে বেশ ভালো হালুইকর, কাজের ফাঁকে ডাক পেলেই বহুরূপী হ'য়ে সেও বেড়িয়ে পড়ে। বর্ধমানের প্লাটফর্মে থাকতো **অচিন্ত্য দাস** (৪০), সেও বহুরূপী সাজে। এইসব শিষ্যদের অনেক সময় নিজের হাতে সাজিয়ে দেন নিত্যানন্দ। জীবনযুদ্ধে খুঁজে বের ক'রে দেন সহজে চলার পথও। তাই সবারই তিনি বেশ প্রিয়।

গুরুদাস অধিকারী, মহান্ত

রাধাগোবিন্দের আশ্রম ও নিত্যসেবার প্রবর্তন করেছিলেন বৈঁচির চারাবাগানে

এবং গ্রহণ করেছিলেন বৈষ্ণবধর্ম। আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন



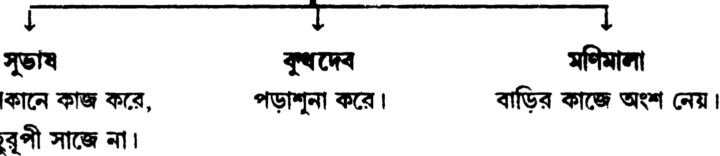
কানাইলাল মহান্ত



নিত্যানন্দ মহান্ত

বহুরূপী, কণ্ঠিধারী, পৈতে পরিহিত, নামাবলী গায়ের সৌম্য-শান্ত সেবক মানুষ





সুভাষ
দোকানে কাজ করে,
বহুরূপী সাজে না।

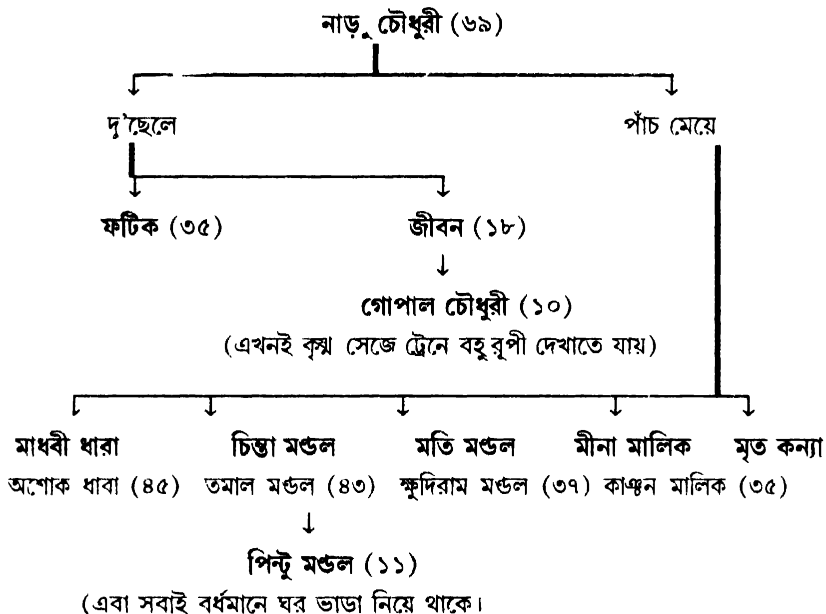
বুদ্ধদেব
পড়াশুনা করে।

মণিমালা
বাড়ির কাজে অংশ নেয়।

নাড়ু চৌধুরী :

বর্ধমান থেকে মেইন লাইনে বৈঁচি স্টেশন। সেখানে নেমে গুড়াপ-কালনার বাস। সঙ্গী বুদ্ধদেব পাত্র আর অভিজিৎ দাস। বুদ্ধদেব বাসের সমস্ত খবর নিয়ে এসেছে। ওদিকে কালনা থেকে এদিকে ফেরবার শেষ বাস পাওয়া যাবে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে। বৈঁচি থেকে বাস চলেছে কালনার দিকে। মন্দিরময় গ্রাম বৈদ্যপুরের ভেতর দিয়ে। আর একটি সুন্দর নামের গ্রাম আছে এই বাসপথে। গ্রামের নাম 'অকালপৌষ'। হয়তো কোনো অকালে এই গ্রামে পৌষের সমৃদ্ধি এসেছিল। সেকারণেই এমন নাম হয়ে থাকতে পারে। গ্রামগুলি বেশ উন্নত। এই বৈদ্যপুরের এক জায়গায় মনসাপুজোর বিখ্যাত মেলা বসে, সেখানে আসে বহুরূপীরা। তবে

বহুরূপীরা এখানে স্থায়ীভাবে থাকে না। আসে ওই কালনা-বৈঁচি থেকে। কালনা এলাকায় বহুরূপীর চল্ শুরু করেছেন নাড়ু চৌধুরী এবং তার পরিবারের শাখা-প্রশাখা। নাড়ু এসেছে বীরভূমের বিষয়পুর থেকে। তার এখনো কোনো কার্ড নেই। কিছু জমি আছে বিষয়পুরে। সেসবে অবশ্য আর তার কোনো অধিকারও নেই। কালনায় জমি কিনে ছোটো বাড়ি করেছে নাড়ু। নাড়ু বহুরূপীর দু'ছেলে আর পাঁচ মেয়ে। ইতিমধ্যেই মারা গেছে একটি মেয়ে। এখন আছে চার জন। জামাইরা, নাতি-নাত্নিরা সবাই বহুরূপী সাজে। বহুরূপী সেজে ট্রেনে-বাসে 'ভিক্ষে' করতে যায়।



দু'বার ঘর চুরি হওয়ার পর নাড়ু চৌধুরী বিষয়পুরের পাট চুকিয়ে কালনায় চলে আসেন। থাকবার তখন কোনো জায়গা নেই। নিরাশ্রয় নাড়ু রেল স্টেশনের পাশে ত্রিপল টানিয়ে থাকতেন আর বহুরূপী দেখাতেন। এ এলাকায় তখন আর কোনো বহুরূপী ছিল না। নাড়ুই কালনা এলাকায় বহুরূপীর জনক। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একাই সেদিন কালনায় এসেছিলেন তিনি। আর কোনোদিন বিষয়পুর যান না অভিমানে। তবে তার স্ত্রী যায়। বছরে একবার।

তারপর হাতে একটু পয়সা হলে মধুবনের অনাথ আশ্রমের কাছে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছেন নাড়ু চৌধুরী ব্যাধ। সেখান থেকেই সংসার বেড়েছে। আস্তে আস্তে বহুরূপী দেখিয়ে আরও কিছু টাকা-পয়সা হাতে এলে নিউ-মধুপুরে খানিকটা জমি কিনেছেন নাড়ু। তারপর সেখানে বাড়ি করেছেন ছোটো ক'রে। এই নিউ-মধুপুরেই এখন শাখায়-প্রশাখায় নাড়ু বহুরূপীর ছড়ানো সংসার। দু'ই ছেলে আর তিন মেয়ে-জামাই তাদের ছেলেপুলে নিয়ে এখানেই বসবাস করে। প্রায় প্রত্যেকেই বহুরূপী দেখায়। এক মেয়ে জামাই তার ছেলেকে

নিয়ে থাকে বর্ধমান শহরে। সেখানেও জামাই তমাল আর নাতি পিন্টু বহুরূপী পেশাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সেখানে তারা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। নিজের বাড়ি এখনও নেই। অন্যসব জামাইরা এখানেই এই নিউ-মধুপুরে থাকে। পুরো পাড়াটিই এখন তাদের, বহুরূপীদের। একসময়ের পাখমারা যাযাবর সম্প্রদায়ের মানুষ নাড়ুর বড়সড় বংশবৃক্ষটি এখন নিউ-মধুপুরে থিতু হয়েছে।

"বিষয়পুরের রাম আমার মামাতো ভাই, দিলীপও মামাতো ভাই, আনন্দ সম্বন্ধী আর সুকুমার হলো ভাইবাভায়ের ছেলে। অশোক চৌধুরী (ধারা) হলো গিয়ে জামাই। সে এখন এখানেই থাকে। ৩৫-৪০ বছর ধরে এ এলাকায় আমিই বহুরূপী করছি। অন্য কেউই তখন এ-লাইনে ছিল না। আজ এসেছে কেউ কেউ। আমাদের সবাই-ই বহুরূপী সাজে। তবে খুব কষ্ট এই বহুরূপীর জীবনে। আনন্দ যা আছে তা সামান্যই। কার্ড-টার্ড কিছুই পাইনি। ভিখিরির জীবন পালন করি মাত্র।" স্মৃতিচর্চা করতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে এসব কথাই বলে চলেছিলেন নাড়ু চৌধুরী বহুরূপী। এখন অবশ্য ছেলেরা-নাতি-নাত্‌নিরা বহুরূপী দেখাতে গেলেও সে আর তেমন যায় না। ঘরেই থাকে। ঘরের দিকটা সামলায়।

কালনা রেলগেটে নেমে গোটা স্টেশনটা দক্ষিণে হেঁটে পেরিয়ে ২নং রেলগেট। স্টেশনের পশ্চিম প্রান্তেই জলা-খেত্‌জমির একটা এলাকা ঘিরে নতুন গড়ে ওঠা পল্লি নিউ-মধুপুর। প্রায় বস্তির মতোনই এলাকা। কোনো ধনী এ-এলাকায় কোনো বড়ো বাড়ি এখনো গড়ে তোলেনি। রাস্তার কোনো সুবিধাই এখনো (২০০৫) আসেনি এ পল্লি পর্যন্ত। সবই আলপথ। জায়গায় জায়গায় জলা আর পার্থেনিয়ামের জঙ্গল। স্টেশনের অবহেলিত পশ্চিম প্রান্তের অনেকটা এলাকাও পার্থেনিয়ামের বন। এই সমস্ত আগাছার জঙ্গল পেরিয়েই একটুকরো নিউ মধুপুর কলোনী। এখানেই কালনা এলাকার সমস্ত বহুরূপীরা থাকে। অধিকাংশ বাড়িই নতুন খল্‌পা দিয়ে তৈরি। আসলে সবে গড়ে উঠ্‌ছে পল্লিটি।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন তেমনি পরিচ্ছন্ন একটি খল্‌পার ঘরে শুয়ে ছিল জীবন। **জীবন চৌধুরী**। নাড়ু বহুরূপীর ছোটো ছেলে। জীবন এখন কালনা এলাকার জনপ্রিয় বহুরূপী। জীবন হনুমান-কৃষ্ণ-ডাকাত-পুতনা রাক্ষসী সবই সাজে। চালা গোছের বাড়ি প্রায় সবগুলিই। চক্‌চকে উঠোনে জবা ফুলের গাছ। একগাছ জবা ফুটে আছে উঠোনে। এদের বাড়ির একটু পূর্বেই **ভাদু চৌধুরী**রা থাকে, তারাও বহুরূপী সাজে। তবে এই দুটি পরিবারের মধ্যে খুব একটা মিল দেখিনি। ভাদু আছে বলেও উল্লেখ করেনি নাড়ু বহুরূপীর সুদীর্ঘ পরিবারের কেউ-ই। আসলে বহুরূপী-ব্যাধেদের মধ্যে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা থাকলেও সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার প্রবণতা কম। নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ-বিবাদ প্রবল। কাটোয়া মহকুমার কালনা-জামালপুর-আখড়া-বিষ্ণুপুর এলাকায় স্থায়ী-অস্থায়ী বহুরূপীরা আছে। নদিয়া জেলার নবদ্বীপ অঞ্চলেও এরাই যায়। সেখানেও অস্থায়ীভাবে থাকে।

নিউ মধুপুরের বাচ্চারা পর্যন্ত বহুরূপী সেজে ট্রেনে-বাসে ভিক্ষে করে। পড়াশোনা করে না কেউ। আমরা পুরো পরিবারের ছবি তুলেছি এখানে। ছবি তোলাতে খুব আগ্রহ ওদের। জামুড়িয়া এলাকার বহুরূপীরা যেমন ক্যামেরা দেখলেই বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছে, এখানের বহুরূপীদের ছেলেমেয়ে সবাই ক্যামেরা দেখেই চুল-শাড়ি সব ঠিক্‌ঠাক করে সামনে এসে

দাঁড়িয়েছে। দুটো ছবিই সম্পূর্ণ বিপরীত। কালনার বহুরূপীদের মেয়েরা জানিয়েছে—'আমাদের অভাব খুব। বহুরূপী দেখিয়ে ভিক্ষে ক'রে সংসার চলে। এখন আর বহুরূপী দেখে কেউ ভিক্ষেও দিতে চায় না। কমদামি সাজ-পোশাক দেখে হাসি-ঠাট্টা করে। এই ছেঁড়া-খোড়া সাজে কি বহুরূপী সাজা হয়? এই কী বহুরূপী হলো? তাই ভিক্ষুক ছাড়া ওদের আর কী বলবে?' নাড়ু চৌধুরী বহুরূপীর মেয়ে **মীনা মালিক** এসবই বলে যাচ্ছিল অভিমান ভরে। সংসার তো আসলে বাড়ির মেয়েদেরই চালাতে হয়। কাজেই ওরাই সঠিকভাবে জানতে-বুঝতে পারে যন্ত্রণাটা ঠিক্ কোন্ জায়গায়? শরীরের কোন্খানে?

ঠিকমতো সাজ কিনতে পারে না কালনার এইসব বহুরূপীরা। ভালো মেক-আপও করতে পারে না। কমদামী পাউডার আর 'কালিঝুলি' মেখে বহুরূপী দেখায়। যে সাজ পরে এখন তারা বহুরূপী দেখায় তা হাসি ঠাট্টা করার মতোনই। 'ওই কি বহুরূপী হলো? তাই ভিক্ষুকই ভাবে সবাই। শিল্প-টিল্প এখানে এখন আর নেই। কোনরকমে ভিক্ষে ক'রে পেট ভরানো মাত্র।'

তবে কালনার বহুরূপীদের আন্তরিকতার কোনো তুলনা হয় না। সকলেই খুব প্রাণখোলা। স্পষ্টকথা স্পষ্ট করেই বলে যায়। তাতে নিজেদের দৈন্যের কথা ধরা পড়লেও তাদের কোনো দুঃখ বা দুশ্চিন্তা নেই। **মাধবী আর মীনা** নাড়ু বহুরূপীর এই দুই মেয়ে, **জীবন আর ফটিক** নাড়ুর দুই ছেলে আর **গোপাল ও পিন্টু** খুবই সঙ্গ দিয়েছিল আমাদের। গোপাল (১০) আর পিন্টু (১১) তৃতীয় প্রজন্মের দুই উচ্ছল বহুরূপী। জীবন সম্পর্কে এখনো কোনো ধ্যান-ধারণাই তাদের নেই। সবসময় খুশিতে ডগ্‌মগ্। তবে ওদের দু'জনেরই পড়তে স্কুলে যেতে ভালো লাগে না। বহুরূপী সেজে ট্রেনে বাসে ঘুরতেই ভালো লাগে। তাতেই ওরা আনন্দ পায়। ভিক্ষে হোক, তবু তো দিনের শেষে কিছু নগদ পয়সা মায়ের হাতে তুলে দিতে পারা যায়।

জীবনের জীবনবোধ গড়ে উঠেছে অনেকটাই। বাবা অসুস্থ, তাদের চিকিৎসার জন্য প্রতিমাসেই কিছু খরচ আছে। সকলেই পৃথক। বাবা থাকে তারই কাছে। তারপর সংসারেও টাকা দিতে হয়। ফটিকের অভিজ্ঞতাও সবক্ষেত্রে সুমধুর নয়। বাসে ক'রে গিয়ে কোনো গ্রামে-শহরে বহুরূপী দেখানোর ক্ষেত্রেও বহু বাধা। 'একে তো কার্ড নেই। পুলিশ এলেই বলি—গরীব মানুষ, ভিক্ষে করে খাই। এইসব কথা বলতে এখন জড়তা আসে জিভে।' জীবন বলে—'বাসে উঠে ভাড়ার ক্ষেত্রে কণ্ডাক্টারকে বলি—'ভিক্ষারী মানুষ দাদা, ভাড়া একটু কম নেন্। নেয়না।' বলে—'মুখে রং মেখে ভণ্ডামী না ক'রে মুনিষ খাটগে।' সত্যি কথা, মুনিষ খাটতে আর পারি না। তবে বহুরূপীর যা অবস্থা, তাতে বোধহয় মুনিষই খাটতে হবে এবার।' মাধবী বলেছিল—'ড্রেস নাই। সিমেন্টের বস্তা ছিঁড়ে হনুমানের পোশাক সেলাই করে দিই। অতো রগড়ের ব্যাপার। এই কি ড্রেস, এ হলো গিয়ে ছেলেখেলা।'

কালনার বহুরূপী পাড়ার অভাবী বহুরূপীদের দাবী—১. ট্রেনে বাসে তাদের বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের সুযোগ ক'রে দেওয়া হোক। ২. বহুরূপী যারা সত্যিই করে, জীবিকা যাদের বহুরূপী, তাদেরকে লাইসেন্স এবং পরিচয় পত্রের কার্ড দেওয়া হোক। ৩. ড্রেস-রং ইত্যাদি কেনার জন্য সরকারী ঋণ বা সাহায্যের ব্যবস্থা করা হোক। ৪. অনুষ্ঠানে পুজোয়-উৎসবে-বহুরূপীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হোক। ৫. যে সমস্ত বহুরূপীদের বাড়িঘর নেই, তাদের বসবাসের জন্য সরকারী ভেস্টের জমির বরাদ্দ-পাট্টা দেওয়া হোক।

কালনার বহুরূপীদের এইসব দাবী ঠিক। বলা বাহুল্য, সরকারের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় এ সমস্ত দাবী বহু বহুরূপীরই পূরণ হয়ে গেছে। তারা জমি, বাড়ি করার অনুদানের টাকা, কার্ড, ভ্রমণের সুযোগ সবই প্রায় পেয়ে গেছেন। বহুরূপী দেখিয়ে কালনার নিউ-মধুপুর কলোনীর বাসীন্দা বহুরূপীদের মতো তারা হতাশও নয়। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় বহুরূপীদের ভেতরই যোগাযোগের একটা অভাব থেকেই গেছে। যে কারণে রচিত হয়েছে দুস্তর ব্যবধান। যে কারণে কালনার সমস্ত বহুরূপীই বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়েছে এইসব সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে। ফলে বিতৃষ্মা আসছে তাদের এই পেশাটির প্রতি। শেষও হয়ে যাচ্ছে লোকসংস্কৃতির এই সম্পন্ন ধারাটি। শিল্পীরা মাঠে-ঘাটে-কলকারখানায় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে কেউ কেউ রিক্সাও চালাচ্ছে।

বৃদ্ধ বনস্পতি তথাপি উৎসাহের আকর হ'য়ে এখনও কালনায় বেঁচে আছেন নাড় বহুরূপী। এখনও নাতি-নাতনি তথা তৃতীয় প্রজন্মের বহুরূপীদের তিনিই শিক্ষাগুরু, ছেলে-জামাই প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রজন্মের বহুরূপীদের শিখিয়ে পড়িয়ে তিনি পথে নামিয়েছেন। তাতে অনেকের সম্মান-প্রতিপত্তিও বেড়েছে। বহুরূপী পেশাটিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেও আনন্দিত নাড় চৌধুরী ব্যাধ। তবে মানুষ যদি তাদের ভিক্ষুকের চেয়ে একটু অন্যভাবে গ্রহণ ক'রে শিল্পী হিসেবে দেখতে পারে, তাহলেই তার আশা পূরণ হয়। বড়ো বড়ো অভিনেতা না হলেও এরাও তো অভিনয় করে, অঙ্গভঙ্গি দেখায়, পাঠ-বক্তব্য বলে।' নাড় বহুরূপীর চাওয়া-পাওয়ার ইস্তাহার খুব বড়ো নয়। আসলে খুবই সাধারণভাবে শিল্পীব সামান্য সম্মান নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকতে চেয়েছে নাড় বহুরূপী। নাড়ুর তো শিল্পী এবং বৃদ্ধ মানুষ হিসেবে বার্ধক্যভাতা পাওয়ারও কথা। আর এটুকু না থাকলে কেনইবা তারা মুখে রং মেখে বাজারে এসে দাঁড়াবে বহুরূপী সেজে?

উচিৎ বেদ :

আসানসোল মহকুমার ফরিদপুর বাসস্ট্যান্ড। একটি বটগাছকে গোল করে ঘিরে বাঁধানো বসবার জায়গা। ফাঁকা রাস্তা। হরদম আসানসোল থেকে মিনিবাস যাতায়াত করছে। কয়লার কালো উড়ছে চারিদিকে। কাল্লা-দোমহানী-বরাবনি-জামুড়িয়া হয়ে সহজেই আসা যায় এখানে। গ্রামে ঢুকতেই রাস্তার বাঁ-পাশে একটি টিউবয়েল। তার সামনেই বিদ্যুতের খুঁটি, ট্রান্সফরমার। একটি স্তম্ভে সেখানে বাঁধানো 'ট্যাবলো'তে লেখা আছে—'ফরিদপুর গ্রামে বিদ্যুতের শুভ উদ্বোধন। উদ্বোধক মাননীয় শ্রীযুক্ত বিকাশ চৌধুরী মহাশয়। সাংসদ, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র। তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৩'। এলাকাটি ই-সি-এলের পরিত্যক্ত কয়লাখনি পরিবেষ্টিত এলাকা। প্রায় প্রতিটি মানুষ এই 'চোরা-কয়লার' সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। বহুরূপীরাও তার থেকে মুক্ত নয়। তারাও দরিদ্র। বহুরূপী দেখিয়ে ভিক্ষে করা ভিন্ন আর কিছু হয় না। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার এই বিস্তীর্ণ এলাকাগুলি প্রায় সবই কয়লা-মাফিয়াদের হাতে। গ্রামে ঢুকতেও লাগে তাদের অনুমতি। অন্যথায় বিপদ চরমে উঠে মৃত্যু পর্যন্ত সামনে এসে দাঁড়াতে পারে। কারণ আগ্নেয়াস্ত্র এখানে মুড়িমুড়কির মতো সহজলভ্য। আমি নিজেও ক্যামেরা খুইয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে কোনপ্রকারে এই গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। যদিও সে অন্য কথা।

বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি কয়লার গুঁড়ো মাখা পথ একটি পরিত্যক্ত রেললাইনকে অতিক্রম ক'রে সোজা পশ্চিমে গ্রামের ভেতরে ঢুকে গেছে। এই রাস্তাটির দু'পাশেই শুধু বাড়ি। সেইটিই ফরিদপুর গ্রাম। নেমে যাওয়া পথটি যেখানে শেষ হচ্ছে সেটিই বহুরূপীদের পাড়া, নামোপাড়া। তারও পশ্চিমে পরিত্যক্ত কয়লাখনি। কয়লা তোলা চলছে নিয়মিতই। অবশ্যই সরকারি হিসেবে এসব খনিব কোনো ঠিকানা নেই। তোলা কয়লা সাইকেলের পিছনে বস্তা বাঁধা অবস্থায় বা মাঝে ভাঁজ হয়ে খুলে যাওয়া গোবুর গাড়িতে ডাঁই হয়ে চলে যাচ্ছে চোরা পথে। অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে। তবে সেই পথটি বহুরূপীদের বাড়ির সামনে দিয়েই। পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করার মুখেই উচিৎ বেদ-এর বাড়ি। একতলা পাকা। বাইরে বাউন্ডারী ওয়াল নেই। আছে অযত্নে বড় হয়ে ওঠা কিছু গাছপালা। জায়গাটি অবশ্য যথেষ্টই সুন্দর। দূরে বৃদ্ধ বটগাছের ছায়ায় শ্রমিকেরা ঘোরাফেরা করছে, শুয়ে-বসে আছে।

এ গ্রামে ঢুকতেই দেখেছি অজস্র চোরা চোখের চাহনি। তারা সবসময় লক্ষ্য রেখেছে আমাকে। তাদের ধারণা এইরকম মানুষজন ক্যামেরা নিয়ে এসে ছবি তোলে, আর ফিরে গিয়ে চোরাই কয়লার কথা লেখে। এ কারণেই বাইরের কোনো লোক গ্রামে এলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। চোখে চোখে রাখা হয়। খবর পৌঁছে যায় 'দাদাদের' কাছে। প্রয়োজনে তাদের ব্যবস্থাও নেয় দাদারা। তবে কয়লা সম্পর্কীত কোনো কথা আলোচনা না করলে তাদের তেমন কোনো আপত্তি থাকে না। তবু জিজ্ঞাসাবাদের শিকার হতেই হয়। অবশ্য তাতে আপত্তি করা চলবে না। বিপত্তি আসতে পারে।

উচিৎ বেদের বয়স ৬২। উচিৎ বেদ তার ঠাকুরদাদার আমল থেকে বহুরূপী সেজে আসছে। তার সবচেয়ে পছন্দের নির্মাণ হল রঘু ডাকাত। এই রঘু ডাকাতের এলাকা ছিল কলকাতার কাশীপুর অঞ্চল। ওই অঞ্চলে রঘু ডাকাতের অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে এবং জড়িয়ে আছে। উচিতের মেজো ভাই **ধনজিৎ** এবং ধনজিতের এক ছেলে **অমরজিৎ**ও বহুরূপী সাজে। অন্য ভাই বা ভাইপোরা বহুরূপী সাজে না। উচিতের তিন ছেলে রামরতন, নিখিল আর ছোটো হলো জানালা। তিন জনেই বহুরূপীর কাজ করে, অন্য কাজও করে। তবে বড় ছেলে রামরতনই এলাকার জনপ্রিয় বহুরূপী। এই ফরিদপুর এলাকায় বহুরূপীর জনক হলো উচিৎ বেদ। তার বহুরূপীর শিক্ষা দাদুর কাছে, দাদুর আহ্বানেই। তিনপুরুষ থেকে তারা এই ফরিদপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তবে পাকা বাড়ি হয়েছে উচিৎ বেদের আমলেই। গ্রাম-ফরিদপুর, মৌজা-শ্যামসুন্দরপুর, ডাকঘর-চরণপুর, থানা-বরাবনি, মহকুমা-আসানসোল, জেলা-বর্ধমান। রুক্ষ এই ফবিদপুর এলাকায় এখনো তাঁবু খাটিয়ে বহু যাযাবর মানুষ বসবাস করছেন। উচিৎ বেদের পূর্বপুরুষও বোধহয় সেইভাবে থাকতে থাকতেই ঘর গড়েছেন। এলাকাব মূল স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন। তবে বহুরূপী দেখানো গিয়েছে অনেক কমে। জীবিকার দিশামুখ বদল হ'তে চলেছে ফরিদপুর এলাকায়। উচিৎ বেদের নাতিরা হয়তো আর কোনদিনই বহুরূপী সাজবেনা।

উচিৎ বেদের বড় ছেলে রামরতন বেদ। এখানের ভোটারলিস্টে 'বেদ' পরিবারের নাম উঠেছে অনেক আগেই। রামরতনেরও উঠেছে—

'বেদ বামরতন (28), WB/38/258/492642, তা-8/2/96
258 বরাবনি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র।'

রামরতনের ১৯৯৩ সালে করা বহুরূপীর লাইসেন্সও ছিল, কিন্তু গলসিতে গিয়ে বহুরূপী দেখানোর সময় হারিয়ে গেছে সেটি। তারপর আর করা হয়ে ওঠেনি। রামরতন ১২ রকমের সাজ সাজে। তবে রাবণের ড্রেসের দাম সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০০ টাকা হওয়ার জন্য তৈরি করতে পারছেন না। সরকারী কোনো সুযোগ-সুবিধার তিলক ফোঁটাও জোটেনি উচিৎ বেদ বা রামরতনদের কপালে। তাই পেটের জন্য তাদের অনেক কিছুই করতে হয়।

ছোট্ট গ্রাম ফরিদপুর। ৭০/৮০ ঘর মানুষের বাস। পুরো গ্রামটিই কয়লা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। প্রায় মানুষের চোখে মুখেই অপরাধীর ছায়া। কিন্তু উপায় কোথায় এছাড়া। খাওয়া-পরা চলবে কোত্থেকে? সরকারী খনিগুলি সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকার বিপজ্জনক বিবেচনা ক'রে খনিগুলিকে বাতিল ঘোষণা করেছে। মানুষ পেটের জন্য সবই করতে পারছে। সেই বিপজ্জনক খনিগুলি থেকে প্রচুর কয়লা তোলাচ্ছে কয়লা-মাফিয়ারা। সবাই জানে এটা বে-আইনি। কিন্তু অভাবী গরীব-গুর্বো মানুষজনেরা সে পথেই খুঁজে পেয়েছে জীবন ও জীবিকার রসদ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়লা উঠছে। কখনো-সখনো খনির অন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে বহু শ্রমিক। প্রাণের মূল্য এখানে অনেক কম। কাজেই মৃত্যুতেই শেষ হয় না কয়লা তোলা। একজন মরলে বহুজন আসে। সাইকেলে গাড়িতে সেই কয়লা চলে যায় দূরে, গ্রাম থেকে গ্রামে। এই কাজে একজন শ্রমিক মোটামুটি স্বাভাবিক পরিশ্রম করেই ২৫০/৩০০ টাকা রোজগার করতে পারে প্রতিদিন। এখানের বহুরূপীরা তাই বহুরূপী দেখিয়ে ভিক্ষে করার চেয়ে. কম পরিশ্রমের এই কালো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে স্বাভাবিকভাবেই। শিল্পের চেয়ে জীবন সবসময়ই বড়ো। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়েও এইসব কাজে যুক্ত হয়ে পড়ছে দরিদ্র মানুষ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মারাও যাচ্ছে। তথাপি কয়লা উঠছে জীবনের জন্যই।

এইসব দেখে শুনে ছবি তুলে যখন গ্রামের বাইরে এসে সেই বটতলার বাঁধানো জায়গায় বসেছি মিনি বাসের জন্য। তখনই হঠাৎ যমদূতের মতো দুজন লোক লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে আমার মুখের কাছে এসে থামলো। তারপর মোটর সাইকেল থেকে নেমে আমার কোনোকিছু বুঝবার আগেই আমার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ক্যামেরাটি বের করে নিলো। তারপর বলল—'আপনি সাংবাদিক, কয়লার ছবি তুলেছেন, চলুন আমাদের অফিসে।' সবিনয়ে জানালাম—'আমি সাংবাদিক নই, কয়লার ছবি তুলিনি, বহুরূপীদের ছবি তুলেছি।' বিশ্বাস করলো না, আমার ব্যাগ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে ওদের সঙ্গে যেতে নির্দেশ করলো, মেরে ফেলার হুমকিও দিল। গেলাম ওদের সঙ্গে। অল্প কয়লা থাকা একটি দু'ভাঁজ গাড়ির কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। গাড়িটি দেখিয়ে ওরা আমাকে বলল—'এই গাড়ির ছবি তুলেছেন?' বললাম—'এমন অদ্ভুত গাড়ি আমাদের ওদিকে নেই, তাই ছবি তুলেছি।' আমার নির্ভয় সত্যস্বীকার দেখে ওরা কেমন একটু গুটিয়ে গেল। তাবপর বলল—একজন দাদা 'এ গাঁয়ে আসবেন, আমাকে একটু খবর দেবেন না, জানেন আপনার কি হতে পারে?' না, সত্যিই জানি না। বহুরূপীদের খোঁজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাই কোথাও এমন পরিস্থিতি হয় না। আর পশ্চিমবঙ্গের কোনো গ্রামে ঢুকতে কারও অনুমতি নিতে হয় সেও আমার জানা ছিল না। আমার জানা আছে ভারতবর্ষের যে কোনও ভূ-খণ্ডে যে কোনো অধিবাসী যেতে পারেন। যাইহোক সেদিন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি, জীবনের অভিজ্ঞতার অনেক সঞ্চয়ও বেড়েছে।

ওরাও শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি, বরং আপ্যায়ণ করেছে টিফিন খাইয়ে। বলেছে—'এছাড়া আমাদের কোনও উপায় নেই, আমরা খাবো কী করে?' ভারতবর্ষের সব মানুষ কিভাবে খাওয়া-পরা করে সব আমার জানার কথা নয়। জানিও না। তবে এটুকু জানি বহুমানুষই ভালোভাবে জীবনযাপন করে, পরিশ্রম ক'রে সুস্থ পথেই জীবিকা নির্বাহ করে। সেদিন কিন্তু ওদের হাত থেকে বহুরূপীরা আমাকে বাঁচাতে পারেনি। আমাকেই বাঁচতে হয়েছে বুদ্ধিচর্চা ক'রে। ওইসব মানুষগুলোর দুঃখকথাও শুনেছি। শুনে যে আপ্লুত হইনি, তাও নয়। ভেবেছি এসব নিয়েই ভারতবর্ষ, আমার জন্মভূমি! সবশেষে বুঝেছি, এখানে থাকতে গেলে এদের সঙ্গে সহাবস্থানেই থাকতে হবে। বহুরূপীরাও সে পথই বেছে নিয়েছে।

রুক্ষতার ভেতর দিয়েও নামোপাড়ার একটি অপূর্ব সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ছিল, আমি উচিৎ বেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে সব লক্ষ্য করছিলাম। উন্মনা হয়ে পড়ছিলাম। উচিৎ বেদ আগে নাটক করেছেন, যাযাবরের জীবনযাপন করেছেন। এখন অবশ্য তার ভাষায় 'লোকাল' হয়ে পড়েছেন। আগে অসুবিধা হতো, এখন আর হয় না। এই এলাকাটি মুসলমান প্রধান। মুসলমানদের সঙ্গেই বহুরূপী 'বেদ'দের সর্বক্ষণের ওঠাবসা। তারাই বিপদে-আপদে বহুরূপীদের পাশে এসে দাঁড়ায়। উচিৎবেদ বহুরূপীর ইতিহাস আর 'বেদ'দের প্রাচীনকথা শুনিয়ে যাচ্ছিলেন আমাকে। তবে এখানে কোনো মুসলমান বহুরপী নেই।

'রামায়ণে' বিনাদোষে সুগ্রীবের পক্ষ নিয়ে রাম আড়াল থেকে তির মেরে বালি রাজাকে বধ করেছিলেন। এই হত্যা হয়েছিল সম্পূর্ণ বিনা দোষে। তাই সেদিনই নির্দেশ হয়েছিল—এর জন্য রামকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, শাস্তি পেতে হবে। সেই কারণেই গাছের ডালে বসা কৃষ্ণকে শিকারী ব্যাধ সাতনলা দিয়ে ফুঁড়ে দিলো, কৃষ্ণও পড়ে গেল। সেই অসুস্থতাতেই কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল। যে রাম সেইতো কৃষ্ণ। কৃষ্ণ এই শাস্তি পেয়েছিল বালি রাজাকে বিনাদোষে হত্যা করার জন্য। আমরা 'বেদ'রা ওই বালি রাজার বংশধর। আমাদেরই পূর্বপুরুষ শাস্তি দিয়েছিল কৃষ্ণকে। কিন্তু এ শাস্তি তো উঁনি পেয়েছিলেন নিজেরই দোষের কারণে। তাই 'বেদ'দের আর কোনো শাস্তি হয়নি। তারা আশীর্বাদ পেয়েছিল শাস্তির পরিবর্তে—'তোমরা যেখানে যতো জীবই মারো তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না, তোমরা শাস্তি পাবে না। জীব-জন্তু-পাখি শিকারই হবে তোমাদের জীবিকা।' সেই থেকেই আমরা যাযাবর 'বেদ' 'ব্যাধ'। শিকারই আমাদের জীবিকার মূলকথা'।

উচিৎ বেদ অনেক কথা জানেন। গল্প ক'রে সেসব বলতেও তাকে বেশ সপ্রতিভ দেখেছি। তিনিই বলে যাচ্ছিলেন কথা, শুনছিলাম আমি। বাধ্য শ্রোতা।

'বালিরাজ ছিলেন 'বেদ'। তিনি শিবের ভক্তও ছিলেন। একবার শিকার করতে গিয়ে গভীর অরণ্যের মধ্যে তাঁর রাত্রি হয়ে গেছে। সেদিন ছিল একাদশী তিথি। চারিদিকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের চিৎকার। যমদূতরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে বালিরাজ একটি গাছে উঠে পড়েছিলেন। যে গাছটিতে তিনি উঠেছিলেন সেটি ছিল একটি বেলগাছ। আর সেই বেলগাছের নীচে বহুকাল থেকেই ঘুমিয়েছিল একটি শিবলিঙ্গ। বালিরাজ বেলগাছে উঠতেই একটি বেলপাতা নীচের সেই শিবলিঙ্গের উপর পড়লো। জেগে উঠলো শিব। দীর্ঘদিন পর পুজো পেয়ে তিনি আনন্দিত। ভাবলেন এই আমার ভক্ত। এমন সময় যমদূতরা এলো বালিরাজকে মারতে, তাদের সঙ্গে শিবের অনুচর ভূত-প্রেতদের প্রচুর

গণ্ডগোল-মারামারি হলো। যমদূতরা শেষে হেরে গেল। তখন শিব বললেন যমকে—'আমার বেদ-দের উপর তোমার কোনো অধিকার নেই, বেদ জাতি আমার ভক্ত।' সেই থেকেই, সেই বালিরাজের বংশধর হিসেবে বেদ বা ব্যাধরা শিবের সেবক। আমার বাড়িতেও শিবের অনেক ছবি আছে। আমরা শিবরাত্রিতেও শিবের পুজো করি।'

মহাভারতে জরা ব্যাধ তির মেরেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পায়ে। তার ভ্রম হয়েছিল। পা'টিকে পাখি মনে করেছিলেন তিনি। কিন্তু অনেক ব্যাধ-পাখমারারা সাতনলা দিয়ে কৃষ্ণের পায়ে মারার কথা উল্লেখ করেন। উচিৎ বেদও সাতনলা বলেছেন, তির বলেননি। তবে সবক্ষেত্রেই তারা ওই ব্যাধের বংশধর বলেই উল্লেখ করেন।

আসানসোল থেকে কাল্লা-দোমহানী গেছিলাম আমরা মে-মাসের শেষদিকে। সেখানে তখন ভীষণ জলকষ্ট। পানীয় জলের বেশ সমস্যা। মাটি থেকে খাল ক'রে পাইপের জল তুলে আনছেন এলাকার মহিলারা। পাইপের মুখে কলসী লাগিয়ে জল ভরছেন সকলে। প্রচুর ভিড়ও সেখানে।

দোমহানী মোটামুটি গঞ্জ-শহর। ছোট একটি রেল স্টেশনও আছে। এখানের স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে গল্প করছিলাম বহুরূপী-পাখমারাদের বিষয়ে। সেখানে জুতো পালিশ করছিল সুবল বাগ্দি, সেই শোনালো—'এখানে প্রায় প্রতিদিনই পাখমারারা আসে। দোমাহানীর বাইরে ওই ডাঙায় থাকে ঝুপড়ি ক'রে। থাকেও অনেকদিন। তবে এক জায়গায় ওরা চিরদিন থাকে না। এখানের মানুষজন ওদের বলে 'শিয়ালমারা'। যাযাবর জীবন ওদের। যে ক'দিন ভালো লাগলো থাকলো, না লাগলো উঠে চলে গেল অন্য কোথাও। এই 'শিয়ালমারা'রা কিন্তু এখানে কেউ বহুরূপী সাজে না। খরগোস-ইঁদুর-খট্টাশ-পাখি ইত্যাদি ধ'রে মেরে শিকার ক'রে খায়। ওদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা বাজারে চেয়ে-মেগে বেড়ায়। তবে কারোর কিছু চুরি করে না।' পাশের মিষ্টির দোকানের কর্মী কাপ-ডিস ধুতে এসে ওর কথা শুনে ঝাঁজিয়ে বলে উঠল—'তু-সব জানিস? চুরি করেনা বলছিস। সব ক'রে। এলাকার নানান অসামাজিক কাজের সঙ্গেই ওরা এখন যুক্ত। বন্ধ হ'য়ে যাওয়া খনি থেকে কয়লাও তোলে।' লোকটির ঝাঁজালো কথা শুনে চুপ করে যায় সুবল বাগ্দি। আমি লক্ষ্য করি অভাবী সুবলের মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল। আর একজন মন্তব্য করলেন ইতিমধ্যেই 'সত্যি কথা বলবে কি ক'রে? শিয়ালমারাদের সঙ্গে ওদেরই যে উঠ্‌বোস বেশি।'

দোমহানী বাজারেই বরাবনি থানা, পুলিশ স্টেশন। থানার সামনের রাস্তা দিয়েই ফরিদপুর যাওয়া যায়। মিনিবাস আর ট্রেকার সবসময় চলছে। ওখানেই একটি চায়ের দোকানে বসে জেনে নিয়েছিলাম এলাকার বহুরূপীদের ঠাঁই-ঠিকানা। ফরিদপুরে ৮/১০ ঘর আদিবাসী বহুরূপী আছে। ফরিদপুর থেকে জামুড়িয়া বেশ কাছে। সেখানের বোরিংডাঙায় ১৫/১৬ ঘর যাযাবর পাখ্‌মারাদের বাস, তারাও কেউ কেউ বহুরূপী সাজে। 'তবে দেখবেন—ভুল করেও 'গুল্‌গুলিয়া' বলবেন না, ওটা শুনলেই ওরা খুব রেগে যায়। ওদের সম্মানে লাগে।' চায়ের দোকানদার আমাকে অনেক বিষয়ে বুঝিয়ে ছিলেন এলাকার আদিবাসী যাযাবরদের বিষয়ে। আমিও বুঝেছিলাম। কিন্তু আমাকে কোনোক্রমেই কয়লাকেন্দ্রিক বিপদের কথাগুলি বলেনি কেন, সে বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। বিষয়টি সম্পর্কে আমার কাছে আগাম খবর থাকলে আমি সচেতন হতে পারতাম। হয়তো অন্যভাবে আমার পরিকল্পনা রচিত হতো।

দোমহানী থেকেই একটি পথ চুরুলিয়ার দিকে চলে গেছে। এই চুরুলিয়াতেই জন্মেছিলেন দুখু মিঞা, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। জামুড়িয়া এলাকাকে কেন্দ্র করে বহু

যাযাবর-পাখমারা-শিয়ালমারারা বাস করে, যাদের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যক সাজে বহুরূপী। এদের অধিকাংশই ঝাড়খণ্ড-বিহারের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সমতলে নেমে আসা মানুষজন। ওইভাবেই হয়তো উচিৎ বেদরাও এসেছিল। তারপর এখন বাড়ি ক'রে স্থায়ী হয়েছেন। আসানসোল থেকে মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যে জামুড়িয়া-দোমহানী এলাকার যে কোনো যাযাবর—বহুরূপীর ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া যায়। তবে ওদের সঙ্গে দেখা হওয়া আর কথা বলতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

জামুড়িয়া সিনেমা হল মোড়ে নেমে, হল পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেই স্টেট ব্যাঙ্ক। তারই ডানদিকে মোরাম মাটির পথ চলে গেছে দামোদরপুর, পাখমারাদের পাড়া। সেখানের সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ **গোপাল বেদ** (৬৮) এক সময় যথেষ্ট বহুরূপী দেখিয়ে বেড়িয়েছেন। এখন দু'চোখ অন্ধ। এক নাতি আর একটি লাঠিই এখন সর্বক্ষণের সঙ্গী। অন্ধ-বৃদ্ধ বটগাছের নীচে বসে আস্তে আস্তে বলে চললো—'এখানের অনেকেই একসময় বহুরূপী সাজতো, কিন্তু বহুরূপী সেজে কেউ কিছু পায়নি। ও করে পেটও ভরছে না। তাই অভিমানে এই যাযাবর-পাখমারা-গুলগুলিয়ারা আর বহুরূপী সাজছে না। বহুরূপী সাজতে ওদের কারোরই আর ভালোলাগছে না।' তাই এখানের বহুরূপী পেশাকে বিসর্জন দিয়ে তারা কয়লা খাদানে-হোটেলে-চায়ের দোকানে কাজ নিয়েছে। কেউ কেউ যুক্ত হয়েছে কৃষিকাজে। কেউ আবার রিক্সাও চালাচ্ছে। অবশ্য কেউই পড়াশোনা করে না। খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত ক'রে চলেছে দামোদরপুরের এই 'বেদ' সম্প্রদায়। কেউ-ই কার্ড পায়নি, পায়নি পঞ্চায়েত থেকে সামান্য সহায়তাও। তাই বিতৃষ্ণা এসেছে বহুরূপী পেশাটির প্রতি।

একটি বটগাছকে ঘিরে এদের বাস দামোদরপুরে। মাঝে বটগাছ, চারদিকে গোল ক'রে ঝুপড়ি বাড়ি। দুটি টালির বাড়িও আছে। আছে ত্রিপল আঁটানো অস্থায়ী চালাও। ত্রিপলের চালাই আছে ২১টি। বটগাছের ডাল থেকে ঝুলছে দড়ির 'শিকে', জিনিসপত্র রাখবার জায়গা। তাতে খাবারের হাঁড়ি মাটির মালসা যেমন ঝুলছে, তেমনি ঝুলছে ছোটো ছোটো শিশুরাও। বটগাছটিই যেন 'বেদ'-দের সংসার, সংসারের রক্ষক—আটন। বড় বিচিত্র এই জীবন। এখানের 'বেদ'রা অবশ্য বহুরূপী বিষয়ে কোনো কথা বলতেই আগ্রহী নয়। এর আগে আগে নাকি অনেকে তাদের কাছে এসেছিল—'এই পাবি, সেই পাবি' বলেও গেছিল, কিন্তু কিছুই তারা পায়নি। তাই তারা বহুরূপী বিষয়ে কথা বলতে নারাজ।

গোপাল বেদই দামোদরপুরের জ্যেষ্ঠজন। সে নিজে একসময় কালী-মহীরাবণ-ক্ষেপি-রাক্ষস-ডাকাত-হরিশ্চন্দ্র সব সাজতো। ৪০ বছর ধরে বহুরূপী করেও কার্ড-জমি-পেনসন কিছুই পায়নি গোপাল। এখন অন্ধ, হাঁপানিতেও অসুস্থ। চিকিৎসা করার মতো কোনো সামর্থই নেই। স্ত্রী সত্যবতী বেদ (৫৩) ও অসুস্থ। দুই ছেলে, তিন মেয়ে গোপালের। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। সোমরায় থাকে বড় মেয়ে। বড় জামাই ভূষণ বেদ বহুরূপী করে। সেও জমি বা কার্ড কিছুই পায়নি। **গোপালের** বড় ছেলে **মৃত্যুঞ্জয়** বেদ খানিকটা পড়াশোনা করেছে, ছোটো ছেলে **কোকিল** স্কুলে যায়নি। তবে দু'জনেই বহুরূপী করে। একসময় বর্ধমান জেলার উখরাতে নিজের বাড়ি ছিল গোপালের, এখন সেসব নেই। দামোদরপুরে এটা শ্বশুরবাড়ি, এখন জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এখানেই থাকে গোপাল। জামুড়িয়া থানার কাছে সামনে দিয়ে আর একটি রাস্তা। এই রাস্তায় অল্প কিছু দূর গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে যেতে হয় বোরিংডাঙা।

সেখানেও একটি বটগাছকে কেন্দ্র ক'রে কয়েক ঘর যাযাবর পাখমারাদের বাস। ফাঁকা মাঠে ত্রিপলের কালো তাঁবু। সেই তাঁবুর ভেতর তাদের সংসার। ১০/১২ ঘর আছে তারা। সারাদিন শুদু 'কাঁচি' মদ খেয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে জীবন। পৃথিবীর কোনো খবরই তাদের কাছে নেই। একদা এদেরই কেউ কেউ বহুরূপী সাজতো। এখন আর কেউ-ই তা সাজে না।

আসানসোল মহকুমার জামুড়িয়া-দামোদরপুর-বোরিংডাঙা-ফরিদপুর-কান্না-দোমহানী-বরাবনি প্রভৃতি এলাকায় পাখমারা সম্প্রদায়ের বহু মানুষের আসা-যাওয়া আছে। তারা সময়ে-সুযোগে এখানে আসে, আবার চলেও যায়। উচিৎ বেদ, রামরতন বেদ, অমরজিৎ বেদ, ধনজিৎ বেদদের মতো কিছু মানুষ এলাকার মূলস্রোতে মিশে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থায়ী পাকা বাড়িও করে ফেলেছে। কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই কম।

অবশ্য স্থায়ীত্ব বা যাযাবরত্ব যেটিকেই বরণ ক'রে নেওয়া হোক না কেন, বহুরূপীর মৃত্যুই হয়েছে এ এলাকায়। খুবই কমজন বহুরূপী দেখান এখন। সেও হাতের কাছে অন্য কাজ না থাকলে। তথাপি এই এলাকায় বহুরূপীর জনক হলেন উচিৎ বেদ, তিনিই এখনো নিজেকে বহুরূপী হিসেবে গর্ববোধ করেন। নিজেকে বালিরাজের বংশধর এবং কৃষ্ণ হত্যাকারী ব্যাধের উত্তরপ্রজন্ম ভাবতেও তার গর্বের সীমা নেই।

কমল বিশ্বাস (রায়) :

গঙ্গা-ভাগীরথীর সেতুবন্ধনে বাঁধা আছে বহরমপুর আর খাগরাঘাট রেলস্টেশন। বাসের রাস্তায় 'এন-এইচ-৩৪' নং পথটি এই সেতুর উপর দিয়েই চলে গেছে উত্তরবঙ্গের দিকে। ফরাক্কায় আবার পেরোচ্ছে সেই গঙ্গা-ভাগীরথী-পদ্মাকেই। তারপর মালদহ হ'য়ে পাহাড়ের দেশে চলে গেছে পথ। মানুষের জীবনে পথের মূল্য অনেক। পথই মানুষকে বাইরে নিয়ে যায়, দূরের সন্ধানী ক'রে তোলে। ঘর ও বাইরের মেলবন্ধন ঘটায়। এই পথ ধরেই মানুষের সারি চলে যায় জীবনের স্রোতধারা অবলম্বন ক'রে জীবনপথের শেষ বাঁকে। তাছাড়াও গঙ্গা-ভাগীরথী হিন্দুদের কাছে পবিত্র নদী। মৃত্যুর পর এই গঙ্গায় তার দেহ দাহ এবং কুণ্ডলী বা ভস্ম বিসর্জন না হলে পরিবারের প্রিয়জনদের সন্তুষ্টি আসে না। অনেকে আবার 'জ্ঞানগঙ্গা' প্রার্থনা ক'রে মৃত্যু সমাগত ভেবে গঙ্গাতীরে এসেই বসবাস শুরু করতেন। মহালয়ার পিতৃতর্পণের তিথিতেও এই গঙ্গানদীর দু'পারেই অজস্র মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো।

আসলে পশ্চিমবঙ্গে এখনো গঙ্গা-ভাগীরথী শুধুমাত্র একটি নদীই নয়, তারও চেয়ে বেশি 'মা-গঙ্গা'র মতো। এই মা তাবৎ সন্তান-সন্ততিকে পবিত্র করে, শুদ্ধ ক'রে তোলে এবং পাপীর পাপ হরণ ক'রে পুনরায় তাকে জনগণের মূল স্রোতে সামিল ক'রে তোলে। এই বিশ্বাস বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রায় সমস্ত মানুষজনেরই। তাছাড়াও গঙ্গা-ভাগীরথীকে অবলম্বন ক'রে কত শিল্প গড়ে উঠেছে এরাজ্যে, কত দরিদ্র মানুষ এর বুকে নৌকো বেয়ে মাছ ধরে মাটির জিনিসপত্র বানিয়ে কতভাবে জীবন-যাপন ক'রে চলেছে। সেই অর্থে গঙ্গা-ভাগীরথী এ রাজ্যের প্রাণ-প্রবাহিনী, এ রাজ্যের খেত-জননী। পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে বয়ে আসা বহু নদ-নদী এই ভাগীরথীতেই আপন অস্তিত্ব হারিয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠেছে। রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে গঙ্গানদী ফরাক্কায়

এসেছে নেমে, করেছে বাংলায় পদার্পণ। তারপর পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে প্রধান শাখাটি, আর ভাগীরথী হয়ে বহরমপুরের ভেতর দিয়ে বয়ে এসেছে অন্য শাখাটি। এই নদীর উপরেই বহরমপুরে ব্রিজ। জাতীয় সড়কে সেতু। এই সেতুতে ওঠার মুখেই বহরমপুর ঢোকার পথে 'উত্তরপাড়া মোড়', সেখানে বাস থামে। অবশ্য সব বাস থামে না। কণ্ডাকটরকে অনুরোধ করতে হয়। তারপর উত্তরপাড়া মোড়ে নেমে সোজা দক্ষিণের পিচ্‌ঢালা পথ। রিক্সা-অটো-ট্রেকার আছে। হেঁটেও যাওয়া যায়। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যেই 'বসন্ততলা'। এই বসন্ততলার বাজারপাড়াতেই থাকেন কয়েকঘর বহুরূপী। ৫০/৫২ বছরের **কমল রায়** তাদেরই একজন।

ওপার বাংলা থেকে এসে টালি আর খল্‌পা দিয়ে গঙ্গার তীরে পীচ রাস্তার ঠিক গায়েই 'দীনের কুটির' পেতেছে কমল। কমলের বাবা বাংলাদেশে থাকতেই গত হয়েছেন। বাবার নাম ছিল খোকন বিশ্বাস। জমিতে খাট্‌তেন, সব্জির চাষ করতেন। এপারে এসেও কমল সেই স্মৃতি ভুলতে পারেনি। জমি-জমা না থাকায় তা সম্ভব হয়নি, তবে সব্জির ব্যবসা করেছেন। ডাব বিক্রী করেছেন। এখনও সময়-সুযোগ পেলে বহুরূপী ছেড়ে সে ব্যবসাতেও চলে যায় কমল। এমনিতেই বর্ষাকালে বহুরূপী চলে না, বৃহস্পতিবারও এই বসন্ততলার বহুরূপীরা কাজে বেরোয় না। তাছাড়া বহুরূপী দেখিয়ে খুব যে একটা কিছু হয়, তা নয়। তবে কমলের আনন্দ আছে এতে। কোথাও কোথাও দুষ্টু ছেলেমেয়েকে ভয় দেখানোর জন্য ঘরের ভেতরও চলে যেতে হয়। সেখানে বেশ সম্মান আর সিধেও পাওয়া যায়। ভালোও লাগে। তবে ভিক্ষুকের চেয়ে বেশি সম্মান আর নেই এ পেশায়। ভালো সাজ-পোশাকও কিনতে পারা যাচ্ছে না। দাম বেড়েছে সবকিছুরই। 'আগে চার আনায় ঘুঙুর কিনতাম, এখন দু'টাকা লাগে। ছেঁড়া জোকারের মতোন পোশাক পরে হুপ্‌-হাপ্ করে মজা দেখাই। এই কী আর বহুরূপী হলো গো! তবে পাবলিকের সঙ্গে আমরাও একটা আনন্দ পাই'। কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে দিয়ে থামলো কমল। কমল বহুরূপী।

কমল রায় অত্যন্ত দরিদ্র। বহুরূপীই এখন তার অন্যতম জীবিকা। ১৬/১৭ বছর সে বহুরূপী দেখিয়ে আসছে। দীর্ঘ দুপুর অতিবাহিত হয়েছে আমার তারই খল্‌পার বাড়িতে বসে, অনেক বহুরূপীর সঙ্গে কথা ব'লে। এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারী ডাক পায়নি কমল, পায়নি বহুরূপীর ছাড়পত্রও। তবে তার জামাই **দলিল চৌধুরী** বিষয়পুরে থাকে, সে সবকিছুই পেয়েছে। আমার সঙ্গে তার জামাই দলিলেরও দেখা হয়েছিল সেদিন (৮-৬-'০৫) বসন্ততলায় কমলের কুটিরেই। কমল এখন বৈষ্ণবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। গলায় তুলসীমালার কণ্ঠি ধারণ করেছে। নতুন করে মাধবীকে বিয়ে ক'রে সংসার পেতেছে। বহুরূপীর সংসার। দিব্যি কালী-রাম-হনুমান-ডাকাত-বনমানুষ-কঙ্কাল-পাগল-নারীপুরুষ-গোয়ালিনী সেজে কোনরকমে দিন চলে যাচ্ছে। জমিজমা কিছু নেই। তবে মাধবী তার জীবনে এসেই বদ্‌লে দিয়েছে জীবনটাকে।

কমলের স্ত্রী মাধবী রায়ের মায়ের বাড়ি বহরমপুরের এই বসন্ততলাতেই। বিয়ে হয়েছিল তার বিষয়পুরে। বাণীর কাকার সঙ্গে। সে হল গিয়ে সম্পূর্ণভাবেই বহুরূপীর সংসার। 'তারপর ও আবার বিয়ে করলে, আমিও চলে এলাম এখানে। আমার মায়ের বাড়িতে। এসেই এখানে বিয়ে করলাম কমলকে। ভীষণ অভাব তখন। সংসার চলে না আর।

আমিই তখন বললাম—বহুরূপী সাজো। ও রাজীও হয়ে গেল। আমি সাজিয়ে দিতাম, চুল বেঁধে দিতাম, টিনের হাত-জিভ্ সব লাগিয়ে দিতাম। বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে-ট্রেনেও ঘুরতাম। এখন আর যেতে হয় না। বাচ্চারা নিজেই সব পারে। যা আয় হয় তাতে সংসারও চলে যায়'। উচ্ছল হাসি ঝরে পড়ছিল মাধবীর হৃদয় হ'তে। লুটিয়ে পড়ছিল হাসতে হাসতে। অতীতের স্মৃতিচারণ করতে করতে তার দু'চোখ কখন খুশিতে রঙিন হ'য়ে উঠেছিল আমরা কেউ পরখ করিনি। মাধবীই দেখালো—'এই হল শোন আর পাট দিয়ে বোনা হনুমানের ড্রেস। এই পোশাকে কী হনুমান হয়? জোকার হয়, জোকার'। সব দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে ওঠা এই রমণী প্রথমবারের স্বামী পরিত্যক্তা হয়েও অবলম্বনহীনা নন্। সব দুঃখ-খেদ্‌কে জয় করেই বিজয়িনী। বহুরূপীদের ঘরে অবশ্য এ কোনো নতুন কথা নয়। এক যায় এক আসে। ব্যাধের জীবনে স্থায়ী বসবাসের সংসার ক'জনই বা পছন্দ করে? ওই ছেঁড়া হনুমানের পোশাক স্বামী কমলকে নিজের হাতেই সেলাই ক'রে বানিয়ে দিয়েছে মাধবী। এখনো প্রতি বৃহস্পতিবার তারা একসঙ্গে কাটায়, যেখানে সেখানে চলে যায়। বহুরূপী দেখানোর ছুটি এই দিনটি। এ পাড়ার অনেককেই বহুরূপীর পোশাক বানিয়ে দিয়েছে এবং পেন্ট মাখিয়ে সাজিয়েও দিয়েছে অনেককে এই মাধবী। সঙ্গেও গিয়েছে সবখানে। এখন আর যায় না, ঘরেই থাকে।

ওদের পারিবারিক বন্ধু বহুরূপী ডোমন রায়ের ছেলে **সুব্রত**। বসন্ততলায় বাজারপাড়ার বাঁকেই বহুরূপী সুব্রত বা মনসা রায়ের একতলা পাকা বাড়ি। সুব্রতকে ডাকনাম 'মনসা' বলেই সবাই চেনে এখানে। বছর ছত্রিশের যুবক। বাবা ডোমন রায় সরকারী চাকুরে। রাস্তার উল্টোদিকেই বাড়ি। বাড়িতে মনসাপুজো আছে। বিষয়পুরের রাম বহুরূপীর জামাই **সঞ্জয় বা বাবলু রায়ের** কাছেই মনসা আর কমলের বহুরূপীর শিক্ষা। সেই শিখিয়েছে 'লাজ-ঘেন্না-ভয়, তিন থাকতে বহুরূপী নয়'। বাবলু বয়সে কমলের চেয়ে ছোটই। তাতে কী! শিক্ষা দিয়েছে সেই। আর ঘরে নিত্য উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে যাবার পথ তৈরি ক'রে দিয়েছে স্ত্রী মাধবী! মনসা আর কমলের বন্ধুত্বও খুব। বয়স সেখানে কোনো বাধাই নয়।

কমল রায় (৫০) **মাধবী রায়** (৪৩)

↓ ↓ ↓

বচন (বড় ছেলে · ১৮) **গায়ত্রী** (এক মেয়ে : ২০) **জয়দেব** (ছোট ছেলে : ১৪)
চায়না ঘোষ (স্ত্রী) দলিল চৌধুরী (জামাই : ২৩)

↓

রূপা চৌধুরী (৪ বছর ৬ মাস)

কমলের দু'ই ছেলেই বহুরূপী দেখায়। জামাই দলিল তো কার্ড পাওয়া বহুরূপী। আবার গায়ত্রী দলিলের সাড়ে চার বছরের মেয়ে রূপাও বহুরূপী সাজতে শুরু ক'রে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। ছেলেদের এখনো বিয়ে হয়নি। রূপা কৃষ্ণ-রাম-রাধা সেজে 'শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস', 'গণদেবতা এক্সপ্রেস'-এ দেখিয়ে বেড়ায়। এখন থেকেই সে আয় করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। মা মাধবীর মতো মেয়ে গায়ত্রীও তার মেয়ে রূপাকে বহুরূপী সাজিয়ে দেয়। আগে সঙ্গেও যেত, এখন ও নিজেই পারে। আর যেতে হয় না।

বহুরূপীর পরম্পরায় এভাবেই এক যায় এক আসে। রূপাও যেমন রঙ না মেখে ঘরে ব'সে থাকতে পারেনা সারাদিন। ট্রেনে ট্রেনে বহুরূপীর সংলাপ ব'লে, কলা-কৌশল দেখিয়ে সে বেশ আনন্দ পায়। প্রতিদিন সকাল হতেই তাই মা-গায়ত্রীর কাছে রঙ আর সাজ পেতে, ছোট আয়নাটি নিয়ে বসে পড়ে রূপা। বহুরূপী **রূপা চৌধুরী ব্যাধ।**

বহরমপুরের বসন্ততলার বহুরূপীরা প্রায় সকলেই একই রকম সাজ সাজে। প্রয়োজনে এ-ওর পোশাকও ধার নিয়ে কাজ চালায়। তবে হনুমান, রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব-দুর্গা, পাগল, খুনে, কঙ্কাল, রাক্ষস, গোয়ালিনী, এগুলিই বিশেষভাবে সাজে তারা। কমল আর সুব্রত ছাড়াও লক্ষ্মণ রায়, সঞ্জয় রায়, অজিত চৌধুরী, ঝুলন রায়, টাকু চৌধুরী, চায়না চৌধুরী, শ্যামলী চৌধুরী-রা বহুরূপী সাজে। বিষয়পুরের সঙ্গে এই বসন্ততলার একটি অন্যরকম সংযোগ রয়ে গেছে। এখানের অনেকে যেমন ওখানে থাকে, তেমনি ওখানেরও অনেকে এসে এখানেই থেকে যায়। আসলে যাযাবরের জীবনই ওদের পছন্দের। ছাউনি ফেলতে পারলে সবখানেই ওদের ঘর। ছাউনি না থাকলেও অবশ্য অসুবিধার কিছু নেই। ক্লাব, পরচালা বা কারও একটু আশ্রয় পেলেই হল। অবশ্য বসন্ততলায় গঙ্গার ধারে বাড়ি করেছে বিশ্বনাথ রায়, পাকা রাস্তার উপরেই ডোমন রায় আর তার ছেলে মনসার দু'দুটি পাকা বাড়ি। শুধু বাড়ি হয়নি কমলের। বাড়ির তার দরকারও আছে বলে মনে করে না কমল। এখন বহুরূপী সেজেই আনন্দে আছে সে। ১০দিন, এক মাস, দু'মাস বাইরে বাইরেই কেটে যায়। ঘর থাকলেই পিছুটান বাড়ে। সম্পদের দিকে নেশা আসে। তখন তার বাইরে বেরুতে পা সরবে না। 'ওপথ আমার জন্য নয়'। বেশ ব'লে চলেছে কণ্ঠিধারী কমল। **কমল বহুরূপী।** বহুরূপী ব্যাধেদের সবারই উপাধি এই বসন্ততলায় 'রায়'। কেন, 'রায়' কেন? সে উত্তর কমলেরও অজানা। তবে স্ত্রী মাধবীর পদবী বিয়ের আগে 'রায়'ই ছিল। সে সূত্রে স্ত্রীর পদবীই গ্রহণ করেছে কমল।

দলিলের কার্ড



Government of West Bengal
Office of the P.O. Cum D W O , B.C W
Birbhum : Suri

To whom it may concern.

Sri/Smt—Dalil Chowdhury (Byadh), S/O—Ram Chowdhury (Byadh) of village Bishaypur, P.O.—Bhalkuti Under Lavpur Development Block in the District of Birbhum is a traditional 'Bahurupi' (a folk art). He/She deserves all sorts of help and co-operation from common people to promote, flourish the art in the society.

Sd/-
Tapan Kumar Kisku
Dy. Magistrate & Dy. Collector, Birbhum
& P.O. Cum D.W O, B.C.W.

শীতলগ্রামের বাজিকর বহুরূপী :

বীরভূমের লাভপুর থানার শীতলগ্রাম। কুয়ে নদীর কূলে অতীতের উজ্জ্বল গ্রাম 'সিম্বলগ্রাম' রূপান্তরিত হ'তে হ'তে (সিম্বল > সিধল > শীতল) আজ শীতলগ্রামে পরিণত হয়েছে। বীরভূমের একমাত্র এই শীতলগ্রামেই কয়েকঘর বাজিকর সম্প্রদায়ের বাস। তাদের অনেকেই 'হাবু' গায়, আর তাদেরই কেউ কেউ বহুরূপী সাজে।

'শহর-সামলাবাদ'-ই এখন হয়েছে লাভপুর, এ যুক্তি অনুসন্ধানীদের। ফুল্লরা তলার দক্ষিণ-পূর্বের নীচু এলাকাই নাকি অতীতের 'দেবীদহ'। এই 'দেবীদহ' থেকেই নাকি রামচন্দ্রের নির্দেশে অকালবোধনের জন্য পবন-নন্দন বীর-হনুমান ১০৮ নীলপদ্ম নিয়ে গিয়েছিলেন। সামলাবাদের শাসক হিসেবে ঐতিহাসিকেরা শ্যামল বর্মার নাম উল্লেখ ক'রে থাকেন। প্রখ্যাত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্যামল বর্মা এবং হরি বর্মাকে দুই বৈমাত্রেয় ভাই হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার কোনো কোনো অভিজ্ঞ লেখক হরি বর্মার ছেলেকেই বঙ্গেশ্বর শ্যামল বর্মা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই হরি বর্মার মন্ত্রসচিব ছিলেন সুপণ্ডিত ভবদেব ভট্ট। সে অতীত কথা হলো একাদশ খ্রিস্টিয় শতকের। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই শীতলগ্রামকে উল্লেখ করেছেন 'বাজকরদের গ্রাম' হিসেবে। সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তিনটি রাজপরিবারের উল্লেখ করেছেন এই শীতলগ্রামকে কেন্দ্র করে। তিনটি রাজপরিবারেরই নাকি রাজধানী ছিল এই সিম্বলগ্রাম বা শীতলগ্রাম। হরিবর্মা, শ্যামল বর্মা এবং ভোজবর্মা। কে আগে-পরে সে হিসেবও ইতিহাসে নেই।

হাজার বছরের সে পুরনো ইতিহাসে অনেক কিংবদন্তী লোকগাথা সব এসে হাজির হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের ষাট ঘর বাজিকর সম্প্রদায় এখন কম্‌তে কম্‌তে এসে ঠেকেছে মাত্র পনেরো ঘরে। সবাই-ই অভাবী। মেয়েরা 'হাবু' গায়, ছেলেদের কেউ কেউ বহুরূপী সাজে। সাঁইথিয়ায় এক ঘর এবং সাঁইথিয়া থানার উধোগ্রামে তিন ঘর বাজিকর চলে গিয়েছেন জীবন ও জীবিকার জন্য। যারা গাঁয়ে আছেন তাদের অনেকেই যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। এই সম্প্রদায়ের যে দুর্গাপুজো হয় তাতে অসুর থাকে না, এমন প্রতিমার চল্‌ আছে ওড়িশা রাজ্যে। দুর্গা ছাড়াও তারা শিব এবং মনসার পুজো করে। রাজ-প্রয়োজনেই একদিন সম্ভবত ওড়িশা থেকে এই যাযাবর বাজিকর সম্প্রদায় বীরভূমের এই অঞ্চলে এসেছিলেন রাজার আমন্ত্রণেই। চাকরীও জুটেছিল সেদিন রাজার ঘরে। বুদ্ধিমান ভবদেব ভট্টও এসেছিলেন ওড়িশা থেকেই। সম্ভবত তাঁরই সঙ্গে বাজিকরেরা এসেছিলেন একাদশ শতকে। এরাও আগে পাখি শিকার করতো, ভোজবাজি বা জাদু দেখাতো, হাবু গাইতো, বহুরূপী সাজতো। আর... বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে, গ্রামবাসীদের নানান খবর এনে তারা পৌঁছে দিতো রাজার কাছে। মূলত এদের কাজ ছিল গোয়েন্দার। গোয়েন্দার কাজের জন্যই এরা ছদ্মবেশ ধারণ করতো। এরা উপজাতির 'বেদিয়া' সম্প্রদায়েরই মানুষ। ভবদেব ভট্ট-ই এই সম্প্রদায়কে রাজার কাজে লাগিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। একদিন রাজার মনোরঞ্জনের জন্য এসে তাদের আর ফিরে যাওয়া হয়নি।

রাজা এবং তাঁর পারিষদেরা তখন বাজিকর পুরুষ-রমনীদের গান শুনতেন, নাচ দেখতেন, ভোজবাজি দেখ্‌তেন, তাদের ছলায়-কলায় মজেও থাকতেন। আবার দেশের অভ্যন্তরীণ খোঁজ-খবর সংগ্রহের জন্য তাদের গুপ্তচরের কাজেও লাগিয়েছিলেন। মানুষের কুসংস্কারকে

কাজে লাগিয়ে, তাবিজ বেচে, জাদু দেখিয়ে তারা জনগণসমাজের পেটের কথাটি সংগ্রহ ক'রে আনতো। একই সঙ্গে রাজ-অনুগ্রহে তাদের পেটও ভরতো। আজ রাজা নেই, গুপ্তচরের কাজের জন্য তারাও আর বিবেচিত নয়। তাই এখন দিন চালানোই হ'য়ে উঠেছে সমস্যা। কৃষিকাজে এখনও সেভাবে মন দিতেও পারেনি তারা।

তিনটি রাজপরিবারের রাজধানী হিসেবে মান্যতা পেয়েছে যে শীতলগ্রাম বা সিন্ধলগ্রাম, কিংবদন্তী আছে সেখানেরই ভোজরাজের কন্যা ভানুমতি। এই ভোজবর্মার মেয়ে **রাজকুমারী ভানুমতির** নাকি বিয়ে হয়েছিল উজানীনগর তথা মঙ্গলকোটের রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে। ভানুমতি ছিলেন নাকি বিশিষ্ট জাদুকরী। শোনা যায় তার নাম থেকেই নাকি 'জাদু'র নাম হয়েছে 'ভানুমতির খেল্'। আবার ভোজরাজের কন্যা বাবার স্মৃতিকে ধ'রে রাখতেই নাকি 'জাদু'কে বল্তেন 'ভোজবাজি'।

সিন্ধলগ্রাম ১৩৩২ বঙ্গাব্দের পর থেকে হয়েছে শীতলগ্রাম। বাজিকরদের বাসকে চিহ্নিত ক'রে এখন বলা হয় 'বাজিকর শীতলগ্রাম'। জুনিয়র পি-সি-সরকার এই গ্রামকেই বলেছেন '**জাদুনগরী**'। তিনি এ গ্রামে গিয়ে সম্মানিত। এবং প্রয়াত শশাঙ্ক বাজিকরের বৃদ্ধা স্ত্রী রূপবতী বাজিকরের কাছে গল্প শুনে এসেছেন 'বহুকাল আগে তাঁদের দলপতি ভাণ্ডর বাজিকর শত্রু নিধন করতে এক বিষকন্যা তৈরি করেন। খুব ছোটবেলা থেকেই তার শরীরে সাপের বা অন্য কিছুর একটা বিষ একটু একটু ক'রে ঢুকিয়ে ও সইয়ে, তার দেহকে করে রাখা হয়েছিল বিষাক্ত। শেখানো হয়েছিল কামসূত্রের নানারকম ছলা, চৌষট্টি কলার নাচ, চুলের পরিপাট্য, প্রসাধন, তুড়ি বাজিয়ে রসানো 'হাবু গান', সাপের মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শরীর-দোলানো নাচ। মদ্যপ রাজা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। কাছে টেনে ঘনিষ্ঠ হওয়া মাত্রই শুরু হয় বিষক্রিয়া। ঠিক তক্ষুণি নয়, একটু সময় পরেই ছটফটিয়ে মারা যান রাজা। বিষকন্যা ফিরে আসেন নিজের ডেরায়। আর তখনই ঢাক, ঢোল, শিঙা বাজিয়ে তাকে ঘিরে '**ভাণ্ডর বাজিকর**' সদলবল উৎসব শুরু করেন। তখনই দখল করেন সিংহাসন। কোন্ রাজা, কোন্ রাজত্ব এসবের কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া না গেলেও, তাদের ভোজবাজির গর্ব ও গৌরবগাথা লুকিয়ে আছে এইসব কথা-কাহিনির আবর্তেই। যেখানে লোকবৃত্তের হুমড়া বেদে, নদের চাঁদ, মহুয়া বা আরও অন্যদের যাযাবরী-বুনোগন্ধ সহজেই নাকে এসে লাগে। 'ভাণ্ডর বাজিকর' হয়ে যায় 'ভাণ্ডরাজা'।

বাজিকরদের এই গৌরবোৎসব মিলে গেছে এখন গাজনের সঙ্গে। অসুর বিহীন দুর্গা ওরাই বানায়। আগে ওরাই পুজোও করতো, এখন ব্রাহ্মণ এনে করানো হয়। তবে মন্দিরে ছড়ানো সিঁদুরের উপর মা-দুর্গার পায়ের ছাপ ফুটে উঠ্লেই নাকি 'সন্ধিক্ষণ' ঘোষণা করে বাজিকরেরা। এবং তা নাকি প্রতি অষ্টমীতেই ফুটে ওঠে। জুনিয়র পি-সি-সরকার একে বলেছেন—'স্ত্রী শক্তির প্রাধান্য প্রমাণের সুন্দর জাদুকরি প্রয়াস।'

এ গ্রামের **বিদেশ বাজিকর, উত্তম বাজিকর আর মালু বাজিকর** নিয়মিত বহুরূপী দেখাতো, বাজিও দেখাতো। **অলকা বাজিকর** নাচ্তো ঢোলক বাজিয়ে, বাজি দেখাতো স্বামী বিদেশ বা বিদেশী বাজিকর। বিদেশী 'ঘোষ' বংশের ছেলে, শীতলগ্রামের বাজিকরদের মেয়েকে বিয়ে করে 'বাজিকর' হয়েছে। রূপবতী আর তার বৌমা উত্তমের স্ত্রী মায়া যথেষ্ট সুন্দর 'হাবু' গায় এবং নাচেনও। তাঁদের প্রিয় 'হাবু' গান—

১. 'বাঁধাকপির এতো কিসের মান লো/এতো কিসের মান! /রাজাবাবুদেব বঁটি এনে/করবো খান্ খান্ লো'।

২. 'কনের মাকে বাইরে শুতে মানা লো/বাইরে শুতে মানা,/তিন টেঙ্গা ভালুক এসে করবে আনাগোনা লো/করবে আনাগোনা।/ খেচ্াক দোম্, খেচাক্ দোম্।'

হাত ও আঙুলে অদ্ভুত তুড়ি আর পিঠে লাঠির ঘা মেরে গালবাদ্য ক'রে 'হাবু' গায় শিশু ও মেয়েরা। এখন অবশ্য শেষ হ'য়ে এসেছে এই লোকশিল্পটি। বাজিকরেরাও চাষে যোগ দিচ্ছে। অক্ষমেরা 'বসুয়া' (জটা বিশিষ্ট ষাঁড়) দেখিয়ে বহুরূপী সেজে ভিক্ষেও করছে কখনো-সখনো। বহুরূপী সাজের মধ্যে হনুমান-রাম-রাক্ষস-খুনে ইত্যাদিই সাজে উত্তম-বৈদ্যনাথ-কাজল আর মালু। তবে এখন সেও বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

এখনও বাজিকর সম্প্রদায় উপজাতি সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি 'কার্ড' পায়নি। তবে প্রশাসনিক পর্বে চেষ্টা চলছে। এদের জাদু ও বহুরূপ গ্রহণের ক্ষমতাকে মান্যতা দিয়েই সিনিয়র পি-সি সরকার গ্রামে এসে দু'জন বাজিকরকে নিয়ে গিয়ে বর্ধমান স্টেশনে ভোজবাজি দেখিয়েছিলেন, সেই সূত্র ধরেই সম্ভবত জুনিয়র পি-সি-সরকার সিউড়িতে বিদেশ বাজিকরের খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করেন। শীতল গ্রামে প্রায় ১৫০০ মানুষের বাস, তার মধ্যে ১৫টি পরিবারের শতখানেক মানুষ বাজিকরদের বংশোদ্ভূত মাত্র।

শীতলগ্রামের বাজিকর সম্প্রদায়ের পুরুষেরা যেমন বহুরূপী সাজে তেমনি মেয়েরা 'হাবু' গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করে। তাদের সমাজের একটি প্রচারিত হাবুগান শুনেছিলাম সুবিখ্যাত সত্যবালা বাজিকরের (৬৮) মেয়ে দয়া বাজিকরের

আয়লো সই যাইলো সই, পড়বো আমরা রাতের ইস্কুলে,
দুই ছেলেতে পড়বো মোবা সাক্ষরোত্তরে।
বুড়ো বয়সে পড়ে আর কী হবে বলোনা?
ডাক্তারবাবু বলে জিগো সই করো তাই দেখি না।
বুড়োবুড়ি ছুঁড়া-ছুড়ি জাতির বিচার নাই,
লেখাপড়া না শিখিলে মুনিষের মাইনে পাবে নাকো ভাই।

দেশে দেখো ডাইরিয়া রোগ এসেছে,
ডাইরিয়া রোগে ডাক্তারেরা তো বড়লোক হয়েছে।
অপরাশন করায় একশো-পাঁচ টাকা ধরো।

উল্খিতে পাল্খেনেকা বুল্বুনিচি খায়,
ছেলের নামে বেছ্না পেরে কলির বৌ'রা নিজে ঘুম যায়।
কলির বৌ'রা ধান-চাল বিচেছে,
আলিপ-লাইলা-শাড়ি দেখো কিনেছে,
পেট-কোঁচলে চাবি গুঁজে বাপের-বাড়ি গিয়েছে।

ওধিত্ব-কল্লাভাতে তোগ-ঘিরেছে সন্ধিপাতে
বিচ্ কচ্কচ্ ক'রে তাতে, জালমাছের খোঁসা,
শাশুড়ি-বৌ-এ লাই লেগেছে পাড়া সুদ্ধু গোঁসা।

শাশুড়ির গলায় লেইলে দড়ি, বৌ-এর গলায় চন্দ্রহার
কলি থেকে উঠ্ছে কেমন ক'রে বিবহার।
উষ্ট নারী দুষ্টকথা ঘনিয়ে বসে কাছে
কথা লিগে কথা লিবে পরাণ মারে শেষে।

এক'পো চেলের মাছ কিনলাম, ধুতে-বাছতে সব গেল,
মেয়েছেলের মরণ ভালো, গঞ্জনাতে পরাণ গেল।
ঐলো দিদি দুলালি, কি দিয়ে মন ভুলালি
ভাসুরকে ভাত দিতে যে জামাইকে ভুলাইলি।
ভাত দিলি জি পান দিলিনা হাতের মৌদানা
থেমে-থমকে মনে পড়ে হেতমপুরের তালবোনা।

ও ছোটোবৌ, ও বড়বৌ, ও ফুলবৌ, ও মেজোবৌ, ও সেজোবৌ করলি কি?
শ্বশুর-ভাসুর কেঁদে খুন, কতুই গাইবো তোমার গুণ,
শ্বশুর কাঁন্দে ভাসুর কাঁন্দে ঘরের ভিতরে
সাতপাকের ঐ দেওড়া কাঁন্দে ধুলোতে পড়ে।

বড়বৌ বর আনলে ঝি, তাকে বলতে পারি কি?
দেশে দেখো লাদেন দেখো এসেছে
লাদেন এসে যুধ-লড়াই লাগিয়েছে
বোমা-গুলিতেও করিয়েছে।
এবার কলিতে কি হবে?
রিজিগম্বর ভূমিকম্পর উঠেছে,
ভূমিকম্প হ'য়ে দেখো কতো দেশের কতো ক্ষতি হয়েছে
এবার কলি কি হবে?
উলোট-পালোট ক'রে কলি এবার কলি শেষ হবে।

ঐ মেলানো ভালো,
কালার সঙ্গে মেল্ করোনা
ভাবতে জনম গেল।

এক পয়সার দুধ খেয়েছে কপ্‌লা লাগি মরবো
এক পয়সার মদ খাইগা কতো মজা করবো।
আর কতো যে হবে?
উলোট-পালোট ক'রে কলি এবার কলি শেষ হবে
উল্‌টো-পাল্টা ক'রে কলি এবার কলি শেষ হবে।

শীতলগ্রামের সাগর বাজিকর ভারি সুন্দর তারাক্ষেপি বা তারাসুন্দরী সাজে, এটি তার প্রিয় সাজও বলা যায়। ক্ষেপি তারাসুন্দরীর সংলাপটি শুনেছিলাম খুব মন দিয়ে।

কই ল্যালবেলের মা,
আর দেখো ঐ পাড়ার হেলার বেটা, ত্যা-এঁঠে মাথামোটা

খালভরা ঝালবড়া ছেলেরা
বারে বারে বলে বুন ক্ষেপি—আর ক্ষেপি।
আমি সে কুন জায়গাটায় ক্ষেপি?
আরে ন'তলা কোন্ ছ'তলায় বাস করি
শাশুড়ি আমায় কতো ভালোবাসে
বর্ধমান থেকে উকুনের চারা এনে মাথায় বসিন দিয়েছে।
সে কুন মারি শুনাইতে পেলে হুঁ-হা করি।
আর চাঁদের গায়ে ময়লা আছে তারাসুন্দরীর গায়ে ময়লা নাই।
আর ড্যাং ড্যাং জামাই এসেছে
ফ্যান খাবা দাঁত বাঁটা হেলার বেটা ভেঙে ফেলেছে।

আর পান খেয়েছি পিচ্ ফেলেছি
দাঁত করেছি ছোলা,
আর বিয়ে করা বন্ধু আমার নাম রেখেছে
মুড়ি ভাজার খোলা।
আর শাশুড়ি আমার নাম রেখেছে বুন, ধান ছাঁকার পাত্না।
তাইতো বলি বুন সাইকেল ছাড়া যাই না, টি-ভি ছাড়া দেখিনা।

টেক্সি ছাড়া যাইনা, সিনিমা ছাড়া দেখিনা।
আর ধোকন আমার রাঁধে ভালো কুলে-বেগুনে
ফুঁ-দিতে বুন পড়ে গেল তুষের আগুনে।
আর আলুপাতা ছিলে ছিলে ভেন্ডিপাতা থই
সকল জামাই এলো হা'লো আমার জামাই কই?
আমার জামাই আসছে ছোলাভুঁই দিয়ে
রেঁধে দুবো হ্যাঁটকা মসুরী দিয়ে।

আর আমার নাম হরিদাসী
পরের খেতে ভালোবাসি,
নিজেরটো খুব বেজার বাসি।

তাইতো বলি বুন, মটর কলাই গোল গোল
ক্ষেপি বাজায় ফুটো ঢোল।
আর ছোলা কলাই-এর মুখটি সবু
ক্ষেপির নাম কল্পতরু।
তাইতো বলি, হরেকৃষ্ণ হরেরাম বাঁধাকপির কতো দাম?
তাইতো বলি বুন, কাঁঠালটা ভেঙে যাবে
এক্ষুনি বুন তোমাদের বাড়িতে আঁতুর হয়ে যাবে।
আর ন'মাস ন'দিন পয়সা এখন ধিক্ ধিক্
যাবো এখন কোন্ দিক।
কাছে আবার হাঁসপাতাল নাই বুন
হাঁসপাতাল যেতে হবে গাড়ি ভাড়াটো দাও।

নানা জনের নানা কথা

সবে ঘুম থেকে উঠে চা-পানের পর বইপত্র নিয়ে বসেছি, এমন সময় দিলীপ এসে হাজির। দিলীপ বিষয়পুরের বহুরূপী। দিলীপ চৌধুরী ব্যাধ এখন বহুরূপী দেখিয়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। গতকাল ২২/২ তারিখ বিকেলে দুই বহুরূপীতে খুব গণ্ডগোল—মারামারি। তাদেরই একজন দিলীপ চৌধুরীর জামাই বিষ্ণুপ্রিয়ার বর। মার খেয়েছে সেই। বিষ্ণুপ্রিয়া এখন বিষয়পুর থেকে এসে স্বামীর সঙ্গে নারায়ণঘাটির 'কোঁড়াপাড়ায়' থাকে। ময়ূরাক্ষী নদীর ক্যানেল চলে গেছে পাশ দিয়ে, আম-নারকেল গাছের সবুজ দিয়ে ঘেরা গ্রাম নারায়ণঘাটি। পাশেই বিদ্যাধরী, ক্যানেলের ওপারেই। বিদ্যাধরীর হীবুও বিয়ে করেছে বিষয়পুরের বহুরূপীদের মেয়েকে। জামাই মার খেয়েছে শুনেই বিষয়পুর থেকে বহুরূপীরা দল বেঁধে চলে এসেছে। দলপতি আনন্দ, রাজেন্দ্র, দিলীপ, সেন্টু, হীবু, এমনি ক'রে ১২/১৪ জন। এই ময়ূরেশ্বর থানার কোটাসুর এলাকাটি তাদের, এখানে অন্যেরা বহুরূপী দেখাতে পাবে না। তার ওপর জামাইকে মারধোর!

বহুরূপীরা এক্ষেত্রে বেশ একতাবদ্ধ। দিলীপ প্রথমে বলেছিল—'ওরা সব ঐ জামুড়িয়া এলাকার পাখমারা, লোকের বাড়ির এটা ওটা টেনে নিয়ে চলে যায়। এলাকার মানুষ তো আমাদেরই দুষবে, বলুন?' কথাগুলি শুনে দিলীপেরই দাবী মতো ওকে ময়ূরেশ্বর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঈশা মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি ত্রিপুরেশ্বর মণ্ডলের কাছে নিয়ে গিয়েছি, ওর প্রয়োজনমতো শংসাপত্রও লিখে দিয়েছি। আসলে শুধু দিলীপ নয়, বহু লোকশিল্পীর সঙ্গেই একটা আলাদা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে কখন। তার টের যে পাইনি একেবারে তা নয়। তবে ওদের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি সব সময়। সেই সূত্রেই দিলীপ বহুরূপীর ডাকে কোনোকিছু বিবেচনা না করেই যাওয়া।

কিন্তু গিয়ে কি হলো? কোটাসুর থেকে পূর্ব দিকে যে রাস্তা বহরমপুরের দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তায় এক কিমি মতো পথ গিয়ে টেলিফোন কেন্দ্র, তার কাছে একটি আদিবাসী পল্লি। সেই পল্লির একপাশে একটি পুকুরের ধারে একটি ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছে দড়ির শিকল ঝুলিয়ে গুছিয়ে সংসার পেতে নীচে বসে আছে ক'জন মানুষ। সেখানে আমি গেলাম দিলীপের সঙ্গে। আমাদের আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে আনন্দ-হীবু-সেন্টু-ভাদু-আর দিলীপের জামাই। তারা ততক্ষণে বেশ হম্বিতম্বি শুরু করেছে ওদের সঙ্গে। আমাকে পেয়ে শক্তি যেন দ্বিগুণ হ'য়ে গেল। ওরা বার বার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে ওদের ভুলের জন্য। ওদের নেতা দিলীপকে 'দিলীপদা' সম্বোধন ক'রে বলছে—'তুমি তো আমাকে চেনো, ওকে ক্ষমা করে দাও। ও ছোটো ছেলে, চেনে না তোমাদের'। আমি থাকার কারণে দিলীপ তেমন কিছু বলতেও পারছে না। আমাকে দেখাচ্ছে শুধু। উল্টো দিকে দোদুল চুল, চোখে কাজল, মুখে পেন্ট হয়ে গেছে। সামনে পড়ে

আছে ভাঁজ করা কাঠের আয়না। কাছে দাঁড়াতেই সেই সকাল ৮টাতেই বোঝা যায় সে মদ খেয়েছে। জোড় হাত ক'রে ক্ষমা চাইছে আমার কাছেও। আমি হাতে হাত দিয়ে বললাম-- কোথায় বাড়ি? বললো—'শীতলগ্রাম'। জিজ্ঞেস করলাম কি নাম? উত্তর দিল—'**বিদেশ বাজিকর**'। চমকে উঠলাম আমি, বিদেশ বাজিকর! সেই ঘোষ বংশের ছেলে যে কিনা বাজিকরদের মেয়েকে বিয়ে ক'রে আজ বাজিকর হয়েছে আর বহুরূপী দেখিয়ে বেড়াচ্ছে গাঁয়ে গাঁয়ে। এই বিদেশের ছেলের সঙ্গেই দিলীপের জামায়ের ঝামেলা, মারামারি। বললাম— 'তোমরা শিল্পী মানুষ, গরীব মানুষ, নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করছো কেন?' সবিনয়ে বিদেশ বললো—'আর হবে না মাস্টারবাবু, কথা দিলাম।' বিদেশ বাজিকর তার কথা রেখেছিল কিনা জানি না। তবে সেদিন আমার মনে হয়েছিল দিলীপ আর বিদেশের মধ্যে সত্যিই তো তেমন কোনো পার্থক্য নেই। দারিদ্র্যে তো আছে অপার মিল। তথাপি এমন এলাকা দখলের লড়াই কেন? দু'জনেই তো যাযাবর বৃত্তিতে বিদ্যমান।

অবশ্য বদলগতির ইতিহাসের বাঁকে এমন বহু প্রমাণ রয়েই গেছে। চেঙ্গিস-তৈমুর কারও চোখে বর্বর লুঠেরা হলেও কারও চোখে ইতিহাসের নায়ক—মহাযোদ্ধা—দস্যুনায়ক। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিবৃত্তে যাযাবর হুনদলই ছিল সবচেয়ে ভীতিপ্রদ। ঘোড়ার পিঠে বাঁকানো ধনুক আর তির নিয়ে কাত্ হয়ে তারা তিরও ছুঁড়তে পারতো পিছন দিকে। গ্রিক পুরাণের 'ঘোড়ামানব' কল্পনার উৎসমূলে হয়তো এই হুন যোদ্ধারাই রয়ে গেছে। মোঙ্গলিয়ার পশুপালক যাযাবর উপজাতি থেকেই চেঙ্গিস খান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্য। দুর্ধর্ষ গতিময়তার রণকৌশল, গুপ্তচরবাহিনী, দ্রুততার কারণে পথের মধ্যেই ঘোড়া বদল, খবরাখবর আদান-প্রদান আয়ত্ত করেছিলেন চেঙ্গিসের মোঙ্গলরা। বাংলায় মারাঠা বর্গিদস্যুর ভয় দেখিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়ানো হতো। 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো/বর্গি এলো দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে-খাজনা দেবো কিসে?' একইভাবে ইউরোপ ও এশিয়ার মায়েরাও তেমনই হুন ও মোঙ্গলদের ভয় দেখিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়েছেন। লৌকিক উপকথায় অতিরঞ্জিত হয়েছে তাদের কথা, ফিরেছে সাধারণের মুখে মুখে। সেসব কথা শুনে মেরুদণ্ড হিম হয়ে গেছে। অথচ ভূমিপুত্রের দেশজ লোককথায় এরা বীর-নায়কের মর্যাদা অর্জন করেছেন সব সময়।

রাম-রাবণ-তারকা রাক্ষসী-শিব-কৃষ্ণ সেজে বহুরূপী দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে প্রায় ভিক্ষাজীবী পরিবারের দুই যাযাবর শিল্পী দিলীপ এবং বিদেশ। দু'জনের সঙ্গেই কিছু জনের সমর্থন আছে। একদা এদেরই পূর্ব-পুরুষ গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আনীত হয়েছিলেন। এরা শুধু নিজেদের পেটটুকু ভরানোর জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যায়। বহুরূপী দেখিয়ে ভিক্ষে করে। কেউই দস্যু-নায়ক হ'তে আগ্রহী নয়। অথচ কেমন যেন এক দলের সঙ্গে আর এক দলের অজস্র অমিল। এইরকমই হাজার কথা ভাবছি, তখনই দিলীপ বললো—'মাস্টারদা, এবার ধরমপুজোয় বিষয়পুরে যাবেন কিন্তু। এবার আমরা 'ধনঞ্জয়ের ফাঁসি'র সাজ সাজছি, আপনাকে দেখাবো। আমার বাড়িতে থাকবেন।' ২০০৪ সালের ১৪ অগস্ট কলকাতায় ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়েছিল, তাকেই লক্ষ্য ক'রে বহুরূপী শিল্পে নিয়ে এসেছে দিলীপেরা। বহুরূপীতে আকর্ষণ সৃষ্টি এবং মঞ্চে বহুরূপী দেখানোর একটা প্রবণতা থেকেই এই ফাঁসির

মতো জনচল্‌তি বিষয়টির উত্থাপন। আবার দিলীপ একটু সরতেই বিদেশ বলেছিল—'দুর্গা পুজোয় যাবেন শীতলগ্রামে। আমাদের দুর্গায় কিন্তু অসুর থাকে না। সিঁদুরে পায়ের ছাপ দেখতে পাবেন মায়ের।'

এমন আন্তরিক দু'জন মানুষ, দু'জন শিল্পী এবং দু'জনেই বীরভূম জেলার বাসীন্দা। শীতল গ্রামের বাজিকরেরা তো এ জেলারই রাজ-আমন্ত্রণে একদিন ওড়িশা থেকে এসেছিলেন এই বীরভূম জেলায়। তারপর রাজা গেছে, রাজত্ব গেছে, তাদের গুপ্তচর বৃত্তিও গেছে। পেটের চিন্তায় তাদের মেয়েদেরকে নিয়েই তারা বাধ্য হয়ে নেমে এসেছে পথের প্রান্তে। হাবু-বহুরূপী-ভোজবাজি দেখিয়েই সংসার চলছে। তবে শরীরে অনেকেরই বাসা বেঁধেছে এখন দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ। এদিকে বসন্ত চলে এসেছে। পলাশ-শিমূল-কৃষ্ণচূড়া লালে লাল হ'য়ে রাঙিয়ে দিয়েছে আকাশকে। এই সময়ই শিবরাত্রি। শিব পুজোর ধুম। বাংলার বহু জায়গাতেই শিবকে পলাশ দিয়ে বরণ করা হয়। তবে জ্যান্ত শিবকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় ট্রেনে-বাসে এবং শহর-গঞ্জের সর্বত্র। বহুরূপী শিব অবশ্য কোনো তিথি নক্ষত্র বিচার করে না, সময় ও সুযোগ পেলেই ত্রিশূল হাতে ঢুকে পড়ে গ্রামে-শহরে। এবং তা শহর কলকাতাতেও। শিবরাত্রির শিবপুজোকে কেন্দ্র করেই একাধিক বহুরূপীর শহর পরিক্রমার মরসুম আসে।

মৃগচর্ম পরিধানে, স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র
হস্তেতে পলাশ দণ্ড, কমণ্ডলু, ছত্র।
ভস্ম বিভূষিত দেহে বটুরূপ ধরি
নানান আশ্রমে যান দেব ত্রিপুরারি।

তারকেশ্বর এমনিতেই শিবের দেশ। সেখানে থাকেন কালীপদ বহুরূপী আর তার অসংখ্য শিব-সাগ্‌রেত। তারা এই সময় শিব সেজে একটু বেশিই আয় করে থাকেন। তাছাড়াও সুবলদাস বহুরূপী আছেন। বীরভূম থেকে ট্রেনে চেপে চলে যান কলকাতা—অশোকনগর—বাণীপুর—ব্যাণ্ডেলে। সেই ছোট্ট বেলায় গোপালনগরের 'মনসামাতা নাট্য সংঘ'-এ নারী সেজে হাতে খড়ি, তারপর রোনাল্ড রেগনের ডাকে সোজা হোয়াইট হাউস। তাছাড়াও লন্ডনের গ্লাসগো থেকে বার্লিন-ফ্রাঙ্কফুর্ট-তাসখন্দ বহুদেশেই গিয়েছেন বহুরূপী সুবলদাস বৈরাগ্য। সুবল জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে, পালিত হয়েছেন বৈরাগী-বৈষ্ণবের ঘরে। সুবল বহুরূপীর শিক্ষাগুরুও ব্রাহ্মণ,—কানাই চক্রবর্তী তাঁর নাম। বহুরূপী লোকশিল্প চর্চায় শুধুই যে ব্যাধ—পাখমারারা রয়েছেন তা নয়, তবে তাদের একটি বড়ো অংশই রয়েছেন এই বহুরূপী চর্চায়। বহুরূপী সেজে ব্যাধ-পাখমারা যাযাবর শ্রেণির মানুষজন ভিক্ষেই করে চলেছেন। সুবলদাস, কালীপদ পাল বা নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি শিল্পীরা অবশ্য পাখমারাদের দলে গণ্য হতেও রাজী নন। তবে বহুরূপী সাজেন সবাই। বিষয়পুরের পাখমারা ব্যাধেদের বহুরূপী সাজার কারণেই গ্রামটির পরিচিতিও এসেছে 'বহুরূপীদের গ্রাম' হিসেবে। শীতলগ্রামের পরিচিতি এসেছে 'বাজিকরদের গ্রাম' রূপে। সুতরাং দিলীপ বহুরূপী বা বিদেশ বাজিকরও রয়েছেন সেই লোকশিল্প চর্চার ছড়ানো পংক্তিটিতেই। তারাও শিব সাজে শিবরাত্রিকে উপলক্ষ্য ক'রে, শহর-গ্রামের অলিগলিতে ঘুরেও বেড়ায় বহুরূপী সেজে। আসলে ত্রিপুরারি শিব-বহুরূপীর তো কোনো বিকল্পই হয় না।

হিন্দু শাস্ত্রের এইসব দেবদেবীর 'মিথ্' বাংলায় বসবাসকারী ভিন্ন-সম্প্রদায়ের মানুষদেব সবার জানার কথা নয়। অথচ মূর্তি-কল্পনাটি ভারি মনোগ্রাহী এবং মজারও। শিব-কৃষ্ণ-রাম-দুর্গা এই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে আশ্চর্য এক মাধুরী মিশে আছে বাঙালির। যেখানে বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির গভীরে নানা স্তরে নিত্যদিন বেজে চলেছে সমন্বয়ের সুর। ধর্মীয় শাস্ত্রশাসন বা আচারবাদ তাতে বাদ সাধেনি কখনও। তাই বহুরূপী কালী টিনের জিভ্‌টি খুলে রেখে অনায়াসে বিড়ি খায়, শিব ত্রিশূলটি পাড়ে রেখে আঁচলা ভ'রে জল খেতে নেমে পড়ে পুকুরে। আসলে সংস্কৃতির লোকায়ন বড়ো অমোঘ আর শক্তিধর। পরিযায়ী পাখির মতো কোন্ প্রান্তের সংস্কৃতি যে কখন কোন্ প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তার ঠিক্-ঠিকানা থাকে না। এক সমন্বয় বোধের দ্রবণক্রিয়া ভিন্ন. উদার আমন্ত্রণে পাতা আসনখানি ভিন্ন ধর্মবোধের আর কোনোকিছু থাকে না সেখানে। সম সূত্র সন্ধানেই বোধহয় বহুরূপীর লোক-আঙনে শিব-কৃষ্ণ-রাম-কালী প্রভৃতি দেবদেবীর চরিত্রগুলি এসে পড়েছে। গড়ে উঠেছে সমন্বয়ের সংস্কৃতি—লোকসংস্কৃতি। একারণেই আলকাপ, কেষ্ট যাত্রায়, লেটোগানে বহু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ অনায়াসেই দেবদেবী সেজেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পে মুসলমান বারিক মণ্ডল কথককে বলেছে—'দেখি যদি খোদার মর্জি হয়, আমার ছোটোছেলে কেষ্ট সাজে, দ্যাখবেন কি অ্যাক্‌টো'। তাই বহুরূপী সাজার একমাত্র অধিকারী কেউ নয়। জীবিকার প্রয়োজনে এ বাংলায় বিভিন্ন জাতির মানুষজনই বহুরূপী সেজেছেন, বহুরূপী দেখিয়ে সংসার চালিয়েছেন। কেউ কেউ সুযোগ বুঝে অন্য কাজও করেছেন। তাতে কিছু এসে যায়নি। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-কৈবর্ত-সদ্‌গোপ-ব্যাধ যাযাবর পাখমারা অনেকেই এসেছেন এ পথে। সবার একটাই পরিচয় তারা দরিদ্র। অভাবের কারণেই জীবনের অন্যত্র তেমন কিছু ক'রে উঠ্‌তে না পেরেই তারা এসেছেন বহুরূপী পেশায়। অবশ্যই এই লোকশিল্পটিকে ভালোবেসেই। তারপর দাদু সেজেছেন, বাবা সেজেছেন, দেখে দেখেই নাতিও বহুরূপী সাজছে। তবে প্রতিষ্ঠিত বহুরূপীরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের আর এপথে আসার জন্য উৎসাহিত করছেন না, বরং ব্যাধ-পাখমারাদের শিশুরা অভাবের কারণে বহুরূপী সেজে ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়ছে বাল্যবেলাতেই। কালী সাজলেই ভালো হয়। হাতে ভিক্ষার থালাও থাকে, টিনের জিভ্ দাঁতে দাঁতে চেপে রাখার জন্য কথাও বলতে হয় না। যারা ট্রেনে পয়সা দেয় তারা থালাতেই দেয়।

'বেদ' কালীকে একদমই প্রশ্রয় দেয়নি। কালী সর্বতোভাবেই এক অনার্যদেবী। পুরা-প্রস্তর যুগের মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি সম্ভবত এইসব দেবী। পরবর্তী কালে প্রাগার্য দেবদেবীদের আর্যীকরণ বা সংস্কৃতায়নের প্রয়োজনে অনার্য দ্রাবিড়দের মন ভোলাতে অথবা হাতে রাখতে দেবদেবীদের জাতে তুলে আনা হয়েছে। অনার্য লক্ষ্মণগুলো তথাপি এইসব দেবতাদের দেহ থেকে মুছে দেওয়া যায়নি। শিব যেমন বাঘছাল খুলে ধুতি-চাদর পরে গা থেকে ছাইভস্ম মুছে দামি সাবান-সেন্ট মেখে সামনে এসে বেদীতে উঠে দাঁড়াননি, কালীও তেমনি সুন্দরী হয়ে নগ্নতা ঢাকার চেষ্টাও করেননি কখনো। আর্যকুলের ব্রাত্য এই দেবদেবীদ্বয় তথাপি সাধারণ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়। শিব তো কৃষি দেবতা এখানে। আর 'ছোটোলোকের দেবী' বলেই কালীকে 'সাঁওতাল মাগি' বলতেও জিভে জড়তা আসেনি একালের কবির। তন্ত্রসারে শ্মশানচারী শিবের বিপরীত মেরুতে তিমির বিলাসী কালী মগ্ন। দশমহাবিদ্যার মাতৃকাদেবী হিসেবে

আর্যসংস্কৃতির প্রতিনির্মাণ কালী। তিনি ভীষণা-ভয়ঙ্করী-রক্তপায়ী-উলঙ্গিনী। কালী প্রায় সর্বদাই শবরী-কিরাতিনী-নিষাদকুমারী-পুলিন্দ যুবতী-কোচ্‌রমনী-ডোমনী-বাগদিনী-চণ্ডালিনী এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। দেবী নিজে অন্ত্যজ এবং আর্যেতর নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর দ্বারাই নিত্য পূজিতা। তিনি আবার চোর-ডাকাতদেরও দেবী। এখনো বহু জায়গাতেই 'ডাকাতকালী'র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আর্যায়নের কারণেই অসুরদের আরাধ্য দেবী কালীকে বরণ ক'রে নেওয়া হলো অসুর নাশিনী দেবী দুর্গা হিসেবে। দেবী কালিকাও অসুর নিধন করেছিলেন। দুর্গা বুকে ত্রিশূল বিঁধিয়েও সঙ্গে রেখেছিলেন অ-সুর মহিষাসুরকে। শিব, বিশেষ ক'রে গাজনের মস্ত পাথরের দেবতা শিব এবং সাঁওতালদের মারাংবুরু একই দেবতা। কৃষ্ণও নারায়ণ নন্, রাখাল বালক ননীচোরা কৃষ্ণ। শিবের কারণেই হয়তো পার্বতী মূল্য পেয়েছেন বহুরূপীদের কাছে। তারা 'হরপার্বতী' সাজে। কিন্তু কখনোই তাদের লক্ষ্মী-সরস্বতী সাজতে দেখিনি। এসব হিসেব করেও ব্যাধ-বালকেরা বহুরূপী সাজে না। তারা রুটি-রুজির জন্যই বহুরূপী সাজে। শিব-কালী-কৃষ্ণ-হরপার্বতী এসব সাজে। রাম-ও সাজে। রামায়ণেই লেখা আছে পাথর-অহল্যাকে স্পর্শ করেই রাম জীবন দান করেছিলেন। এর ভিন্ন ব্যাখ্যাও দিয়ে থাকেন বহুরূপীকে ভালোবাসেন এমন মানুষজন। তাঁরা বলেন, এই রাম একজন অভিজ্ঞ এবং উন্নত কৃষক মাত্র। 'অহল্যা' অর্থ অহল্যাভূমি, কর্ষণ করা হয়নি এমন জমি। উন্নত কৃষক রাম সেই পতিত জমিকে কর্ষণ ক'রে সেখানে ফসল ফলিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ পতিত জমি চাষের ফলে চাষযোগ্য এবং ফসলের উপযুক্ত হ'য়ে উঠেছিল। ব্যাখ্যা যেরকমই হোক, শিবরাত্রিকে লক্ষ্য করে বহু শিব বেরিয়ে পড়েন সকাল হতেই তারকেশ্বর সংলগ্ন হুগলি জেলায়, আর শিশু কালী-কৃষ্ণ বা রামের দেখা মেলে সাঁইথিয়া-লাভপুর-বোলপুর স্টেশনে ট্রেন ধরতে গেলে। অবশ্য সারা বছরই এইসব বহুরূপীরা থাকেন, বহুরূপী লোকনাট্য দেখিয়ে 'ভিক্ষে' করেন। মনে হয় এইসব সাজের জন্য তারা অনেক ক্ষেত্রেই ভিক্ষুকের চেয়ে একটু বেশি মর্যাদা পেয়ে থাকেন, দু'টো বেশি পয়সাও রোজগার হয়। তাই বেশ কিছু দরিদ্র মানুষজন এখনো বহুরূপী সাজতে আগ্রহবোধ করছেন। বলা যায় বিষয়পুরের পাখমারারা এই শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এখন সবার ওপরে। তারাই জীবিকার কারণে সবচেয়ে বেশি বহুরূপী সাজে এবং তা—বাল্যবেলা হতেই।

লোকসংস্কৃতির গবেষক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন—(২৩/০৪/'০৫)—'২৪ পরগণার বহুরূপীরা মিলে গেছে বনবিবিপালার সঙ্গে। তাছাড়া বীরভূমে-বর্ধমানে বহুরূপী আছে। সেখান থেকেই তারা এখানে ওখানে যায়। গাজনীয়া সঙও আছে তারকেশ্বরে। কিন্তু বহুরূপীটা একটা পেশা।' তারকেশ্বরের কাছে হুগলি জেলার রসিদপুর গ্রাম, সেখানে শিক্ষক অমরনাথ মুখার্জীর বাড়ি। তাঁরা ছোটো থেকেই বহুরূপী দেখে আসছেন,—তিনি বলেন—'তারকেশ্বর এলাকায় যে সমস্ত বহুরূপী দেখা যায় তারা ভিক্ষে ক'রে বেড়ায় এবং অধিকাংশই শিব সেজে ভিক্ষে করে। সাধারণত এদের শিবরাত্রির সময়, চৈত্র-গাজনের সময় এবং শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালার সময় বেশি দেখা যায়।'

খোদ্ কলকাতাতেই প্রণবকুমার সরকারের মুখে শুনেছিলাম (২৪/০৪/'০৫)—'লোকবিশ্বাস আছে—হাসনাবাদের ভুরকুণ্ডা মোকাম হলো বনবিবির আদি বাসস্থান। মউলিরা

শুক্রবারে জঙ্গলে যায় না মধু সংগ্রহের জন্য, বাউলিরা যতদূর বলে দেয় তার বেশি তারা যাবে না কিছুতেই। শুক্রবার মা বনবিবি তাঁর আদি পীঠস্থান মক্কায় চলে যান। বনবিবি বাঘের দেবী থেকে নদীর দেবী হয়ে যাচ্ছেন, কখনো হয়ে যাচ্ছেন শীতলাও। লোকদেবতারা পাল্টে যাচ্ছেন। মউলিরা জঙ্গলে বাঘের দেশে গেলে বাড়িতে মেয়েরা অশৌচ পালন করে, ভিক্ষেও দেয় না। বাঘ বিষয়ে সুন্দরবন এলাকায় নানান প্রবাদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাতে সচেতন হওয়ার নির্দেশও থাকে'।

১. বাঘ-বাগদি-মোষ
তিনকে সৎ হোস ॥

২. সুন্দর বনের বাঘ
দো'জ বরের মাগ ॥

২৩/০৪/'০৫ তারিখে কলকাতার জীবনানন্দ সভাঘরে ড. সুহৃদ ভৌমিকের মুখে শুনেছি—'সুন্দরবন এলাকায় টুসু এবং গঙ্গা পুজো একাকার হয়ে গেছে। টুসু কোনো দেবতার ব্যাপার ছিল না। সুন্দরবন এলাকার গ্রাম এবং মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ-অঞ্চল থেকে বাহিত হ'য়ে সুন্দরবন এলাকায় এসেছে। ৫০/৬০ বছর আগেও সুন্দরবন এলাকায় পূর্ববঙ্গের একটিও লোক ছিল না। ওরা সব হালে এসেছে।"

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথানুসারে লোকদেবতার বদ্‌লে যাওয়ার একটা সূত্র-সন্ধান পাওয়া যায় —'তিস্তা নদী থেকে 'তিস্তাবুড়ি' দেবী হ'য়ে গেছে। সিন্ধু নদের তীরের অধিবাসীরা যেমন হিন্দু। টুসুও তেমনি কোথাও লক্ষ্মী, কোথাও চৌদল, কোথাওবা আরও অন্য কিছু।' ড. সৌমেন সেন ২৩/০৪/'০৫ তারিখেই শুনিয়েছিলেন—'লোকসংস্কৃতি সাধারণ সংস্কৃতি, প্রান্তিক বা নিম্নবর্গের সংস্কৃতি কথাটি ভুল। লোকসংস্কৃতির পুরোটাই স্বতঃস্ফূর্ত নয়, পরিকল্পিত এবং পরিশীলিতও বটে।' আবার এই বিষয়েই ড. মিহির ভট্টাচার্য বলেন—'একদিকে ইহবাদী দর্শন, অন্যদিকে ধর্মবাদী দর্শন। স্থানীক প্রেক্ষাপট তার সঙ্গে যুক্ত হয়েই গেছে। একদিন উপনিবেশিকতাকে অগ্রাহ্য করেই লোকসংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে অনেকগুলি ধারণা নির্মাণ করতে হয়। নারীপুরুষের ধারণা এমনই একটি। মানুষকে তার পুরনো ছন্দ থেকে উৎপাটনের একটি মাত্রা। ভোঁ বাজলে তাকে কলে-কারখানায় কাজ করতে চলে যেতে হয়। প্রাত্যহিক জীবনে বদ্‌লে দেওয়া হলো মাত্রা। শাক-সব্জি-জ্বালানি সংগ্রহ থেকে মেয়েদের সরিয়ে গার্হস্থে আনা হলো, পুরুষদের ঠেলে দেওয়া হলো বাইরের জগতে—কর্মের জগতে।' ড. মালিনী ভট্টাচার্য শোনান আরও স্পষ্ট কথা—'মাতৃতন্ত্র নয়, মাতৃপরম্পরা। শাসনদণ্ড কোনোকালেই নারীদের হাতে ছিল ব'লে ইতিহাস স্বীকার করে না। লোকসংস্কৃতির মানুষ একান্তভাবেই মাটির মানুষ। তাকে নিয়ে হাসা যায়, ঠাট্টা করা যায়, গল্প করা যায়। স্ত্রী আচারটা আমাদেরকে রাগায় না, অনেক বেশি সহনীয় ক'রে তোলে। ইহবাদের সঙ্গে বস্তু জগতের একটা নিবিড় সংযোগ রয়েছে। ন্যাচারাল ম্যাজিক যেমন, ভেজা ছোলার 'কল' বেরুচ্ছে আপনা-আপনি। লোকসংস্কৃতি-সাধারণ সংস্কৃতি, একে নিম্নবর্গের সংস্কৃতি বা অন্ত্যজ সংস্কৃতি না বলাই ভালো, তাতে আধিপত্য চাপানোর ব্যাপারটা থেকে যায়।' তিনিই নারীপরম্পরা বোঝাতে একটি সুন্দর লৌকিক ছড়াও শুনিয়েছিলেন—

'মোটামোটা পই-এর ডগা মুলুক চালের ভাত,
খেয়ে দেয়ে রইলাম বসে কে ফ্যালাবে পাত্?

মাচার ওপর থেকে তখন স্বামী বলছে—হাম ফেলেঙ্গা পাত্।' এভাবেই লোকসংস্কৃতির আগুন জুড়ে মিশে যাচ্ছে বস্তু জগত, দেবদেবীর ঘটছে মানবায়ন—রূপান্তর। মুখোশ এবং বহুরূপীর ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। বীরেশ্বর বাবুর মতানুসারে, ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকায় বনবিবির সঙ্গে বহুরূপীর একাত্মীকরণ ঘটেছে।

সুন্দরবন এলাকায় বিভিন্ন দ্বীপের বহু মানুষজন জঙ্গলে যান মধুসংগ্রহের জন্য। এদের বলা হয় মউলি। বাঘের থাবা থেকে বাঁচতে মুখের পেছন দিকে মাথায় তারা মুখোশ পরে মধু সংগ্রহ করে। এই মউলিরা খুবই গরিব। লবণাক্ত সুন্দরবনের জমিতে চাষ হয় না। ফলে মধুসংগ্রহই বহু মানুষের পেশা হ'য়ে উঠেছে। প্রতিবছর প্রায় হাজার খানেক মউলি যান মধু সংগ্রহ করতে। বেপরোয়া এই মধু সংগ্রহের নেশায় মউলিরা বাঘমারা-খনা-হরিণভাঙা-চাম্‌টা-ঢুলিভাসানি-আজমলবারি প্রভৃতি দ্বীপের গভীর জঙ্গলে চলে যায়। দ্বীপগুলি বাঘ অধ্যুষিত। সুন্দরবনের বাঘকে 'বড়মিঞা' নামে ডাকেন মউলিরা। মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে এই বড়-মিঞার সঙ্গে চলে তাদের লুকোচুরি খেলা। সবাই যে বাড়িতে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসবেন তারও কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। তাই বাড়িতে বাড়িতে স্ত্রীরা পালন ক'রে বিধবার পালন। গায়ে-মাথায়-তেল-সাবান মাখেন না, চটি পরেন না। শুধু ফুল-মধুর নৈবেদ্য দিয়ে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে বনবিবির পুজো করেন। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে পুরুষের কল্যাণ কামনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মধু পাওয়ার ইচ্ছেও প্রকাশিত হয় তাতে। বাড়ির 'মরদ' ফিরে না আসা অবধি স্ত্রীরা বিধবার আচার পালন করে থাকেন। পেছনে মুখোশ পরার মধ্যে একটি কল্পিত লোকবিশ্বাস কাজ করে সবসময় আর মধুসংগ্রহের মধ্যে থাকে বস্তু বিশ্বাস। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা চলতে থাকে। বহুরূপীর জীবনেও আছে নানান ঝুঁকি। সব মিলিয়ে বনবিবির পালার ভেতর বহুরূপীর একটি অস্পষ্ট হলেও ছায়া থেকে যায়। গাজনের সঙের মধ্যেও বহুরূপীর আছে স্পষ্ট ছাপ। আজকাল বহুরূপীরাও মুখোশ ব্যবহার করে। অবশ্য লোকসংস্কৃতির মূলকথাটিই হলো মিলন—মহামিলন। সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ও পরিচয়।

বাংলার বহু গ্রামেই চৈত্র মাসটিতে চলে শিব কেন্দ্রিক গাজনের উৎসব। বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের কালেখাঁতলা পঞ্চায়েতের মুড়াগাছা গ্রামের গাজনের সঙ্ বহু প্রাচীন। এলাকার প্রবীণ মানুষেরাও ছোটো থেকেই এই সঙ্ দেখে আসছেন, কবে কখন এই মুড়াগাছায় সঙ্ দেখানো শুরু হয়েছে সে ইতিহাস তাঁদের জানা নেই। কৃষিপ্রধান এই গ্রাম। এলাকায় যারা ১১ মাস জুড়ে খেত্‌মজুরের কাজ করে, চৈত্র মাসটিতে তারাই যায় পাল্টে। গাজনের সঙ্ সেজে নেচে-গেয়ে তারা মাতিয়ে রাখে সারা গ্রামকে। ১৪ থেকে ৬৪ বছরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরুষেরা এই সঙ্-এ অংশগ্রহণ ক'রে। পুরুষেরাই মেয়ে সাজে। একটি দলে ৫৫ থেকে ৬০ জন থাকে। চৈত্র মাসের প্রথম শনি বা মঙ্গলবার দেখে সন্ন্যাস নেওয়া শুরু হয়। একমাস জুড়ে এই গাজন সন্ন্যাসীর পালন। পরিবারের সঙ্গে যোগ রাখা যাবে না। কেউ এই সময় মারা গেলেও অশৌচ পালনীয় নয়, নারী সংসর্গও নিষিদ্ধ। আসলে এখানেও রয়ে গেছে যৌথ জীবন-যাপনের প্রাচীন এবং লোকপ্রিয় প্রথাটিই।

৬০ বছর বয়সী জগন্নাথ দাস ৩৫ বছর ধরে সঙ্ সেজে গাজনের গান গাইছেন। এহ লোকশিল্পী বলেন—'গাজনের সন্ন্যাসীরা এই একটা মাস সঙে্ মজে দারিদ্র্য ভুলে যায়। নানান দেবদেবীর বেশে তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সঙ্ দেখিয়ে গাজনের গান শুনিয়ে বেড়ায়। গাজনের শিব-পার্বতীর সঙ্কে গ্রামের মানুষ দেবদেবী জ্ঞানেই বিচার করেন। ৩১ চৈত্র উৎসবের শেষ হয় চড়কের মধ্য দিয়ে। নতুন বছরেব প্রথন দিনটিতে 'নিমভাত' খেয়ে সঙের দেবতারা আবার মানুষ হয়ে যায়। তখন ফেব শুরু হয় জীবন-যাপনের লড়াই।'

বীরভূম জেলার বিষ্ণুপুরে জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র ক'রে পরের দিন নন্দোৎসবে সঙ্ সাজে গ্রামের মানুষ। তবে এই সঙে্র দলে উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের দেখা যায়নি কখনো। এখানেও পুরুষেরাই নারী সাজে। রাধা-কৃষ্ণ-নন্দঘোষ-শিব-সেজে নাচ-গানের মধ্য দিয়ে চলে গ্রাম পরিক্রমা আর রসদ সংগ্রহ। সঙ্গে থাকে ঢোল-খঞ্জনির বাজনা। গানের মতোন ক'রে তারা যে ছড়াটি বলে সেটি হলো—

কী আনন্দ হইলোরে ভাই
কী আনন্দ হইলো,
লুচির উপর তালের বড়া
ঠেল্যাতে লাগিলো ॥
শিব নাচে ব্রহ্মানাচে
আর নাচে ইন্দ্র,
গোকুলে গোয়ালা নাচে
পাইয়া গোবিন্দ ॥

কৃষ্ণের জন্মকে কেন্দ্র ক'রে এই আনন্দোৎসব, এই সঙ সাজার ধুম। মেদিনীপুর জেলার লোকনাটক 'ভাঁড়যাত্রা'র ভেতরও এই সঙের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-মালদহের গম্ভীরা এবং আলকাপের মধ্যেও এই সঙের উপকরণ আছে। আলকাপে 'সঙাল' বা 'কোপ্যা' নামে একজন বঙ্গাভিনেতার চরিত্রও রয়েছে। সে কখনো-সখনো হনুমান সেজে 'হুপ' শব্দে মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে পাঠ বলতে শুরু করে। মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে একসময় লোকায়ত যাত্রাপালা 'চড়িয়া-চড়িয়ানী'র যথেষ্ট প্রচলন ছিল। সেখানেও বহুরূপ গ্রহণ করতো চরিত্ররা। তাদের পালার মধ্যে 'সতী মালতী', 'সতী চম্পাবতী' 'বাঘাম্বর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সেখানে 'বাঘ' সাজার একটা প্রবণতাও ছিল।' বাংলা ও ওড়িশার লোকসংস্কৃতির সমন্বয় সূত্রে বাঁধা এই ধারাটি এখন অনেকটাই স্তব্ধ। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে বিজয়া দশমী থেকে দ্বাদশী এই তিনটি দিন জনজীবন মেতে থাকে 'রাবণ কাটা' উৎসবে। পুজোব পরই উৎসবের সূচনা। নাচের প্রধানত চারজন শিল্পী। তাদের কেউ সাজেন হনুমান, কেউ জাম্বুবান, কেউ সুগ্রীব, কেউবা কুমার অঙ্গদ। আর থাকে হনুমানের দল। মুখোশ পরে এবং বিচিত্র সজ্জায় চার প্রধান নৃত্যশিল্পী বেরিয়ে পড়েন দশমীর সকাল থেকে। বিচিত্র নৃত্যের সঙ্গে থাকে সুরেলা ঝাড়খণ্ডী বাজনা। নাচে ফুটে ওঠে যুদ্ধ জয়ের আনন্দ। মূল সূত্রে বাঁধা থাকে রাক্ষসদের পরাজিত ক'রে রামবাহিনী হনুমানদের সীতা উদ্ধারের কাহিনি। এই নাচে হাতের বা হাতের আঙুলের তেমন

বিশিষ্ট কোনো মুদ্রা থাকে না, থাকে পায়ের কাজ। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচের মুখোশের আদলেহ হনুমান বাহিনীর মুখোশ তৈরি হয়। দলে থাকে প্রধানত চারজন নৃত্য শিল্পী, জনা চারেক বাজনদার এবং একজন হলেন পরিচালক নির্দেশক। দুর্গা পুজোর পরের তিনটি দিনই এরা এইসব নাচ করে। অন্য সময় কেউ কাঠের কাজ করে, কেউ বেচে সব্জি। নাচের শেষে দ্বাদশীর দিন মূল অনুষ্ঠানটি হয় রাধানাথজিউর মন্দির প্রাঙ্গণে, অষ্ট ধাতুর রাম-সীতার সামনে অনুষ্ঠিত হয় রাবণ বধের পালা। আগে থেকেই তৈরি করা থাকে কাঁচা মাটির রাবণ, হনুমান বাহিনীর হাতে থাকে টিনের তরবারি। তাই দিয়েই হনুমানেরা একে একে রাবণের হাত-পা কেটে ফেলে, আর সেই খণ্ডিত মাটির অঙ্গ নিয়ে শুরু হ'য়ে যায় কাড়াকাড়ি। লোকবিশ্বাস আছে, কাটা রাবণের এই মাটি ঘরে রাখলে মশা-মাছির উপদ্রব কম হয়। বিষ্ণুপুরের প্রবীণেরা বলেন—'সম্ভবত ১৭০২ সাল থেকে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের শাসনকালে বিষ্ণুপুরে এই রাবণকাটা উৎসবের সূচনা হয়।' এই উৎসবের মধ্যেও শিল্পীদের হনুমান সাজার একটা আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। আবার বহুরূপীদের ক্ষেত্রেও অন্যান্য জীবজন্তুদের মধ্যে হনুমান সাজার প্রবণতাটিই বেশি।

গুজরাত রাজ্যের আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় 'সিদ্ধিধামাল' নৃত্য। এই নাচে মাথায় এবং কোমরে ময়ূর পাখা গুঁজে, মুখে রং মেখে আর নানান বর্ণের আঁকিবুকি দিয়ে, সাদা রঙে দাড়ি-গোঁফ বানিয়ে নাচ করে শিল্পীরা। বেড়াল বা শূয়োরও সাজে তারা ওইভাবেই। 'জীভা' নৃত্যেও মুখোশের চল্ আছে। জাপানের 'কাবুকি' নাচেও মুখোশের ব্যবহার আছে। 'ছৌ'-নাচের সঙ্গে 'কাবুকি' নাচের সাযুজ্য খুঁজে পেয়ে একালের খ্যাতিমান কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর একটি বই-এর নামই দিয়েছেন—'ছৌ-কাবুকির মুখোশ'। কবি বহুদিন জাপানে ছিলেন।

সম্প্রতি ছেলের কাছে প্রায় ৪/৫ মাস আমেরিকা-লণ্ডন ক'রে ঘুরে এলেন গবেষক ড. শক্তিনাথ ঝা। তিনি আগ্রহের সঙ্গেই ওসব দেশের লোকোৎসবগুলি সুযোগ পেলেই দেখেছেন। সেখানে তিনি দেখেছেন, দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন—যেখানে সেখানে 'ড্যামি' মানুষের অবস্থান। মানুষ ড্যামি সেজে মুখে রঙ মেখে, বর্ণময় জামাকাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে, শিশুদের আনন্দ দিচ্ছে। বিশেষ করে লণ্ডনের 'এডিনবরা উৎসবে' এই বহুরূপ ধারণের ইচ্ছেটা তিনি প্রবলভাবে লক্ষ্য করেছেন। আমেরিকা-জাপানেও এমন বহুরূপী আছে, লম্বা বাঁশে চেপে আমাদের দেশের রণ'পা শিল্পীদের মতো তারা জমকালো পোশাক-আশাক পরে মুখে রঙ মেখে জোকারের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে। জনসাধারণকে—বিশেষ করে শিশুদের তারা আনন্দ দিচ্ছে। 'আসলে সারা বিশ্বেই এই লোকায়ত ঘরানাটি আছে এবং এটি বহু পুরনোই। তবে সবখানে এই নাট্যায়ন জীবিকা হ'য়ে ওঠেনি। নয়-ও। কিন্তু উৎসবগুলিতে তারা নানান সাজ সেজেই থাকে।' কেরালা দাক্ষিণাত্যের 'কথাকলি' নাচেও মুখোশ এবং রঙ ও সাজের মধ্য দিয়ে রূপ পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হ'য়ে আসছে বহুদিন। বহু আগে বাংলার বাউলরাও নাচ-গান করার আগে গায়ে গুদুরি পরতো এবং মুখেও সামান্য রঙ মাখতো। চোখের ভুরুতে-কপালে-কানে তিলক আঁকতো। এগুলিকে অবশ্য বলে বাউলের 'অঙ্গরাগ'। বীরভূমের গাজনে-কীর্তনে ধূলোটের দিন দলের আগে আগে বাটি হাতে রাধাকৃষ্ণ সাজে দু'জন চল্‌তো। পিছনে চল্‌তো সঙের লোকেরা। সবিশেষ খ্যাতি আছে বীরভূমের তাঁতিপাড়ার সঙের।

কলকাতাতেও ছিল জেলেপাড়ার সঙের সুনাম। বাংলায় ব্যবহৃত এই 'সং' বা 'সঙ' শব্দটিকে কেউ বলেছেন দেশি, কেউ বা বলেছেন 'স্বাঙ্গ' শব্দ জাত। বঙ্গীয় শব্দকোষ অভিধানে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ বিস্তৃতভাবেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. আপনার বাস্তবিক রূপ ঢাকার নিমিত্ত ধৃত কৃত্রিম বেশ, হাস্যোদ্দীপক বেশধারী ঢঙ।

২. কৌতুক জনক অভিনয়, তামাসা।

৩. রঙ্গস্থলে বিকৃত আকারে বা অঙ্গভঙ্গীতে দর্শকের কৌতুক জন্মানো; যাত্রায় 'সঙ' দেওয়া।

৪. কৌতুককর হাস্যজনক বিষয়ের বা সামাজিক কুৎসিত বিষয়ের প্রতিমূর্তি বা চিত্র।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—ছদ্মবেশ অর্থে 'সঙ্' শব্দটি বাংলাদেশে খ্রিস্টিয় আঠারো শতকের শেষ দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার 'সমাঙ্গ' শব্দ হ'তে উত্তর ভারতের হিন্দী ভাষায় 'সওঁআঙ্গ' এবং বাংলার 'সরঙ্গ > সঙ বা সং' হয়েছে। যাইহোক, নিজের স্বাভাবিক চেহারাকে ঢাকা দিয়ে কৃত্রিম পোশাক প'রে নানান অঙ্গভঙ্গি ক'রে উদ্ভট হাস্যকর শব্দমালা সাজিয়ে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে লোক-হাসানো বা জনগণকে মজা ও আনন্দদানই সঙের মূল উদ্দেশ্য। তথাপি সঙের প্রয়োগকলা শুধুমাত্র কৌতুক-অভিনয় ও রঙ্গতামাসার মধ্যে সীমাবধ্ধ ছিল না। সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, কুৎসিত-কাণ্ড, রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অধঃপতন-কথা, প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে পরিবেশিত হতো সঙের মাধ্যমে। সমাজ-সংস্কারের কথাও থাকতো। থাকতো নির্মল আনন্দদানের নানান উপকরণও। দোল্-দুর্গোৎসব-শিবপুজো-জন্মাষ্টমী-ধুলোট-ধরমপুজো-চৈত্রসংক্রান্তি প্রভৃতি উৎসবকে কেন্দ্র করেই সঙের আয়োজন হতো গ্রাম-বাংলায়। বস্তুবাদের সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধন আরকী।

সৃষ্টি-লয়ের দেবতা যে শিব, তিনিই নেমে আসেন সঙের লোকায়ত আঙনে ভিক্ষুকের বেশে। সংসারে তাঁর দারুণ অভাব, স্ত্রী দুর্গা-অন্নপূর্ণা অভাবের কারণে তাঁকে মুখ-ঝাম্‌টা দেন। তিনিও ছাই-ভস্ম মেখে নেশা ক'রে নন্দী-ভৃঙ্গীদের সঙ্গে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান। একেবারে গ্রামজীবনের অভাবী কৃষক জীবনের বাস্তব ছবি। এই ঘরোয়া সঙের দৃশ্যটিতে শিব-দুর্গা থাকলেও, বেশ বোঝা যায় এ শিব দারিদ্র্য পীড়িত বাংলার অজস্র কৃষক মানুষেরই একজন প্রতীক প্রতিনিধি। এ শিব সংস্কৃত শিব নয়, একেবারে লোকায়ত শিব-ভোলানাথ। শিব গাজনের এবং সঙের শিবের সঙ্গে অন্তর্লীন হ'য়ে আছে বাংলার দুঃখ-দারিদ্র্য মথিত গ্রামজীবনের নিখুঁত চিত্র। সেখানে শিব-দুর্গা উপলক্ষ্য মাত্র। 'এ শিব চাষির শিব/এ শিব কৃষক শিব/দেবতা উপমা'।

শিবগাজনের মতোই রাঢ়বঙ্গে বৈশাখি বুদ্ধপূর্ণিমায় পালিত হয় ধর্মরাজের পুজো। এই ধরমপুজোতেও সঙ্ দেখানোর একটি ব্যাপার রয়ে গেছে। তাছাড়াও আছে ভক্তদের কৃচ্ছ্রসাধনের নানান আচার-অনুষ্ঠান। বিষয়পুরের বহুরূপীরা নিজেরাই একটি ধরমপুজোর আয়োজন করে, তারাই ভক্ত হয় সেখানে। বীরভূম জেলার নলহাটি থানার কুরুমগ্রামে একসময় সরস্বতী পুজোর সময় 'বানবত্' উপলক্ষ্যে সঙের দল বেরুতো। সন্ধ্যাকালে মশাল জ্বেলে বাদ্যি বাজিয়ে সঙের দল নেচে গেয়ে গ্রাম পরিক্রমা করতো। এখন সেসব বন্ধ হ'য়ে গেছে। তবে রাজনগর থানার তাঁতিপাড়া গ্রামের সঙ্ প্রচলিত ধারার থেকে অনেকটাই পৃথক এবং গুণমানের দিক থেকে

অনেকখানি নাট্য-শিল্পের কাছাকাছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বীরভূমের বহু গ্রামেই সঙের প্রচলন ছিল, তাঁতিপাড়ার সঙ চলেছিল বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত। ধরমপুজোকে কেন্দ্র করে টানা চারদিন ধরে রকমারি সঙের অনুষ্ঠান হতো তাঁতিপাড়ায়।

নানান ভাঁড়ামো ক'রে এবং সঙ্ সেজেই মানুষের জীবন কেটে যাচ্ছে সংসারে। যা নই তাই দেখানো এবং যা সত্য তাকে লুকোনোই সংসারের সার কথা। সঙের মধ্যেও বোধহয় সেই অহৈতুকি আনন্দ আর নিজেকে অন্যরকম সাজানোর একটি ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে সঙের মধ্যে জীবিকার কোনো প্রশ্ন নেই। হালকা চালের বহুরূপীরা অনেকটা সঙের মতোন আদব-কায়দা করলেও সঙ দেখিয়ে জীবন ও জীবিকা পালন করছেন এমন কোনো মানুষ এ বাংলায় নেই। তাছাড়া দিন দিন সঙের প্রচার ও প্রসার কমেই আসছে।

নদিয়া জেলার ফুলিয়া—তাঁতিপাড়াতেও চৈত্রের শেষ সপ্তাহ থেকে পয়লা বৈশাখ ভোর পর্যন্ত গাজনের অনুষ্ঠান হয়। এই ক'দিন প্রতিটি সন্ধ্যায় প্রায় শিবের পুজো হয়ে গেলেই হবিষ্যান্ন খাওয়ার পর সঙযাত্রার আসর বসে। গাজনের সন্ন্যাসীরাই সঙের পাত্রপাত্রী সেজে অভিনয় করে। সঙযাত্রার শুরুতেই হয় 'দেল্ বন্দনা' অর্থাৎ শিবের বন্দনা। সঙ্যাত্রার আসরে রঙ মেখে, পরচুলা পরে, বুকে কাঁচুলি বেঁধে, রঙবেরঙের শাড়ি পরে ছেলেরাই মেয়ে সাজে। নাচে, গান গায়। এই ছড়া-গানগুলি পালার মতোন করে লেখা। সঙ্যাত্রার আসরে অনেক সময় দু'তিনটি দলও অংশ নিয়ে থাকে। ঢোল-করতাল-বাঁশি-দোতারা-মৃদঙ্গ-খঞ্জনি-হারমোনিয়ম সব বাজানো হয় সঙ্যাত্রায়। থাকে দোহারকিরাও, মূল গায়েনের গানের তারা ধুয়া তোলে। বন্দনা—পরিচিতির পর মূল পালা। খুব হাল্কা এবং ছোটো ছোটো ঘটনা দিয়ে শুরু ক'রে জটিল বিষয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গল্পটিকে। যদিও সঙ্যাত্রার মূল লক্ষ্যটাই হলো হাসি, নির্মল হাসি আর আনন্দদান। লোক হাসাতে গিয়ে সঙের শিল্পীরা ভাঁড়ের নানান অঙ্গভঙ্গি ক'রে নাচে, রঙ্গরসের কথা বলে। অশ্লীলতার রসে ভেজানো শব্দ-সম্ভারও সেখানে বাতিল ব'লে গণ্য হয় না। এই সঙ্যাত্রায় বহুরূপ গ্রহণের মধ্যে কিন্তু বহুরূপী নেই, আছে হালকা চালের যাত্রাপালা। অনেকটা মালদহ-মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের আলকাপের মতোন। অবশ্য সাজ-পোশাক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরিত্রদের মুখে মুখোশের ব্যবহারও রয়েছে।

অবশ্য মুখোশের জৌলুসে ভরা ছো > ছৌ > ছৌনাচ এখন পুরুলিয়া থেকে বিশ্বের লোকসংস্কৃতির আঙিনায় সদর্পে প্রতিষ্ঠিত। কথাকলি নৃত্যের মতোই ছৌনাচেও মুখোশ বাদ দিলে নাচটিকেই বাদ দিতে হয়। মুখ আর মুখোশ দুইই ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। মুখভঙ্গিমা অভিনয় ও নাচের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত। পুরুলিয়া-মানভূমে 'ছৌ' শব্দটি 'ছো' বা 'ছ' হিসেবে বিবেচিত হয়। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন 'ছৌ-নৃত্য'। মুখোশ পরার পর একটি কল্পিত চরিত্র হিসেবে উঠে দাঁড়ায় ছৌ-শিল্পীরা। ছৌ-শিল্পীরা পরিণত হয় তখন এক একজন টাইপ চরিত্রে। সঙ, কাপ, ছৌনাচ, মাছানি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বাস্তব থেকে পরাবাস্তবের দিকেই চরিত্রদের ঝোঁক বেশি। পুরাণকাহিনিতে এ দু'য়ের সীমারেখা অনেকটাই মুছে গেছে। সেখানে ভূতপ্রেত, দেবদানব, রাক্ষস-খোক্কস, জন্তুজানোয়ার সবাই নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়ায় মানুষের প্রতিবেশী হয়ে। একেই বোধহয় সার্বিক মানবায়ন বলে,

লোকআঙনেই যার গতায়ত সর্বাধিক। এ্যারিস্টটল এটি লক্ষ্য করেই বলতে পেরেছিলেন—আর্টের জগতে যুক্তিরহিত বাস্তবের চেয়ে যুক্তিসঙ্গত অবাস্তবের সমাদর বেশি। তিব্বতিরা দেবদানবের আনুকূল্য অর্জন বা প্রতিকূলতা মুক্ত হবার জন্য অনেক সময় মুখোশ সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করতো। বিচিত্র সব মুখোশ পরে নানান পৌরাণিক ঘটনাকে অবলম্বন করে পাপ-পুণ্যের প্রতীক হিসেবে নাচ হতো। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ লামারাও সেই মুখোশ নাচকে প্রশ্রয় দিয়ে আরও উন্নত করে তুলেছেন। লামারা শ্রেষ্ঠ মুখোশ নৃত্যটি পরিবেশন করে লাসায়। এই নাচটির নাম সেখানে 'ছাম্'। তিব্বতিয় পুরাণে দেবদৈত্যেব বিরোধকে কেন্দ্র করেই মুখোশ নৃত্যের অবতারণা হয়ে থাকে। মুখোশ রচনার ক্ষেত্রে এবং মুখোশের ব্যবহারেও তিব্বত অঞ্চলই ভারতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারদর্শী অঞ্চল। তিব্বতি মুখোশ আর্টের দিক দিয়েও অতুলনীয়। ছৌ-নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার আদিম যুগ থেকেই চলে আসছে। আগে মুখোশগুলিও ছিল ভয়াবহ। এখন অবশ্য মুখোশে ভয়াবহতা কমে এসেছে। ছৌ-নাচের মুখোশে ভয়ের চেয়ে হাস্যরসেরই উদ্রেক ঘটে বেশি। মুখোশ একটি পণ্যসামগ্রী। বরং বহুরূপীরাই আগে মুখোশ ব্যবহার করতো না, এখন রাক্ষস-টাক্ষস সাজতে মুখোশ পড়ছে তারা।

আদিবাসী সমাজ বিষয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করে আসছেন ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে। গত ২৩.০৪.২০০৫ কলকাতার 'নন্দন' চত্বরে এক সাক্ষাৎকাবে তিনি আমাকে বেশ স্পষ্ট করেই জানান—'আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে বহুরূপী প্রথা নেই। অতীতেও ছিল না। ওভাবে বহুরূপী দেখিয়ে কোনো আদিবাসী সাঁওতাল জীবিকা নির্বাহও করে না।'

ওই একই দিন 'জীবনানন্দ সভাঘরে' লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী উপেন কিস্কু বলেন—'পৃথিবীতে ৩০ কোটি আদিবাসীর বাস, তার মধ্যে অর্ধ উন্নত দেশ—আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ ভারতেই রয়েছেন ৮কোটি আদিবাসী। এঁরা বিজ্ঞান না শিখেই প্রকৃতি-পশু-পাখির আচরণ পর্যবেক্ষণ ক'রে অনেককিছুর আগাম-খবব দিতে পারেন। যেমন 'কাভার পাখি' ডাকলে ১/২ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি আসবে, কুলগাছে 'র‍্যা-ব্যাং পোকা' ডাকলে বুঝতে হবে খুব গরম পড়বে। শালগ্রাম শিলা হিন্দুদের দেবতা, আদিবাসী সাঁওতালরাও পাথরপুজো করে। সুনামিতে এত ব্যাপক ক্ষতি হলেও সেখানের আদিবাসী জারোয়াদের কোনো ক্ষতি হয়নি, সংকেত বুঝেই তারা ৪৮ ঘণ্টা আগে থাকতেই দূর পাহাড়ে উঠে গিয়েছিল। সাঁওতালদের পট আছে কিন্তু বহুরূপী সাজতে তাদের দেখিনি।'

১৬/৩/'০৫ তারিখ গবেষক অধ্যক্ষ ড. সুধীর করণ স্পষ্ট ভাষায় আমাকে জানিয়েছেন—'হিন্দু সমাজের নিচু তলার অভিনয় প্রিয় মানুষেরাই বহুরূপী সেজেছে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব প্রভাব নয়, এর সূত্র বৈদিক বা প্রাক-বৈদিক আমলে পাওয়া যাবে। 'পাখমারা' বলে কোনো জাত নেই। 'লোয়ার কাস্ট অফ দি পিউপিল'। ট্রাইব্যাল হিসেবে 'ব্যাধ' আমার চোখে পড়েনি। হিন্দু সমাজের অভাবী নিচুতলার মানুষজন উপজীবিকা হিসেবে এটা গ্রহণ করেছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এবং প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রেও বহুরূপীদের দেখা পাওয়া যায়। কালিদাসেও বহুরূপী আছে। বৈদিক আমলেও ছিল। ঝাড়খণ্ডে-মেদিনীপুরে বাল্যবেলায় দেখেছি, এখন আর দেখতে পাই না। 'ছৌ' বহুরূপীর সঙ্গেই যুক্ত। ধর্মের গাজন আর শিবের গাজনে সঙ আছে, তারা হরগৌরীর বিয়ের দৃশ্য দেখায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বহুরূপীর কথা

আছে, যাদের গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োগ করা হতো। ম্যাকডোনেল-এর Vedic Index-এও বহুরূপীর উল্লেখ আছে।'

আমোদপুরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ২৭.০৫.২০০৪ তারিখ তাঁর বাড়িতে বসেই অনেক কথা জানিয়েছেন—'মায়া হলো দেবতা ও অসুরদের সোর্স। এর মাধ্যমেই তাঁরা রূপ বদল করতে পারতেন। রামায়ণ-মহাভারতে এই রূপ বদলের কথা আছে। অগ্নিদেব নাকি রূপ বদল করেই বহু বিশিষ্ট নারীকে সম্ভোগ করেছিলেন। শুধুমাত্র বশিষ্ট ঋষির পত্নী অরুন্ধতিকেই ঠকাতে পারেননি। তাই আকাশে অজস্র তারার পাশে অরুন্ধতিকে দেখিয়ে আজও বলা হয়—ওর মতো সতী হও। সাঁইথিয়ার রতন বহুরূপীকে দেখেছি খুব প্রাণবন্ত। রতন বহুরূপীর যে ফ্রিনেস, যখন যা করেছে—তা যেন নিজস্ব সত্তা দিয়েই করেছে। যে কোনো রকমের অভিনয় হোক না কেন, ওই ফ্রিনেসটা দরকার। আমি ভণ্ড সাধুবাবা ব'লে খোল বাজাতে লাগলো। তবে লোকসাহিত্যের লোকসঙ্গীতের যে যুগপোযোগী পরিবর্তন হয়েছে, বহুরূপীরা তার সামিল হতে পারেনি। তারা এখনো ভিক্ষুকই থেকে গেছে। রতন একটা রস সৃষ্টি করেছিল, শ্রোতাদের তৃপ্তি দিতে পেরেছিল, এখন সে ধারাটাও নেই। নিস্তরঙ্গ শান্ত গ্রাম-জীবনে বিনোদন বলতে যখন কিছু ছিল না তখনই এইসব সঙ্-বহুরূপীর কদর ছিল, মানুষ মুগ্ধ হয়ে সেসব দেখতো-শুনতো। তাদের ভালোবাসতো। এখন তো প্রচুর আইটেম।'

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সন্তু সেনগুপ্ত ৩৩ বছর ধরে চালিয়ে আসছেন একটি সংবাদ পত্রিকা। বহুরূপীর উৎস ও প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা—'রূপ পরিবর্তন দেবদেবীরাও করেছেন। বহুরূপ ধারণ করেছেন দেবী দুর্গাও। তাঁকে বলা হয় দশমহাবিদ্যার দেবী (কালী-তারা-ষোড়শী-ধূমাবতী-কমলা-ছিন্নমস্তা-বগলা-ভৈরবী-মাতঙ্গী-ভুবনেশ্বরী)। ইন্দ্র তো রূপ বদল ক'রে গুরুর ছদ্মবেশে গুরুপত্নীকে ভোগ করার শাস্তি পেয়েছিল 'সহস্র যোনি'র, অহল্যাও হয়েছিল পাথর। মহাভারতে অর্জুন বৃহন্নলা সেজে নাচ-গান শিখিয়েছে, জীবিকা হিসেবে রন্ধনশালাতেও অংশগ্রহণ করেছে। রামায়ণের রাক্ষসেরাও রূপ বদল করতে পারতো। মারীচ এমন সোনার হরিণ সেজেছিল যে সীতারও ভুল হয়েছিল তাকে দেখে, তার ডাকও রামের ডাকের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। 'ভাই লক্ষ্মণ' শুনে সীতাও মনে করেছিল—ওটি রামেরই ডাক। চণ্ডিতেও মহিষাসুর মহিলার ছদ্ম বেশ ধারণ ক'রে মেধস মুনির আশ্রমে গিয়ে যজ্ঞের 'হবি' খেয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া তারকা-পুতনা প্রভৃতি রাক্ষসীদের বহুরূপ ধারণের কথা আছে। দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে মহিষাসুর বারবার রূপ বদল করেছে। এ জগৎ সংসার বহুরূপীর সংসার।'

সাঁইথিয়া স্টেশনে গ্রীষ্মের ভরা দুপুরে রাম আর লক্ষ্মণ বসেছিল। দু'জন বহুরূপী। ট্রেনে যাবে রামপুরহাট। ট্রেন আসতে তখনও দেরী। মাথায় চূড়া করে চুল বাঁধা, গায়ে চুমকি-জরি খসে পড়া বিবর্ণ-রাজ-পোশাক। পাশে ধনুক ধরাশায়ী। সীতা অন্বেষণের লেশমাত্র প্রচেষ্টা নেই। ট্রেন আসতে দেরী দেখে লক্ষ্মণ বিড়ি ধরালো। তারপর আগুন সহ একটি বিড়ি এগিয়ে দিলো রামের দিকে। অসীম ভ্রাতৃভক্তি। দু'জনেই ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। রিং করছে। অভাবের দগ্ধচিতা দু'চোখের কোলে। জানালো—'সীতার খোঁজে যাচ্ছি না দাদা, যাচ্ছি পেটের ভাতের খোঁজে।' রামের নাম উত্তম মণ্ডল, বয়স ৪৪, বাড়ি বিষয়পুর। লক্ষ্মণের নাম লক্ষ্মণ-ই, বাড়ি একই জায়গায়, বয়স ৩০/৩২ হবে। এভাবেই দিন চলে যায় দরিদ্র বহুরূপীদের। উত্তমের

বিঘে তিনেক জমি আছে, বর্ষায় চাষ-আবাদ করে, অন্য সময় তারা বহুরূপী দেখিয়ে বেড়ায়। লক্ষ্মণ তার নিজের ভাই। সাঁইথিয়া স্টেশনে সকাল থেকেই বহু শিশু-বহুরূপীকে দেখা যায়। তারা রাম-হনুমান ইত্যাদি সাজে, তারপর ট্রেন এলে ট্রেনে চেপে যাত্রীদের কাছে অভিনয় কলা দেখিয়ে ভিক্ষে করে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, তাঁর জীবনে 'ছিনাথ বহুরূপীর' মতোনই প্রায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ধমান শহরেই থাকেন। 'বোশেখ মাস। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। সকাল থেকেই কাঠফাটা রোদ। পথে পা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বাইরে কোথাও জনপ্রাণীটি নেই। বিকেল হতেই কালবৈশাখী— ভীষণ ঝড়। ঘুটঘুটে আঁধার। ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি। তার সঙ্গে শিলা। দরজা বন্ধ করে শুয়েছি। ঘুমটা লেগেছে কি লাগেনি। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বড়ো ছেলে কলেজ থেকে ফিরবে ভেবে যেই না দরজা খুলেছি, দেখি স্যুটেড-বুটেড-টুপি-গগল্‌স আঁটা এক যুবক। ইয়া গোঁফ, কুচকুচে দাড়ি, এক হাতে পিস্তল, এক হাতে ভোজালি। সে ঢুকেই দরজা এঁটে দিলে। বুকের কাছে পিস্তল রেখে বললে— 'রা-টি কারবেন না। ভেতরে চলুন।' ছুটে এলেন আমার মা, স্ত্রী ও ছোটো পুত্র। সক্কলে ভয়ে কাঠ। যুবক মোটা গলায় বললে— 'দেরি করবেন না, স্টিলের আলমারিতে যা আছে এই ব্যাগটায় ঢুকিয়ে দিন।' হঠাৎ দেখি ও ভোজালি ঘোরাচ্ছে। আমার মা ও স্ত্রী মূর্ছা যায় যায়। ছেলেটা কাঁদছে। ও ভোজালি দেখিয়ে ছেলেকে শাসালে— 'চোপ'। প্রাণভয়ে আমি স্টিলের আলমারি খুললাম। টাকা-পয়সা-গয়নাগাঁটি সব ওর ব্যাগে দিতে দিতে বললাম— 'সবই দিচ্ছি কাউকে মেরো না।' হঠাৎ-ই আমি পড়ে গেলাম। অমনি যুবক হো হো করে হেসে উঠল। এবার যেন নিজের গলায় বললো— 'কাকু আমাকে চিনতে পারলেন না'? বলেই সে আমাকে তুলে বিছানায় বসালো। মুহূর্তে ডাকাতের সাজ খুলে ফেললো। আমি চিৎকার করে বলে উঠ্‌লাম— 'আরে জহর যে'। জহর বহুরূপী। ও আমার পায়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। টিনের রং করা ভোজালি ও খেলনা পিস্তল আমার ছেলের দিকে ছুঁড়ে দিলো। চেটানো গোঁফ-দাড়ি আর টুপিও খুলে রাখলো আমার স্ত্রীর কাছে। আমি কাঁদবো কী হাসবো, বক্‌বো কী মারবো। চিৎকার করে উঠলাম— 'বাঁদর, সাজ দেখাবার আর জায়গা পাওনি'। দেখি জহর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বললে— 'আজ সাজ দেখাতে পারিনি কাকু। ভীষণ রোদ। কেউ ঘর থেকে বেরুলো না। এক মুঠোও খাবার নেই। তোমার নাতি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই তোমার কাছে এলাম। একেবারে ভিক্ষা নয়, একটা সাজ দেখাই। মজাও হবে, বাচ্চার পেটেও কিছু পড়বে।'

দিন আনা দিন খাওয়া বহুরূপীদের এমনই দারিদ্র্যের জীবন। প্রায় কারোরই জমিজমা নেই। খাওয়ার কোনো সংস্থান নেই। তাই পরিবারের সবাই মিলেই চলে যায় বাইরে—দূরে। ছাউনি ফেলে স্টেশন-রাস্তার পাশে বা কারো চালায়—ক্লাবঘরে। সেখান থেকে ৭দিন আশপাশের জায়গা বা গ্রামগুলিতে বহুরূপী দেখিয়ে আবার কোথাও চলে যাওয়া। জীবিকার প্রয়োজনে।

এমন ঘটনা অনেকের জীবনেই ঘটেছে। নতুন বিয়ে হয়ে জলন্দি গ্রামে এসেছেন নিরুপমা ঠাকুর, এখন তাঁর বয়স ৬০, বহুরূপীর কথা বলতে গিয়ে হেসে কুটি কুটি। এখন থাকেন বোলপুরের স্কুলবাগানে। জলন্দির 'হানাবাড়ি', 'ক্লাবঘর' বা কারোর বাইরের চালায়

এসে ৭/১০ দিন থেকে যেতো বহুরূপীর দল। সকাল ৮টার মধ্যে সেজে বেরিয়ে পড়তো। ফিরতো আবার সেই সন্ধ্যার মুখে। ৭/৮ জন পুরুষ আর ২/৩ জন মহিলা এবং কয়েকটি বাচ্চা নিয়ে দল বেঁধে তারা থাকতো। বছরে একবারই আসতো। ফেরার পথে সন্ধ্যাবেলায় তাদেরই এক ৃ ন গিয়েছিল খুনি সেজে বুকে ছোরা লাগিয়ে রক্তাক্ত হ'য়ে। নিরুপমাদেবী তখন ভাতের মাড় গালছিলেন। ঘুরে তাকাতেই সেই খুনি। তারপর অন্ধকারে দিশাহারা হয়ে গরম মাড় একেবারে হাতের ওপর। হাত পুড়ে শেষ। বহুরূপীরও সেদিন আফসোসের সীমা ছিল না। জোড়হাত ক'রে ক্ষমা চেয়ে ফিরেছিল ডেরায়। এমন তো কতোই হয়। কিন্তু যেদিন মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটতো গোয়ালিনী। কোমরে কলসী, মাথায় দুধের হাঁড়ি, পরনে ঘাগরা, মুখে মাখানো সাদা হলুদ রং, চোখে কাজল, মাথায় খোঁপা, তাতে আবার ঝল্‌মলে ওড়নার মতো ভেল জড়ানো, হাতের পুরুষালি গড়ন কিন্তু আঢাকাই থাকে। এ হলো গোয়ালিনীর পোশাক। সে একেবারে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলতো--'আমি অমুক গোয়ালিনী। এ মাসের দুধের দামটা দিয়ে দাও, আমাদের ঘোষ পাঠিয়েছে আদায়ে। আদর ক'রে, মজা করে সকলে জিজ্ঞেস করতো—'তোমাদের ঘোষের নাম কী?' উত্তর দিতো বহুরূপী—'হেই মা, স্বামীর নাম বলতে আছে?' আশ্বিন মাসের পর যে মাস আসে, যে ঠাকুর ময়ূরে ব'সে, সেই নাম আমাদের ঘোষের।' লোকে বুঝে যেতো তার স্বামীর নাম—কার্তিক ঘোষ। এই হলো বহুরূপীর সামাজিক অংশগ্রহণ।

২৭.১২.২০০৪ চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানার অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার প্রশান্ত রায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল শান্তিনিকেতনে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ট্রো-ফিজিক্সের অধ্যাপক বাউল সন্ধানী সৌম্য চক্রবর্তীর বাড়িতে। ওপার বাংলায় তথা বাংলাদেশে একসময় জমিদারী ছিল প্রশান্ত রায়ের দাদুর। ১৪০০ বিঘে জমি, মৈনম গ্রাম, থানা মানদা। বাবা নীরোদচন্দ্র রায়, দাদু-হারাণচন্দ্র রায়ই জমিদার। প্রশান্ত রায় বাল্যে এক বাউলানির বাড়িতে গোরব নিকানো উঠোনে তুলসীতলা, বাউলের গেরুয়া জামাকাপড়, চুল বাঁধা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপর তার ছেলের বন্ধু হয়ে তাদের বাড়িতে ভিজে ভাত আর পাটের শাক খেয়ে আসতেন। বাউলানি সবিনয়ে জমিদারবাবুর কাছে সেকথা জানিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিলেন। ক্ষমার পরিবর্তে সেদিন নাতিকে খাওয়ানোর জন্য স্থায়ীভাবে রসদ বরাদ্দ হয়েছিল। এই প্রশান্ত রায় (৬৫) এখন হতে ৫০ বছর আগে রাজশাহী-নওগাঁ এলাকায় বহুরূপী দেখেছেন। জালের ভেতর ভালুক সেজে বহুরূপী এবং তাকে একজন নাকে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে চলেছে। জালের ভেতর যে রয়েছে তার মুখেও ভালুকের মুখোশ। রাজশাহীর গ্রামেই তিনি দেখেছেন কৃষ্ণ সাজা বহুরূপীকে। বাঁশি নিয়ে পথে চলেছে, কম কথা বলছে। তবে পাট কেটে পোশাক বানিয়ে জালের ভেতর ঢুকে হনুমান সেজেও বহুরূপী আসতো। হনুমান দেখতে আমরা ছুটে আসতাম, তার পিছনে কুকুরও লাগতো। অবশ্য এরা কেউই প্রফেসনাল নয়, সবাই-ই সখের বহুরূপী। ট্রেনে-বাসেও ওদের কখনো যেতে দেখিনি। এইসব বহুরূপীরা সারাবছর চাষবাস করতো, আর কখনো সখনো বহুরূপী সাজতো। এরা সবাই-ই প্রতিষ্ঠিত, কেউই তেমন ভাবে অভাবী নয় কিন্তু। দুর্গাপুজোর পর বিজয়াকে কেন্দ্র ক'রে সাধারণত ওরা সাজতো, আসতো।

দু'এক বছর অন্তর অন্তর বাংলাদেশে আত্মীয়দের কাছে বেড়াতে যান রামপুরহাটের শ্রীমতী মুকুল ভট্টাচার্য, তিনি কিন্তু বাংলাদেশে সেভাবে কোনো বহুরূপী দেখেননি এখন। সঙ্

দেখেছেন কখনো-সখনো। কিন্তু বহুরূপী দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে এমন মানুষ তিনি একজনকেও মনে করতে পারছেন না। বাংলাদেশে তাদের অস্তিত্ব নেই। এ অভিমত তাঁর।

রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাপীঠের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং কবি ও গল্পকার অনুপম দত্ত (৭১) মনে করেন—'বহুরূপী সঙ্ মাত্র নয়। জীবন ও যুগ বৈচিত্র্যের আরও কিছু শিল্পীত উদাহরণ ওদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে এবং উপযুক্ত কিছু সংলাপ তার সঙ্গে সংযুক্ত হলে এই শিল্পটির বিকাশ নতুন রিমিকে ও গিমিকে ফুটে উঠতে পারে। বহুরূপীরা তাদের রূপচর্চার মধ্যে যেমন হিন্দু সংস্কৃতির দেবদেবীর অনুকৃতি ক'রে বিমূর্ত অস্তিত্বকে প্রাণময় অনুকরণে ফুটিয়ে তোলে, তেমনি সমাজ পরিবেশের কিছু অস্তিত্বকে আমাদের সামনে দাঁড় করায় যা আমাদের ভয়ভীতির অনুভবকে বেশ মজাদার ক'রে তোলে। কোনো এক খুনি, বা খুনির খোঁজে পুলিশ অথবা সিংহাসনে বসা নব্যবাবুসাব শ্রেণির ব্যঙ্গাত্মক কোনো মূর্তি সব্জিবাজার থেকে মাছের বাজার হয়ে শহরে-গঞ্জে-গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন সেই শিল্পটি অবশ্যই আমাদের কিছু শেখাচ্ছে।'

প্রাক্তন উপাচার্য ড. পবিত্র সরকার কলকাতা থেকে দূরভাষে জানিয়েছেন—'তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বই নেই বহুরূপীর উপর। তাছাড়া বহুরূপী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেও নেই। শুধুমাত্র বীরভূম-বর্ধমান ও আর দু-একটি অঞ্চলে রয়েছে। তবে বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতির আকাদেমি আছে, সেখানে একবার খোঁজ নিয়ে দেখবো ওখানে বহুরূপী আছে কিনা।'

'স্বদেশ' পত্রিকার সম্পাদক শিল্পী ও কবি পান্নালাল মল্লিক (৫৭) ইছামতীর কূলে বসিরহাটে থাকেন। তিনি ৫/১২/২০০৪ তারিখ দূরভাষে জানিয়েছেন—ছোটোবেলায় বসিরহাট অঞ্চলে বহুরূপী দেখলেও এখন আর বহুরূপী দেখি না। গাজনের সঙ্গে অবশ্য সঙ্ থাকে। ওরা কিন্তু বহুরূপী নয়। ওদের জীবিকাও অন্য।

হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক ড. তপন গোস্বামী (৪৬) সিউড়িতে থাকেন। তবে তাঁর বাল্যবেলা কেটেছে হাওড়া জেলায়, সেখানেই তাঁদের বাড়ি। তিনি কখনোই হাওড়া জেলাতে সেভাবে বহুরূপী দেখেননি।

সন্তু সেনগুপ্ত (৬৬) অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। তিনি বহুরূপীর কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন—বহুরূপীর ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। তবে মুখোশ ছিল। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর আমলেও ছিল। গাজনের সময় সঙ্-ও সাজে অনেকে। সিউড়ির গাজনের সঙ্ তো একসময় খুব বিখ্যাত ছিল। সেসব ছোটোবেলায় দেখা। তবে তা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়েই হতো। অবশ্য তারা কেউ বহুরূপী নয়। হয়তো গাজনের সঙের মধ্যেই বহুরূপীর জন্ম লুকিয়ে থাকতে পারে। মুখোশ-সঙ্ হয়েই বোধহয় বহুরূপী এসেছে। বহুরূপী খুব প্রাচীন নয়, কিন্তু মুখোশ আর সঙ্ যথেষ্টই প্রাচীন।

৬. ১২. ২০০৪ তারিখ কৃষ্ণনগরে আনন্দ ও আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক সুধীর চক্রবর্তীর বাড়িতে বসে তাঁর কাছেই শুনলাম—'নদিয়ায় বহুরূপী নেই। তবে গাজনের সঙ্ আছে। বিশেষভাবে বছরে একবার তারা মূলত শিব-দুর্গা সাজে। অন্যসময় কাজ করে। জীবিকা হিসেবে তারা বহুরূপীকে গ্রহণ করেনি।'

মেমারী কলেজের অধ্যক্ষ এবং বর্ধমান গবেষক ড. গোপীকান্ত কোঙার (৫৯) থাকেন বর্ধমান শহরে। ২৩. ০৪. ২০০৫ এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান—'বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা

দেখ্‌ছি একদিন ট্রেনে বহুরূপী দেখাচ্ছে, আবার পরের দিনই দেখ্‌ছি সেই তারাই হাবু গাইছে। আসলে শিল্প নয়, ভিক্ষা। যে করেই হোক বেশি পয়সা রোজগার।'

আমোদপুরের কবি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নির্মলশিব দত্ত (৭৭) বহুরূপীর ইতিহাস প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—পুরাণে, রামায়ণে, আর্যযুগেও বহুরূপীর সন্ধান পাওয়া যায়। রাবণের ভাই মহীরাবণ বা সোনার হরিণ মারীচ অথবা তারকা রাক্ষসী এরা সবাই বহুরূপ ধারণ করতে পারতো। মহিষাসুরও বহুরূপ ধারণ করতে পারতো। আসলে যাদের 'রাক্ষস' বলা হয়েছে তারা সবাই 'দ্রাবিড়' জনগোষ্ঠীর আদিবাসীন্দা। রামায়ণের অহল্যারও অভিশাপে রূপ বদল হয়েছিল, ইন্দ্রর হয়েছিলেন সহস্র যোনি, কৃষ্ণেরও ১০৮ নাম বা রূপ আছে, দুর্গার দশমহাবিদ্যা দশ রূপের প্রকাশ। বহুরূপীর শিকড় তাই মনে হয় অনেক গভীরে। বর্তমানেও 'ব্যাধেরা' এই বহুরূপীর জীবিকা গ্রহণ করেছে। তারা ধনেশ পাখি নিয়ে মাদুলি-বিক্রীও করে, উল্‌কি পয়ার, হাবু গায়। এসবই ওদের জীবিকার অঙ্গ। বহুরূপী দেখানো জীবিকা, আর ওসব হলো উপজীবিকা।

বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা অরুণ চৌধুরী (৭৭) সিউড়িতে জানিয়েছিলেন ১৬. ০৩. ২০০৫ তারিখ—শুধুমাত্র ব্যাধরাই বহুরূপী সাজে এটা ঠিক নয়। ব্যাধেরা এটিকে আর্ট বা উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। মাত্র দু'পুরুষ আগে এরা গ্রহণ করেছে। বরং বৈষ্ণবেরাই বহুরূপী দেখিয়ে বেড়াতো বেশি। বৈষ্ণবদের ভেতর এটা ছিল, ওরা 'ঢপ্ কীর্তন' করতো। বীরভূমে আগে বহুরূপী দেখাতে আসতো ঝাড়খণ্ড থেকে। ফসল ওঠার সময় ওরা আসতো। ৭/১০ দিন বহুরূপী দেখিয়ে চাল-পয়সা তুলে আবার ফিরে যেতো। এখন আর আসে না। জমিদারেরা এদেরই 'পাইক' হিসেবে এনেছিল। পাখমারা থেকে এরা বহুরূপীতে এসেছে। ট্রাইব্যাল সবাই নয়। তবে বিষয়পুরের ওরা 'বেদে'। লৌকিক বৈষ্ণবও ছিল। নীচুতলার মানুষ সবাই। সমাজের নীচুতলার মানুষজনই উপজীবিকা হিসেবে বহুরূপী দেখানো শুরু করেছে। আর্টকে ভালোবেসে এসেছে। বিভিন্ন রূপ এরা গ্রহণ ক'রে থাকে, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিকে অবলম্বন করেও বহুরূপী দেখায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২.১২.২০০৪ তারিখ দূরভাষে জানিয়েছেন- 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে 'ইন্দ্রজাল' ছিল, বহুরূপীর ভাবনা ছিল না। 'বহুরূপী' নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি (উনিশ শতক : ১৮০০-১৮৯৯) থেকে দেখা গেছে। বাংলাদেশেও ওই একই সময়ে বহুরূপীরা এসেছে।'

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা বলেছেন—'বহুরূপী খুব প্রাচীন জীবিকা। অবশ্যই বিচিত্র জীবিকা। কিন্তু কতো প্রাচীন তা কেউ বলতে পারে না। ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন, আদিম মানুষেরা পশু শিকারের সময় নিজেদের দেহ মৃত পশুর চামড়া, নখ্, দাঁত ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতো। তাতে পশুরা তাদের মানুষ ব'লে চিনতে পারতো না। এ ঘটনাকে আমরা 'ছদ্মবেশ' বলতে পারি। এমনি ছদ্মবেশের কথা খ্রিঃ পূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত 'তিত্তির জাতকে'ও দেখি। সেখানে এক ধান্দাবাজ তপস্বী জীবিকার জন্য দু-তিন রকমের সাজ গ্রহণ করেছিল। প্রথমে সে বণিকের চাকর, তারপরে বণিক, তারপরে ব্যাধ সেজেছিল। (ঈশান চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'তিত্তির জাতক—৪৩৮ নং')। ধর্মে এঁরা এখন অনেকটাই হিন্দুরীতি মেনে চলেন। বিয়েতে বরপণ আছে। আগে ছিল কন্যাপণ।

বিয়েতে খাওয়া-দাওয়া ও উৎসবের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি হিন্দুদের মতো পুরুত ডেকে বিয়েও হচ্ছে। দল বেঁধে বরযাত্রীও যায়। কেষ্টপুরের ক্ষুদিরাম মণ্ডলের মেয়ের বিয়েতে আমি নিজেই উপস্থিত ছিলাম। দেখেছি, এই বিয়েতে হিন্দুদের মতোই রীতি মেনে কন্যা সম্প্রদান হয়েছে। বহুরূপী ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, জন্মের সময়ও নাড়িকাটা, ষষ্ঠীপুজো, আটকলাই, অন্নপ্রাশন হ'য়ে থাকে। একদা মৃত্যুতে কবরের ব্যবস্থা ছিল। এখন সৎকার হয়।

ঘেণ্টু চৌধুরী বহুরূপী বলেছিলেন—'এখন তাঁতি, এমন কী সদ্‌গোপ পরিবারের সঙ্গেও তাদের বৈবাহিক লেনদেন চলছে।'

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজে 'মশান' নামক এক ক্ষতিকারক অপদেবতা আছে। লোকবিশ্বাস, এই অপদেবতা বাড়ির কাছেই বনে-জঙ্গলে-শ্মশানে-জলে বসবাস করে এবং দুপুর ও সন্ধ্যায় কাউকে একা পেলেই তার ক্ষতি করে। 'শ্মশান-মশান' কথাটি যুগ্মশব্দ হিসেবে সারা বাংলাতেই প্রচলিত। মধুসূদন দাস (মশান চিত্রকলা) ১৮ রকমের মশানের উল্লেখ করে রাজবংশী সমাজের দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার জেলা থেকে একটি সুন্দর লোকগাথা তুলে এনেছেন—'একবার কালী নাকি একাকিনী নদীতে স্নান করছিলেন, সেই সময় সেখানে আকস্মিকভাবে ধর্মঠাকুর উপস্থিত হন। তারপর তাঁরা যৌন মিলনে লিপ্ত হন। সেই মিলনের ফলেই নাকি জন্ম হয় মশানের'। মশানের যে চিত্র কল্পিত হয়েছে তা বহুরূপীর মতোই এবং তারও প্রকার ১৮ রকমের।

বিহার-ঝাড়খণ্ড-রাজস্থানের মানুষের কাছে এঁরা 'বহুরূপিয়া' নামে পরিচিত। কৌতুক অভিনেতার এক অকুলীন প্রভাব বহুরূপীর আচার-আচরণে লক্ষ করা যায়। বহুরূপীরা ভিন্ন ভিন্ন সাজে নানান কৌতুককর সংলাপ এবং খণ্ড-অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেয়, আবার সমাজের অসৎ মানুষদের চোখে-আঙুল দিয়ে সচেতনতা সরবরাহের চেষ্টা ক'রে যায়। বহুরূপীর মধ্যে শিল্প সাধনা এবং জীবন-বহনের তথা রোজগারের একটি মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায় সবসময়ই। এবং জীবন-বহনটিই সেক্ষেত্রে বৃত্তবিন্দু হ'য়ে দাঁড়ায়।

শেষের কথা

১৯৮২ সালে আখ্ড়া গ্রামের সুফল রায় বহুরূপী চল্লিশ পয়সা দামের স্ট্যাম্প কাগজে একটি কোর্ট ফি লাগিয়ে কাটোয়ার এস-ডি-ও-র কাছে বহুরূপী দেখানোর অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। দরখাস্তের বয়ানটি ছিল—

দরখাস্তকারী সুফলচন্দ্র রায়, পিতা রেণুপদ রায়, বয়স ২৪ বৎসর, পেশা-ব্যবসা, জাতি-হিন্দু, সাং-আখড়া, থানা-কাটোয়া, জেলা-বর্ধমান-এর নিবেদন এই যে, আমি বহুদিন যাবৎ 'বহুরূপী' ব্যবসা করিয়া থাকি। আমি বর্তমান বৎসরেও কাটোয়া মঙ্গলকোট এবং কেতুগ্রাম থানা এলাকায় ও অন্যান্য এলাকায় বহুরূপী ব্যবসা করিব। আমি উক্ত ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকি। আমি উক্ত ব্যবসা করিতে না পাইলে আমার পরিবারবর্গ অনাহারে মারা যাইবে। এবং বংশ পরম্পরায় বহুরূপীর ব্যবসা করিয়া আসিতেছি। উপরোক্ত বিবরণ সকল হুজুর বাহাদুরের জ্ঞাতার্থে। নিবেদন ইতি—

টিপসহি ঃ সুফল রায়

সহি/এস-ডি-ও
কাটোয়া
অনুমতি প্রদানের তারিখ ৯/১২/৮২

সুফল রায়ের বক্তব্য হ'তে জানতে পারা যায়—ব্যবসাই তার পেশা। আবার বহুরূপী দেখিয়ে বেড়ানোও তার কাছে 'বহুরূপী-ব্যবসা'। এই ব্যবসাটি করতে না পেলে সুফল জানিয়েছে—'পরিবারবর্গ অনাহারে মারা যাইবে।' বহুরূপী দেখিয়েই সুফল জীবিকা নির্বাহ এবং পরিবার পালন ক'রে থাকে। লোকনট বহুরূপীর জীবনের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ সবই নির্ভব করে এই বৃত্তিটিরই ওপর। বহুরূপী অন্নসংস্থানের নিমিত্ত একটি পেশা, রুজি-রোজগারের জন্য লোকায়ত নাট্য। বহুরূপীর সঙ্গে সঙের মৌলিক পার্থক্যই হল যে তা নিত্য দিনের অন্নসংস্থান তথা জীবিকাব সঙ্গে জোড়া থাকে না। বিভিন্ন লোকায়ত দেবদেবীর পুজো বা উৎসব অনুষ্ঠান, চড়ক-নন্দোৎসব, গাজন-কীর্তন উপলক্ষ্যে এ বাংলায় সঙের প্রচলন আছে। সঙাল'রা সে সময় উপরি কিছু আয় করলেও সারা বছরই তারা চাষের কাজ বা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকে, কেউ কেউ রিক্সাও চালায়। সঙ্ সাজতে গিয়ে তারা অনেকটাই বহুরূপীর মতোনই সাজসজ্জা করে। তাহলেও কিন্তু বহুরূপীর চেয়ে সঙ্-ই পুরনো, সঙের চল্ই আগে এসেছে সমাজ-সংসারে। সঙেরই একটি উন্নত ধারা হিসেবে বহুরূপীকে ভাবা যেতেও পারে। কিন্তু লোকায়ত নাট্য বহুরূপী পেটের ভাত সংগ্রহের নিমিত্ত একটি পেশা। তাই সুফল স্পষ্টই জানিয়েছে—এই ব্যবসা তাকে করতে দেওয়া না হ'লে তার পরিবারটিই 'অনাহারে' মারা যাবে। তাহলে বহুরূপী ব্যবসাতেই সুফলের আহার জোটে, এই শাশ্বত

বক্তব্যটিই উঠে আসে অনুমতি প্রার্থনার দরখাস্তটি থেকে। বহুরূপের অন্তরালে বহুরূপী একজন দরিদ্র মানুষ মাত্র, সুফল যাদের প্রতীক-প্রতিনিধি। হয়তো তার দারিদ্র্যের কারণেই লোকনাট্যের শিল্পী হিসেবে, লোকশিক্ষক হিসেবে বহুরূপী মানুষটিকে মঞ্চে-বক্তব্যে গ্রহণ করা হলেও, ভিক্ষুকের চেয়ে খুব উঁচুতে আজও তাকে স্থান ক'রে দেয়নি এই উন্নাসিক অনুদার ভুবনায়নের সভ্য সমাজ।

জন্মের বিস্ময় নিয়ে তথাপি বহুরূপী শিল্পটিকে বিশ্বের নানান দেশে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছেন বর্ষিয়ান সুবল দাস বৈরাগ্য। সুদেবী বৈরাগ্য তাঁর স্ত্রী। তাঁদের দুই মেয়ে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। একমাত্র ছেলে ধনেশ্বর ওষুধের ব্যবসা করে, 'বহুরূপীর ভিক্ষাবৃত্তি' গ্রহণ করতে তার মন সায় দেয়নি। মাসিক ৫০০ টাকা করে সরকারী অনুদান পেয়ে থাকেন সুবল দাস। হিন্দু ধর্মের সব দেবদেবীর পুজো-পাঠ হয় তাঁর বাড়িতে, রাধাগোবিন্দের মন্দিরও আছে। ভিটে-আশ্রম ছাড়াও সুবলদাসের ৫৪ শতক জমিও আছে, তাতে চাষ-আবাদ হয়। ৩৫/৩৮ বছর ধরে বহুরূপী সেজে আসছেন সুবল দাস। তিনি সাজতে ভালোবাসেন অর্ধনারীশ্বর, পুরুষ-প্রকৃতি, কৃষ্ণকালী, হরগৌরী, নটরাজ, ফকির, হনুমান, পাগল, গোয়ালিনী, জেলেনী ইত্যাদি। সুবলদাস আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বহুরূপী দেখিয়ে এসেছেন। আগামী দিনে তিনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে কিছু সাজসজ্জা করতে চান। হালে হুগলির নিত্যানন্দ গোস্বামীর সঙ্গে জোট বেঁধে তিনি নানান যুগ্ম চরিত্রের বহুরূপ প্রদর্শন ক'রে চলেছেন মঞ্চে। নিরক্ষর স্বামী আর স্বাক্ষর স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে সুবল বহুরূপী সংলাপ বলেন—'ওগো শুনেছো, লেখাপড়া শেখো। লেখাপড়া না শিখলে কোনো সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাবে না। তাই লেখাপড়া শেখো।' বীরভূম জেলার কুলিয়া গ্রামের সুবল দাস বহুরূপীর তথাপি সংসারে সুস্থতা আসেনি, যায়নি অভাবও।

হুগলির বৈঁচি-চারাবাগানে ঘরেই সুন্দর রাধাগোবিন্দের মন্দির নির্মাণ ক'রে পুজো-আচ্চার মধ্য দিয়েই দিনাতিপাত করেন সংলগ্ন মাটির ঘরে অমায়িক ব্যবহারের বহুরূপী নিত্যানন্দ মহান্ত। কানাইলাল আর নন্দরাণীর সন্তান নিত্যানন্দ তিন ছেলেমেয়ের পিতা। ছেলে সুভাষ আর কেশব মিষ্টির দোকানে কাজ করে, মেয়ে মণিমালা। কারোরই বহুরূপীতে কোনো আগ্রহ নেই। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন নিত্যানন্দ বলেন—'ঈশ্বর যা করেন তাই হবে।' বিদেশে না গেলেও নিত্যানন্দ কলকাতা-বাণীপুর-সুন্দরবন-ঝাড়গ্রাম-হ্যামিলটনগঞ্জ-বাঁকুড়া-কৃষ্ণনগরে বহুরূপী দেখিয়ে এসেছেন। তাঁর প্রিয় সাজগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণার্জুন-কালী-চামেলি মেম্, কলেজ স্টুডেন্ট, হঠাৎবাবু, বেদেনী, গোয়ালিনী, নাগকন্যা, একলব্য, বৃদ্ধা মহিলা, মৎস্যকন্যা, শিব, ক্ষেপি, দুর্গা ইত্যাদি। মৃত্যুর পর তাদের আছে সমাধি প্রথা। নিত্যানন্দের 'হঠাৎবাবু' সংলাপ বলে—'হঠাৎ বাবু সাজে, হঠাৎ এলেন চটাৎ ক'রে, চেয়ার পাছায় দিয়ে। পেটেতে নাই ভবানী, চুলকাটা হলো ত্রিস্তানি। আর নয় টিপ্‌ছাপ্ দেখেশুনে করবো সই, রাতের ইস্কুলে শিখেছি, অত বোকা নই।' নিত্যানন্দ 'ক্ষেপি' সাজলে বলে—'পান খেয়েছি পিচ্ ফেলেছি, দাঁত করেছি ছোলা। আমার বাবু নাম রেখেছে ইষ্টিফুলের মালা/আমি ক্ষেপি? ছেলেরা বলছে আমি ক্ষেপি। হাঃ—হাঃ—হাঃ।' বাড়িতে রাধাগোবিন্দের পৈতৃক পুজোপাঠে দিন যায় নিত্যানন্দের। বহুরূপী সেজে সংসার চলে না, তবে আনন্দ আছে।

ছেলেদেরকেও এপথে আনা যায়নি। বাড়ির পুব দিকের বেড়াটা ভেঙে এখনো একটি দেওয়াল দিতে পারেনি নিত্যানন্দ, নুন আনতেই পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। সংসারটা চলে যাচ্ছে কোনোভাবে মাত্র।

রাজনগর থানার হরিপুর গ্রামের হিন্দু 'আলবোনা' গোত্রের ঊনত্রিশ বছরের ঈশ্বর মণ্ডল গুরু উত্তম সূত্রধরের কাছে বহুরূপীর কলা-কৌশল শিখে বহুরূপী দেখাচ্ছেন ১৫ বছর ধরে। হরিপদ-সাবিত্রীর সন্তান ঈশ্বর মণ্ডলের বিয়ে হয়েছে সদ্‌গোপ বংশেই। স্ত্রীর নাম মালা। তাদের বুবি নামের চার বছরের একটি কন্যাও আছে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনাও করেছে ঈশ্বর। বাড়ি আছে, জমি নেই। কার্ড বা সরকারী কোনো সাহায্য এখনো পায়নি সে। শুধু বহুরূপী দেখিয়ে ঈশ্বরের সংসার চলে না। তাই মাঠে খেত-মজুরের কাজের সঙ্গে সুযোগ-সুবিধা বুঝে খড়ের ঘর ছাওয়া, সাইকেল সারানো, টুক্‌টাক ম্যাজিকও দেখান তিনি। আগে পুতুল নাচের দলে গান গাইতেন। এখন যাত্রাপালা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গ্রামে হ'লে তাতে গান গায় ঈশ্বর 'মণ্ডল। শ্রীকান্তপুর-কুলকুড়ি-মহম্মদবাজার থানার উত্তম সূত্রধরের কাছে তার বহুরূপী শেখা। বহু জায়গার সঙ্গে ধানবাদ-দুমকা-সিউড়ি-কুণ্ডহিত-রাণীশ্বর-পাণ্ডবেশ্বর-সাঁইথিয়া-খয়রাশোল-দুবরাজপুরেও বহুরূপী দেখিয়ে এসেছে ঈশ্বর। তার প্রিয় সাজ-কালী, হনুমান, হরিশ্চন্দ্র, ছিন্নমস্তা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, মনসা, শিব, সন্তোষী মা প্রভৃতি। মৃত্যুর পর পারিবারিক ধারা অনুসারে ঈশ্বরদের দেহ বক্রেশ্বর মহাশ্মশানে দাহ করা হয়। ঈশ্বর হরিশ্চন্দ্র সেজে সংলাপ বলে—'সুখে থাকো তোমরা সবাই, আমরা চলে যাই। রহিত আমার খিদের জ্বালায় ক'রে হাহাকার, শৈব্যা আমার চোখের জলে বুক ভাসাইয়া যায়।'

৪৫ বছর বয়স্ক অর্জুন বেদ তার স্ত্রী বাসন্তী এবং ৫ পুত্র-কন্যাকে নিয়ে রসা গ্রামে থাকে। না, এখানে তাদের বাস্তুভিটে বা জমিজমা নেই। তাদের মতোই আরও কেউ কেউ দল বেঁধে আসে। রসাতেই বেশি দিন থাকলেও, চিরদিন এই গ্রামে থাকতে তাদের সায় নেই। তারা অনেকটাই যাযাবর। অতি দরিদ্র। নিরক্ষর। পাখমারা সম্প্রদায়ের 'কালকেতু' গোত্রের মানুষ। বাবা জীবন বেদের দু'জন স্ত্রী, শীতলা আর যশোদা। দুই মা এবং বাবা মারা গেছেন অনেক আগেই। অর্জুন বহুরূপী সাজলেও ছেলেরা লোহা মাধব এবং ক্ষ্যাপাঠাকুর শিকার আর ভিক্ষে করেই দিন কাটায়। সাজপোশাক তেমন কিছু নেই। সিমেন্টের বস্তা ছিঁড়ে হনুমানের পোশাক বানিয়েছে অর্জুন। এই পোশাক আর মুখে হাঁড়ির কালি মেখে পথে বের হয়। সেই বহুরূপীকে লোকে ভিক্ষুক ভিন্ন আর কীইবা ভাববে! হতাশার কালো অন্ধকারে ডুবে আছে নিরক্ষর ভিটেমাটি ছাড়া অর্জুন বেদ এবং তার পরিবারের সকলে। ছেলেরাও মাঝে মাঝে ছেঁড়া ফাটা পোশাক পরে বহুরূপী দেখাতে যায়। বিশুকুটু বেদের কাছে বহুরূপীর শিক্ষা নিয়ে অর্জুন সাঁইথিয়া, বোলপুর, গেবুয়াপাহাড়ি, বড়জোড়া প্রভৃতি জায়গায় দেখিয়েও এসেছে তা। ডাকাত, লক্ষ্মণ, নারদ, হনুমান, নারায়ণ সাজতেই তার ভালোলাগে। তবে ভিক্ষের মতো এই পেশাতে আর উৎসাহ পায় না অর্জুন বেদ। মৃত্যুর পর তাদের দেহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুড়িয়ে ফেলা হয়, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমাধি দেবার রীতিও আছে।

৬০ বছরের কানাই বেদ ও তার আটটি সন্তান এবং স্ত্রী হলদি বেদকে নিয়ে কাঁকরতলা থানার হজরতপুর পঞ্চায়েতের রসা গ্রামেই অর্জুনদের কাছাকাছি ছাউনিতে থাকে। তাদেরও বাড়িঘর-

জমিজিরেত কিছুই নেই। তারাও নিরক্ষর। সরকারী কার্ড বা সাহায্যও কিছু পায়নি। এমনিই জীবনযাপন তাদের। ছেলেদের মধ্যে হলধর, ক্ষ্যাপা, অশোক শিকারে যায় আর অল্প কাজ-টাজও করে। তবে তারা বহুরূপী দেখায় না। ছোটোগুলো মুখে রঙ মেখে বহুরূপী সেজে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। কানাই বেদ সিউড়ি, দুর্গাপুর, বড়জোড়া, প্রভৃতি জায়গায় বহুরূপী দেখিয়ে এসেছে। বাবা কৃষ্ণ এবং মা পাগলি। কানাই বহুরূপী দেখিয়ে আসছে প্রায় ২৫ বছর। শিক্ষাগুরু বিশুকুটু বেদ। বাড়ির ঠাকুর শীতলা-চণ্ডি আর মনসা। মারা গেলে দাহ হয় দেহ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাধিও হয়। কানাই সাজতে ভালোবাসে শিব, রাম আর গোয়ালিনী।

সাঁইথিয়া থানার 'অচ্যুতানন্দ' গোত্রের মথুরানন্দ ও অন্নপূর্ণার সন্তান হরিচরণ দাস বৈবাগ্য থাকেন সাংড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নানুবাজার গ্রামে। হিন্দু বৈষ্ণব বংশে তার জন্ম। ষষ্ঠ শ্রেণি অবধি পড়াশোনা। এখন বয়স ৩৫ বছর। স্ত্রী সুমিত্রা আর দুই মেয়ের নাম নমিতা ও অনীতা। বাড়ি আছে মাটির, জমি নেই। ১৮ বছর বহুরূপী দেখাচ্ছেন। মুর্শিদাবাদের ভাস্তোড়ের বৈদ্যনাথ দাস বৈরাগ্য তার বহুরূপীর গুরু। সে নানারকমের সাজের সঙ্গে অন্ধমুনি, বিল্বমঙ্গল, পাগল, শিব, কালী, কৃষ্ণ, কংস, বসুদেব, হঠাৎবাবু, গোয়ালিনী প্রভৃতি সাজে। বহুরূপী দেখাতে সে বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, কলকাতা, দুমকা, দেওঘর প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছে। সরকারী কার্ড বা সাহায্য পায়নি। বাড়িতে সন্ন্যাসী গোঁসাই এবং রাধাকৃষ্ণের ছবি আছে। তাছাড়া হিন্দু-বৈষ্ণব মতে সব দেবদেবীরই পুজোপাঠ হয়। মারা যাবার পর শবদেহ সমাধি দেওয়াই তাদের রীতি। ৪০০/৫০০ টাকা কোনো রকমে আয় হয় মাসে, তাতে সংসার চালানো যথেষ্ট কষ্টকর। হরিচরণ বিল্বমঙ্গল এবং পদাবলীর শ্লোকও ব্যবহার করে বহুরূপীর সংলাপে। একটি সাধারণ বক্তব্য বলেই সে গান আরম্ভ করে।

অমরপুর পঞ্চায়েতের গড়গড়িয়া গ্রামে দুই ছেলে প্রকাশ আর জ্যোতির্ময়কে নিয়ে স্ত্রী মমতার সঙ্গে বসবাস করে ৩৫ বছরের বিদ্যাসাগর সূত্রধর। বাবা রামপদ, মা সবিতা। বাবা কাঠের কাজ ক'রে সংসার চালাতেন। বিদ্যাসাগর বা সাগর সূত্রধরও পারিবারিক পেশা ছাড়েনি। তবে ফাঁক পেলেই বহুরূপী সেজে গ্রাম-গ্রামান্তরে চলে যায়। বহুরূপী সাজা তার ভালোবাসার পেশা। হিন্দু 'আলম্ব ঋষি'র গোত্রে তার জন্ম। পাঁড়ই থানা এলাকায় তার গ্রাম। দুই ছেলের কেউই বহুরূপী সাজে না, পড়াশোনা করে। সিউড়ির ফতেপুরের রামচন্দ্র সূত্রধর ছিলেন তাঁর বহুরূপীর গুরু। বহুরূপী দেখাচ্ছে সাগর 'তা প্রায় ২০ বছর হবে'। বাড়ি আছে। বাড়িতে লোকনাথ বাবা, কৃষ্ণ, নারায়ণ, রামকৃষ্ণের ছবিও আছে। মরার পর তাদের দেহ দাহ করা হয়। খুবই কষ্টের সংসার। শুধু বহুরূপী সেজে চলে না, তাই এটা ওটা করতেই হয়। ভবিষ্যতের কথা বলতেই দীর্ঘশ্বাস মাখিয়ে উত্তর দেয় বিদ্যাসাগর—'দরিদ্র বহুরূপীর কোনো নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ নেই'। তার সাজতে ভালোলাগে—কংস, বসুদেব, হিরণ্যকশিপু, নরসিংহ, খুনখারাপি, শিব, কালী, মজনু, লক্ষ্মী, হনুমান, লোকনাথবাবা ইত্যাদি। সে বর্ধমান মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের বহু জায়গায় বহুরূপী দেখিয়ে এসেছে। কংস সেজে বিদ্যাসাগর সংলাপ বলে—'সকলে বলে কংসকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে। কোথায় সেই নবজাত শিশু? তোমাদের বাড়িতে আছে—তাকে বের ক'রে দাও। নবজাতকে হত্যা করেই আমি এর প্রতিশোধ নেবো। হাঃ—হাঃ—হাঃ'।

৪৬ বছরের 'মধুঋষি' গোত্রের রবীন্দ্রনাথ সাহার বাড়ি সাঁইথিয়া থানার হরিসাড়া গ্রামে। অষ্টম মান পর্যন্ত পড়াশোনা। জমি আছে অল্প, বাড়িও আছে। এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে মিঠুই বড়ো, তার বিয়েও হয়ে গেছে। ছেলে নীলকণ্ঠ বহুরূপী সাজে না, বেসরকারী গাড়ি চালায়। ড্রাইভার। বাবা ক্ষুদিরাম মারা গেছেন অনেকদিন, ৭০ বছরের বৃদ্ধা মা হরগৌরী সাহা এখনো বেঁচে। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত প্রথানুযায়ী রাধাকৃষ্ণের ভজনা করেন রবীন্দ্রনাথ। রবি বহুরূপীদের মৃতদেহ দাহ করাই প্রথা। রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণকালী, জটায়ু, নরকঙ্কাল, রাক্ষস, অঙ্গদ, কল্কি অবতার, গোয়ালিনী প্রভৃতি সাজতে তার ভালোলাগে। বহুরূপী দেখাতে সে বর্ধমান, বোলপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছে। বহুরূপী দেখাতে গিয়ে রবির অভিজ্ঞতা হলো—'এই শিল্প মাধ্যমে মানুষের খুব কাছাকাছি আসতে পেরে সৃষ্ট মনুষ্য প্রেমকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা থাকা সত্ত্বেও। আশাকরি ভবিষ্যতে এই শিল্প মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবে সরকারী উদ্যোগে।' কিন্তু শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগে কী কোনো শিল্প বাঁচে, শুধু সাহায্যে আর করুণায় ভর ক'রে কোনো শিল্পের কী টিকে থাকা সম্ভব? সে হিসেব অবশ্য রাখবে সময়। রবীন্দ্রনাথ তথাপি বহুরূপী দেখাতে গিয়ে সংলাপ বলার সঙ্গেই গানও গেয়ে থাকে। তার একটি গান এইরকম—

মন কী তুই চিরজীবী, দিন কী তোমার এমনি যাবে?
দেহ-পিঞ্জর ক'রে ভঙ্গ প্রাণ-বিহঙ্গ পলাইবে।
দশাননের দশাবরন ভেবে দেখ্ মন ত্রেতাকালে,
দেবেন্দ্র যার গেঁথেছেন হার, যম বাঁধা যার অশ্বশালে।
ব্রহ্মা মাথায় ছিলেন সদাই, মা অভয়া দিলেন অভয়
ত্রিলোকে সে মরিল হায়, তাও গেল গো সবান্ধবে।
দিন কী তোমার এমনি যাবে?...

জামালপুর থানার তিলকুল গ্রামে হুগলি জেলার মাধবপুর পঞ্চায়েতে থাকেন ২৭ বছরের জয়ন্ত ভূমিজ। নিরক্ষর। সুরেন ভূমিজ আর চাপরি ভূমিজ তার বাবা-মা। বসতবাড়ি আছে, জমিজমা নেই। হুগলির খানপুরের তপন হাড়ির কাছে বহুবৃপীব শিক্ষা নিয়েছে জয়ন্ত। তার স্ত্রী অঞ্জলি, ৬ বছরের ছেলে দশরথ আর ৪ বছরের মেয়ে দোলনকে নিয়ে ছোটো সংসার। তাদের ব্রাহ্মণ দিয়ে বিয়ে হয়। শবদেহ দাহ হয় এবং কবরও দেয় কেউ কেউ। গ্রাম-পঞ্চায়েত তাকে বহুরূপী করতে লিখে দিয়েছে, তবে জেলান্তরের কোনো কার্ড তার নেই। সাহায্যও পায়নি। তার দৈনিক আয় হয় ৩০ থেকে ৫০ টাকা। সে শিব, কালী, কৃষ্ণ, মনসা, বেহুলা, চণ্ডাল, ব্যাধ, রাম, লক্ষ্মী, দুর্গা, ফকির প্রভৃতি সাজে। এই সাজ সে দেখিয়ে এসেছে জামালপুর, কামারকুণ্ডু, গুড়াপ, খানাকুল, শ্রীরামপুর, দশঘড়া প্রভৃতি জায়গায়। 'একটু বেশি ইনকামের জন্য বহুরূপী সাজি, কিন্তু ঠিক্‌মতো পরিবারটিই চালাতে পারছি না বহুরূপী দেখিয়ে। তাই মজুরের কাজও করতে হচ্ছে কখনো কখনো। শিল্পী মজুর খাট্‌ছে, এটা ভাবতেই লজ্জা লাগে।'

বীরভূম-মুর্শিদাবাদের প্রান্তসীমায় কলেশ্বর পঞ্চায়েতের অধীন খুষ্টিকুড়িগ্রাম, ৫৫ বছর বয়সের হিন্দু 'কাশ্যপ' গোত্রের বিশ্বনাথ দাস এখানেই থাকেন। বিশ্বনাথ-আরতির ৪টি সন্তান।

৩ মেয়ে আর ১ ছেলে। লক্ষ্মী, গাজলী, তুফানী আর ছেলে তপন। তপনের বয়স এখন ২৪। সে চাষের কাজ করে, বহুরূপী সাজে না। বাবা বালকনাথ দাস এবং মা ফুলেশ্বরী দু'জনেই মারা গেছেন। সিউড়ির কেঁন্দুয়া ডাঙ্গায় বাস করতেন বিশ্বনাথের বহুরূপীর গুরু অধরচন্দ্র দাস। অধর দাস মাত্র বছর ৮/১০ বহুরূপী সাজছেন। বহুরূপী শিল্পটিকে নিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি বড়জোড়া, সোনামুখি, রানিবাঁধ, বুদ্‌বুদ্‌, গলসি, পানাগড়, লালবাগ, জঙ্গীপুর, ফরাক্কা, গঙ্গাজলঘাটি প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছেন। তার প্রিয় সাজের মধ্যে লায়লা-মজনু, দুর্গা, নারায়ণ, রাক্ষস, হনুমান, ক্ষ্যাপা-ক্ষেপি, কালী, শিব, গয়লানী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বহুরূপী শিল্পটিকে ধ'রে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনাও বিশ্বনাথের আছে, কিন্তু 'আর্থিক প্রতিকূলতার জন্যই কাজের কাজ কিছুই সম্ভব হচ্ছে না।' শিব, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পুজো করে বিশ্বনাথ, বাড়িতে ক্যালেণ্ডারে ছবিও আছে। হিন্দু মতেই তাদের সবকিছু হয় এবং মারা যাবার পর শ্মশানেই দেহ দাহ করার রীতি আছে। মজনু'র সাজে ১৯৯৯ সালে বহুরূপী দেখিয়ে মুর্শিদাবাদের মহকুমা শহর কান্দিতে এস-ডি-ও-কে মুগ্ধ করেছিল বিশ্বনাথ। সাহেবও খুশি হয়ে কাঁসার বগি-থালা পুরস্কার দিয়েছিলেন। 'সেদিন খুব আনন্দ পেয়েছিলাম, জীবন সার্থক জেনেছিলাম। কিন্তু তারপর বহুরূপী দেখিয়ে ভিক্ষে করা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না।' বিশ্বনাথ দুর্গা সেজে সংলাপ বলে—'শিব ভারি দুষ্টু। শ্মশানে-মশানে ঘোরে আর বাড়ির খবর রাখে না। কার্তিক-গণপতি দুই ছেলে দিয়ে গিয়েছে। এক ছেলে বলে 'মা চাঁদ নেবো'। চাঁদ কি গাছে ঝোলে যে, পেড়ে দেবো? নাকি মাটির, যে গড়ে দেবো? ছেলের চাহিদা মতো চাঁদ ছেলেকে দিতে পারি না, সেই জন্যেই তো আপনাদের বাড়িতে আসা। কার্তিক-গণেশের দুধ-ছানা-ননী খাবার জন্য আপনারা দশ-বিশ টাকা দিন।' সেই আবার মহাদেব সেজে বলে যায়—

'ব্যোম্ ভোলা, সস্তা করো চাল আর কলা।
যে বলে গাঁজা আচ্ছা, বেঁচে থাক তার আন্ডা-বাচ্চা।
যে খায় না গাঁজা-গুলি, তাকে কি মানুষ বলি?
যে বলে গাঁজা ছি, তার মাছের ঝোলে পেচ্ছাপ ফিরি ॥'

আবার গয়লানী সেজে সেই বিশ্বনাথ বহুরূপীই বলে যায়—

'আমার নাম ক্ষুদি গয়লানী/এক'পো দুধে পাঁচ'পো পানি।
বৃন্দাবনে বসত করি আমি জাত-গয়লার মেয়ে, হ্যাঁ—
দই খেয়েছো, ভাঁড় ভেঙেছো, ছেঁড়া কাঁথায় মুখ মুছেছো
সেই দই-এর দাম দিতে ভুলেছো। আজ সেই দামটা দাও।
আপনাদের বাড়িতে দই-এর দামটা নেবো, তারপর আমাদের
ঘোষের খাবার করবো। কই দাও গো দাও, ১০/২০টা টাকা দাও ॥'

দক্ষিণগ্রাম পঞ্চায়েতের শিবগ্রামে থাকেন গোবিন্দচন্দ্র দলুই। 'ডোম' জাতির মধ্যে এই 'দলুই' সম্প্রদায় পড়ে। তাদের ডাকঘর বেগুনিয়া গ্রামে। 'কাশ্যপ' গোত্রের হিন্দু ধর্মাবলম্বী গোবিন্দ চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। এখন বয়স ৪৫। দু'ই ছেলে অনন্ত (২৫) আর বাপী (১৯)। দু'জনের কেউই বহুরূপী সাজে না, চাষে খাটে। সামান্য জমি এবং বাড়ি আছে। বাবা নিরাপদ এবং মা কালিদাসী উভয়েই মারা গেছেন। স্ত্রী কল্যাণীও মারা গেছেন সম্প্রতি।

বিষয়পুরের সুবোধ চৌধুরীর কাছে তার বহুরূপী শিক্ষা। ২২ বছর বহুরূপী দেখাচ্ছেন। স্থানীয় আশপাশের গ্রামেই বহুরূপী দেখিয়ে থাকে গোবিন্দ। শুধু বহুরূপী দেখিয়ে কোনোদিনই সংসার চলেনি, তাই মজুর খাটতে হয়েছে চিরদিনই। মৃত্যুর পর শ্মশানেই দাহ করা হয় তাদের দেহ। বাড়িতে কালী, দুর্গা, শিব, লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি আছে। জীবন নির্বাহ হয় হিন্দু মতে। তার সাজের মধ্যে শিব, হনুমান, তারা সুন্দরী, দস্যু, ব্যাধ, কালী, গোয়ালিনী প্রভৃতিই প্রিয়। মাসে ২৫০ থেকে ৩০০ টাকার বেশি সে আয় করতে পারে না। দারিদ্র্যের কারণে সাজ-পোশাকও কিনতে পারছেন না গোবিন্দ। বহুরূপী গোবিন্দ বলেন—'আমার দারিদ্র্যের জন্য সাজ-পোশাক কিনতে না পারায় বহুরূপী দেখানোর অসুবিধা হয়। অনুগ্রহ করে সরকার যদি কিছু সাজ-পোশাক সাহায্য করে, তাহলে উপকৃত হই।'

৪২ বছরের মলুক ভুঁইমালীও 'কাশ্যপ' গোত্রের হিন্দু পরিবাবের সন্তান। ময়ূরেশ্বর থানার ব্রাহ্মণবহড়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। তৃতীয় শ্রেণি অব্দি গাঁয়ের স্কুলেই পড়াশোনা। তারপর অভাবের জন্য আর হয়নি। নলহাটি থানার পানুটিয়া গ্রামের জিতেন দাস তাঁর বহুরূপীর গুরু। কৃষিকাজের দ্বারাই মূলত তিনি সংসার প্রতিপালন করেন। তবে সময়-সুযোগ পেলেই মুখে রঙ মেখে বহুরূপী সেজে বেরিয়ে পড়েন গ্রাম-গ্রামান্তরে। দৈনিক গড় আয় তিরিশ টাকারও নীচে। বাড়িতে লক্ষ্মী, শিব, কালীর ছবি আছে। মৃত্যুর পর তাদের দেহ তারাপীঠ মহাশ্মশানে দাহ করাই নিয়ম। দুর্গা, কালী, শিব, সরস্বতী, হনুমান, রাম, রাক্ষস প্রভৃতি সাজে মলুক ভুঁইমালী। তাঁর বাবা শিবু এবং মা বালিকা উভয়েই মারা গেছেন, বাবাও কোনোদিন বহুরূপী সাজেনি। বেশি আয়ের আশায় এপথে এসেছিলেন মলুক। এখন দেখছেন—'এ হলো গিয়ে ভিক্ষার নামান্তর। তাই ছেলেদের আর এপথে আসার জন্য বলিনি। তিন ছেলেই দুর্বল, বাঁরবল আর সম্বল চাষের কাজের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পড়েছে।'

৩৪ বছর বয়স্ক সাঁইথিয়া থানার ভ্রমরকোল গ্রামের বিশ্বনাথ দাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার পর আর্থিক অভাবের কারণে তার এগুতে পারেননি। বাবা ভগীরথ আর মা ফেনু পড়াতে পারেননি ছেলেকে। মুনিব বাড়িতে জন খাটার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন সেই ছোট্ট বেলাতেই। পরে একটু বড় হতেই রাজমিস্ত্রির সাহায্যকারী হিসেবে কাজে লেগে যায় বিশ্বনাথ। এরপরই তার মনে জাগে বহুরূপীর নেশা। এই সময় নাওতারা গ্রামের বিরিঞ্চি দাস বৈরাগ্যের সঙ্গে আলাপ হয়। সেই বিরিঞ্চি দাস বৈরাগ্যই বিশ্বনাথকে বহুরূপীর শিক্ষা দেন। তারপর জেলাশাসকের অনুমতি নিয়ে বহুরূপী দেখাতে পথে নামেন বিশ্বনাথ। হুগলি, বর্ধমান, রাণীশ্বর, শান্তিনিকেতন, সিউড়ি প্রভৃতি জায়গায় বহুরূপী দেখিয়ে এসেছেন তিনি। তাঁদের চার ভায়ের মধ্যে আর কেউ বহুরূপী সাজে না। সরকারী সাহায্য বা সরকারী কার্ডও পায়নি বিশ্বনাথ।

স্ত্রী মালতী আর সন্তান পূর্ণিমা ও তাপসকে নিয়েই ভ্রমরকোল গ্রামে বিশ্বনাথের অভাবের সংসার। ১১ বছরের তাপস স্কুলে যায়। ওকে আর এপথে আনতে চাননা তিনি। এখনো বহুরূপী দেখিয়ে সংসার না চললে জনমজুর খাটতে চলে যায় বিশ্বনাথ।

দক্ষিণগ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন শুকনা গ্রামের ফটিক দলুই সই করে অনেক কষ্টে। বয়স এখন ছাপান্ন। পড়াশোনা দ্বিতীয় শ্রেণির বেশি এগোয়নি। এখন সঙ্গে থাকে নতুন স্ত্রী কল্পনা আর তাদের দু'জন ছেলে মেয়ে। ছেলে বরুণ মাঠে কাজ করে, কৃষিকাজেই তার আগ্রহ। সে

বহুরূপী সাজে না। বাবা পঞ্চানন, মা মরিরাম দু'জনেই গত হয়েছেন। শুক্‌না গ্রামের মানুষ বহুরূপী ফটিক দলুইকে জায়গা দান করেছে, সেখানেই সে ছোট্ট একটি মাটির বাড়ি গড়ে নিয়েছে পাঁচ জনের সাহায্য নিয়ে। ঝিকরহাটি মুর্শিদাবাদের মৃত্যুঞ্জয় দলুই-এর কাছে বহুরূপীর শিক্ষা করেছে ফটিক। জেলার বাইরে বহুরূপী দেখাতে খুব একটা যায়নি। তবে এলাকার মানুষ শিব সাজতেই সবচেয়ে বেশি দেখেছে তাকে। শিব ছাড়াও তারাক্ষেপি, ডাকু সুলতান, প্রহ্লাদ, কালী, সন্তোষীমা, দুর্গা, গোয়ালিনী, হনুমান সবই সাজে ফটিক। বহুরূপী দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে কৃষি কাজের সঙ্গেও যুক্ত থাকে ফটিক। মৃত্যুর পর তারাপীঠেই তাদের দেহ দাহ করা হয়। বাড়িতে কৃষ্ণ, কালী, শিব, রামকৃষ্ণের ছবি আছে তার। তারাক্ষেপি সেজে বহুরূপী ফটিক দলুই সংলাপ বলে—'হদ্‌হদির মা, লুথ্‌পুথির মা, পুঁই ডাঁটার বিটি, কোন্‌খানটায় আমি ক্ষেপি? বর্ধমানের মহারাজার ইস্ত্রী, আমি তার মিস্ত্রী। আমার স্বামী আমাকে কতো ভালোবাসে জানো—এই দ্যাখো চুড়ি দিয়েছে, মালা দিয়েছে, মহিনিপুরী শাড়ি দিয়েছে। আমার শাশুড়ি উকুনের চারা দিয়েছে, আমার শ্বশুর বাঁধানো ঘাট দিয়েছে। সন্দেশ খেগোর বেটা-বিটি বলবে ক্ষেপি। ইবার যখন ক্ষেপি বলবে না, তখন ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো—হ্যাঁ।'

মাত্র ১৫/১৬ বছর আগে শুকনা গ্রামে আসে ফটিক। তখন সে মাঠে জনমজুর খাটতো আর মাঝে-মাঝেই বহুরূপী দেখাতো। সে অবশ্য বার কয়েকই বিয়ে করেছে কিন্তু কল্পনা ছাড়া কোনো বউ-ই তার ঘর করেনি। ফটিকের বাড়িতে বেশিদিন টেকেনি তারা।

কালনা-বর্ধমানের নিউ-মধুপুর কলোনীতে নাড়ু চৌধুরী এবং হাল-আমলের বহুরূপীরা থাকে। তারা নিজেরাই এখন একটি পাড়া গড়ে নিয়েছে এবং শ্রমিক-কৃষকদের মূল স্রোতে অনেকটাই মিশে গেছে। শিশু-কিশোরদের অনেকেই স্কুলে যায় না, বহুরূপী সেজে ট্রেনে-বাসে ভিক্ষে করে। একই ছবি বিষয়পুরের ব্যাধ পাড়াতেও। বরং বহরমপুরের বসন্ততলার বাজার পাড়ায় যে সমস্ত বহুরূপীরা থাকে তারা প্রতিদিন যায় না বহুরূপী দেখাতে। তাদের কেউ কেউ আবার রিক্সা চালায়, সময় সুযোগে সব্জি বিক্রী করে, গ্রীষ্মে ট্রলিতে ডাব নিয়ে তা বিক্রী করে। একমাত্র তারকেশ্বরের জ্যোৎশম্ভু এলাকার কালীপদ পালই বাংলার বহুরূপীদের মধ্যে সাজ-পোশাকে সম্ভ্রান্ত। তাঁকে কেন্দ্র করেই সেখানে গড়ে উঠেছে বহুরূপীর দল, তারা আমন্ত্রণমূলক অভিনয়েও স্থানান্তরে যায়। তাঁদের দলের এখন প্রায় ৫০ হাজার টাকার পোশাক-সামগ্রী আছে। সেসব ভাড়ায় খাটে। সকাল থেকেই বহুরূপী শিব-কালীর পোশাক সামগ্রী ভাড়ায় যায়, বর্ষীয়ান এলাকার বহুরূপীর গুরু শিষ্যদের সাজিয়েও দেয়। সন্ধ্যায় তারা আবার পোশাক ফেরৎ দিয়ে ভাড়া মিটিয়ে যায়। কালীপদ ৪০/৪৫ বছর বহুরূপী করছেন, তাঁর মন্তব্য—'খালি পোঁদে রঙ মেখে হনু সাজলে হবে না, বিষয়টিকে নিয়ে ভাবতে হবে'। কাটোয়ার আখড়া—বিষ্টুপুরেও বহুরূপী আর ঘোড়া নাচের দল 'মা সিদ্ধেশ্বরী গ্রুপ' গড়ে উঠেছে।

অবশ্য যারা এখন বংশ পরম্পরায় বহুরূপী সাজছে সেই বিষয়পুরের বহুরূপীদেরই কোনো দল গড়ে ওঠেনি। এই বিষয়পুরেই এখন সারা বাংলার সবচেয়ে বেশি বহুরূপীর বাস। তাদের মধ্যে ঈর্ষা-হিংসা-বিদ্বেষও রয়েছে। তাদের মধ্যে কুসংস্কার-অশিক্ষারও শেষ নেই। অধিকাংশই 'বেদে' সম্প্রদায়ভুক্ত 'ব্যাধ' পরিবারের মানুষ এরা। এখানের সুকুমার ব্যাধের ছেলে মেয়ে খোকন আর বাণীই বাংলার বহুরূপীদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট। বাণী এখন বাংলায় এম-এ

দেবার ব্যবস্থা করছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে। তবে এখানের এই ব্যাধ পাড়ায় অভাব-দারিদ্র্য নিত্যদিনের সঙ্গী। জীবন ও জীবিকার লড়াই-এ যে সমস্ত মানুষজন ক্ষতবিক্ষত, তাদেরই একটি শ্রেণি বহুরূপী। তারা কৃষিকাজে বা কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে একেবারেই আগ্রহী নয়। একসময় পশুপাখি শিকার আর যাযাবরত্বে যাদের আস্থা ছিল, সেই পাখ্মারা-ব্যাধ সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা একটু একটু ক'রে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে চেয়েই ঘর বাঁধছে। সকালে মুখে রঙ মেখে বহুরূপী সেজে গ্রাম-গঞ্জ-শহরে সে প্রদর্শন দেখিয়ে আবার সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসছে ঘরে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিজনদের কাছে। 'বহুরূপী সেজে লোকনাট্য পরিবেশন করছি, সমাজের বিশেষ-উপকার করছি' এমন মনোভাব নিয়ে অন্তত বিষয়পুরের বহুরূপীরা বহুরূপী সাজে না। তাদের বিশ্বাস বহুরূপী তাদের বাঁচবার পথ, অন্ন-সংস্থানের উপায়। বহুরূপী না দেখালে তারা খেতে পর্যন্ত পাবে না, তাদের দু'বেলার ভাত জুটবে না।

সাধারণত ঝুপ্ড়িবাসী এই বহুরূপী সমাজের প্রায় প্রত্যেকেরই খাদ্যাভাব। সে অর্থে দু'একজন ভিন্ন কেউই সম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারেনি। চাকরীও করে মাত্র তিনজন। জমি-বাড়ি-অর্থ কিছুই নেই। অনেকের বাড়িই আবার পি-ডব্লিউ-ডি বা ভেস্টের বা রেলের জায়গায়, বড়ো হাইড্রেনের পূর্তিগন্ধময় এলাকায়। সব মিলিয়ে যাযাবরত্ব রয়েই গেছে রক্তে। লোকেও এখন আর সেভাবে বহুরূপীকে গুরুত্ব দেয় না, দেখতে চায় না ওসব 'সঙ্'। কিন্তু পেটতো আছে, বাড়িতে ছেলেপুলেও রয়েছে। তারা সবাই তাকিয়ে থাকে সাঁঝের আলোয় বাড়ি ফেরা বহুরূপীর ঝোলার দিকে। বাঘ বা তাড়কা রাক্ষসীর কাঁধেও তাই ঝোলা থাকে, ঝোলা থাকে হনুমানের কাঁধেও। সব মিথ্যা পেট সত্য। সন্ধ্যায় মুখ থেকে বহুরূপীর মুখোশ খুলে যখন পরিবারের প্রিয় একমাত্র উপার্জনকারী মানুষটি 'বাবা' বা 'স্বামী' হ'য়ে ওঠে, তখন বাড়ির শিশু-কিশোরদের আর বই-শ্লেট ছুঁতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে সারাদিন বাড়িতে না থাকা এই মানুষটির সঙ্গে একটু খুনসুটি করতে, একটু তার গায়ে-মাথায় চাপ্তে। স্ত্রীও বুঝে নিতে বাধ্য হন যে, এইই তাঁর স্বামীর কাজ, এই বহুরূপী দেখিয়েই তাদের খাওয়া-পরা চলে। সুতরাং সব মেনে নিতে হয়। মানুষটির জন্য রঙ্ গুলে দিতে হয়, পোশাক ছেঁড়া থাকলে তা সেলাই করেও দিতে হয়। রঙ মাখিয়ে, পোশাক পরিয়ে, যথা নিয়মে চূড়া বেঁধে-কোমরবন্ধ বেঁধে দিয়ে বহুরূপী সাজিয়ে দিতে হয় প্রত্যহ সকালে। তারপর সারাদিন হা-পিত্যেশ বসে থেকে অপেক্ষা করতে হয় সন্ধ্যার। ফিরে এলেই ঝোলা ঝেরে খুঁজে নিতে হয় জীবনের রসদ, বেঁচে থাকার তিল-তণ্ডুল। ঝোলা ভারি দেখ্লে তাই আনন্দ জাগে, ঠোঁটের কোণে চিল্তে হাসিও খেলে যায়। একইভাবে ঝোলা খালি দেখ্লে কান্না আসে দু'চোখ জুড়ে, হতাশায় ভেঙে পড়ে প্রাত্যহিক জীবন। এমনই দিন আনা দিন খাওয়া বহুরূপীর জীবন।

প্রাচীন এই বহুরূপী বৃত্তিটি বর্তমানে লোকসংস্কৃতির আঙনে একটি সম্পন্ন লোককলা হলেও শিল্পীরা প্রায় প্রত্যেকেই দরিদ্র, হতদরিদ্র। আগে নিজেরাই প্রাকৃতিক রঙ নিয়ে সাজতেন, এখন সবই বাজার থেকে চড়া দরে কিনতে হয়।

বহুরূপী বৃত্তি বা জীবিকাটিতে ব্যাধ-যাযাবরদের অংশগ্রহণ বেশি থাকলেও এটি তাদের বংশ-পরম্পরার বৃত্তি নয়। তাদের পূর্বেকার বৃত্তি ছিল জড়িবুটি বিক্রী, বাতের তেল বিক্রি,

ভালুক-বাঁদর নাচানো আর পশু-পাখি ধরা। মানসিকতায় তারা সবাই যাযাবর। সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে কিন্তু বহুরূপী সাজার প্রবণতা নেই। যেমন বহুরূপী সাজেনা মুসলমানেরাও। সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, বৈষ্ণব, ডোম, নীচু শ্রেণির দরিদ্র ব্রাহ্মণ বা 'ভাট বামুন' এরাই বহুরূপী সাজে প্রধানত। তবে এখনো বহুরূপী পেশাতে পাখ্‌মারাদেরই প্রাধান্য রয়েছে। আগামীতে অবশ্য পদবী বদলের হিড়িকে তাদের চেনাই মুশকিল হ'য়ে উঠবে। তারাও যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে মানুষের মূলস্রোতে ফিরতে চাইছে। কৃষিকাজ-ব্যবসা-চাক্‌রী-শ্রমিক হিসেবে নানান কাজের জগতে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে আজও এদের কোনো আগ্রহই আসেনি। অন্নহীনতাকে সম্বল করেই দাদুর দেখে বাবা, বাবার দেখে ছেলে মুখে রঙ মেখে বহুরূপী সেজে পথে নেমেছে। শিশুবেলা থেকেই তারা বুঝতে শিখেছে—যে করেই হোক আয় করতে হবে, সংসার চালাতে হবে। অনেকটাই গুরুবাদী এই বৃত্তি। তাই বহুরূপী সেজে প্রায় প্রত্যেক বহুরূপীই দু'হাত জোড় ক'রে গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তারপর পথে নামে। দু'চারজন বহুরূপী বৃহস্পতিবার বা শনিবারের বারবেলায় বহুরূপী দেখাতে যায় না। বহরমপুরের বসন্ততলার কমল বিশ্বাস এমনই অসময়ে ডাব বেচে, সব্জিও বিক্রী ক'রে থাকে। প্রত্যেক বহুরূপী পাড়াতেই বহুরূপীদের নিজস্ব দেবতার থান্‌ আছে। বিষয়পুরের বহুরূপীদের ধরম তো সুবিখ্যাত। বার-ব্রত-পুজোও তারা করে। বসন্ত তলায় আছে ডোমন রায়ের বাড়িতে মনসার থান্‌। এছাড়াও শিবের ত্রিশূল পুঁতে, মাটির ঘোড়া বসিয়েও বহুরূপীরা দেবস্থান নির্মাণ করে হিন্দু মতে। সেখানে ছাগ-পায়রা-হাঁস-মুরগি বলিও হয়।

জাতকে বহুরূপীর সন্ধান মেলে। কুলাই ঠাকুরের ব্রততেও পৌষ সংক্রান্তির সময় বাঘ সেজে বহুরূপী মানুষটি বাড়ি বাড়ি চাল-টাকা সংগ্রহ করে। ১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' নাটকে বহুরূপীর প্রসঙ্গ এসেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বারাসতের 'ছিনাথ বহুরূপী'কে জগৎবিখ্যাত করে দিয়েছেন। তারাশঙ্করের 'রসকলি' গ্রন্থে আছে ভালুক সাজা মতিলাল। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যকে আছে' বহুরূপ গ্রহণের ননীচোরা নাটুয়া। সমরেশ বসুর 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা'য় সুচাঁদ নিজেই একজন বহুরূপী। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'বাঘবাহাদুর' সিনেমায় বাঘ বেশী বহুরূপী ঘুনুরামকে পাওয়া যায়। নবেন্দু ঘোষের 'সরীসৃপ' ছায়াচিত্রেও কালীরূপী বহুরূপীর দেখা মেলে। সেই হিসেবে বলা যায় বহুরূপীর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালির জীবনেও। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার করাল গ্রাসে পিষ্ট বহুরূপীরা এই লোকনাট্যটি থেকে ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে, বহুরূপী সাজতে আর তেমন উৎসাহ পাচ্ছেন না। বহুরূপী সেজে সারাদিন ঘুরে ঘুরেও দিনমজুরের সমান রোজগার হচ্ছে না। তাই তারা এই 'ব্যবসা'টির প্রতি আর তেমন আগ্রহী নয়। 'এক সময় বহুরূপী দেখিয়ে চাল-আলু-কলাই-টাকা-পুরনো কাপড় সবই পাওয়া গেছে। দুপুর দেখ্‌লে মা-বোনেরা গৃহস্থের বাড়িতে বসিয়ে পাত্‌পেড়ে ভাত খাইয়েছেন। আজ আর সেদিন নেই, দু'টো পয়সা চাইলে বাবুরা পোশাক আর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করে। অভিনয় আর সংলাপ শুনে ঠাট্টা করে। ছেলেরা এই দেখেই কেউ এপথে এলো না, তারা রিক্সা টানে—মুনিষ খাটে। কিন্তু আমি পারি না, ছাড়বো ছাড়বো করেও ছাড়তে পারি না। ক'দিন বাড়িতে বসে থাকলেই হাঁপিয়ে উঠি। তখনই বাপ্‌-ঠাকুরদার শ্বাস-প্রশ্বাস মাখানো পোশাকগুলো

গায়ে চাপিয়ে মুখে রঙ মেখে আবার নেমে পড়ি পথে। জীবিকার সন্ধানে। ভালোবাসার টানে।' বৃদ্ধ বহুরূপীর কথাগুলি থেকেই বেরিয়ে আসে সমাজের একজন বিপন্ন অবহেলিত—বঞ্চিত মানুষ। বহুরূপীর পোশাক সরিয়ে তার দিকে তাকাবার মতো আজ আর মানুষ কোথায়? অবসরইবা কোথায় সভ্য-সমাজের!

গতির পায়ে ঘুঙুর বেঁধে আজকের যন্ত্র-মানব ছুটে চলেছে শুধু আপনার বৃত্তটুকুর মধ্যেই। অন্যদিকে তাকাবার মতো সময় বা ফুরসৎ তার সত্যিই কমে এসেছে। চারদিকে শুধু আজ প্রতিযোগিতা, সময় সংক্ষেপ করণের তোড়জোর। জীবনের সামান্য যেটুকু অবসর তা টিভি বা কম্পিউটরের মনিটরে আট্‌কানো। এ চক্রব্যূহ থেকে বেরোবার সব পথ বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সুতরাং বহুরূপী দেখে তার বিশ্লেষণ বা মানুষটিকে অন্বেষণের সব আগ্রহই বিনষ্ট হয়েছে আজ। শহর থেকে গ্রামদেশে মুখ ফেরানো বহুরূপী পিছিয়ে আসছে সেখান থেকেও। কারণ সব গ্রামেই এখন টিভি কেব্‌ল-ডিভিডি-কম্পিউটার-সেলফোন্ সবই চলে এসেছে। তাহলে কি লোকায়ত আঙনের এই সম্পন্ন ধারাটি শুকিয়ে শেষ হ'য়ে যাবে? সেও অসম্ভব। কারণ ব্যাধ প্রজাতির দুর্বল মানুষজন বহুরূপী বৃত্তিটিকে ভিক্ষার পর্যায়ে নামিয়ে আনলেও সুবলদাস বৈরাগ্য, কালীপদ পাল, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগ্য, দিলীপ চৌধুরী, সুকুমার চৌধুরী বা বিজয় মণ্ডলদের মতো মানুষজনও আছেন এই শিল্পটিকে আঁকড়ে। তাঁরা জীবন ও জীবিকার সঙ্গে বহুরূপী বৃত্তিটিকে জুড়ে নিলেও এর শিল্প সম্ভাবনার দিকটিকেও তুলে ধরছেন সর্বত্র। একক শিল্পটিকে তাঁরা যুগ্ম বা বহুজনের সমন্বয়ে মঞ্চে পরিবেশনের যোগ্যও করে তুলেছেন। শিল্পীর সম্মান অনেকটাই আদায় করেছেন। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা এপথ বর্জন করলেও বহু যুবকও আন্তরিকভাবেই শিল্পটিকে ভালোবেসে আসছেন বহুরূপী সাজতে। ১৫০ থেকে ২০০ বছর আগে সঙ্ থাকলেও বৃত্তি হিসেবে বহুরূপীকে সেভাবে গ্রহণ করেনি মানুষ। মূলত ২০০ বছরের মধ্যেই বাংলার রাজন্যবর্গের আনুকূল্যেই বহুরূপী লোক-নাটকের স্বর্ণযুগ এসেছিল। রাজা-জমিদারেরা তখন বহুরূপীকে গুপ্তচর বৃত্তিতে কাজে লাগিয়েছিলেন। সে সোনার-আমল বহুরূপী-জীবনে আজ না থাকলেও সরকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে এমন কী বিদেশের লোকসংস্কৃতি উৎসবেও আজ আমন্ত্রণ আসছে বহুরূপী শিল্পীর। এইসব দেখে জাতি-নির্বিশেষে বহু মানুষ এগিয়ে আসছেন। তারা বহুরূপী সাজছেন। তারকেশ্বর এলাকায় তো শিব আর কালী সাজার জন্য নিয়মিত কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কালীপদ পাল। সুতরাং আশার-আলোয় বহুরূপী জীবন উদ্ভাসিত না হলেও, অন্ধকারের কালো আঁধারেও তা একেবারে ঢাকা নয়। সুখ-দুঃখ মিলিয়েই আর পাঁচটা মানুষের মতোই বহুরূপী শিল্পীরও জীবনযাপন। কখনো তা পৌষ-ফাগুনের পরশে ফুলেল, আবার কখনো তপ্ত বৈশাখের রুদ্ররসে ভেজা। মূলত লোকায়ত শ্রমজীবী মানুষের জীবন-সংগ্রামের নির্মম ছবিই খুঁজে পাওয়া যায় বহুরূপীর নানান রূপটানের আড়ালে। বহুরূপীর বাহান্ন রূপ নয়, সহস্র রূপ। পৌরাণিক রূপ ছাড়াও দৃশ্যজগতের নানান মিল্-অমিলও তাঁর রূপারোপের বিষয়। সবকিছুর মূলেই তো দিলীপ বহুরূপীর সারসত্য সেই কথা—'সব মিথ্যা পেট সত্যি'।

বাংলায় বহুরূপী বৃত্তির উদ্ভবের কারণ প্রকৃতিগতভাবে প্রায় সর্বত্রই এক। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে কৃষিজীবী লোকসমাজের একটা শ্রেণি নিতান্তই নিরুপায় হ'য়ে

বহুরূপী বৃত্তিটিকে অবলম্বন ক'রে বাঁচতে চেয়েছে। আর তাদের মধ্যে যারা মনোরঞ্জন এবং অর্থোপার্জনের এই বিশেষ পন্থাটিকে আয়ত্ত করতে পারেনি, তারাই কেউ হয়েছেন বাজিকর, কেউ তুক্‌তাক্ মন্ত্র-তন্ত্রে দক্ষ গুণীন, কেউ শীতলা-মনসা-ধরম প্রভৃতি বিঘ্ন-বিনাশক লোকদেবতার মূর্তি বাঁকে বা মাথার ঝুড়িতে বসিয়ে সিঁদুর মাখিয়ে পথে নেমেছেন। কেউ বা হয়েছেন নিতান্তই ভিক্ষুক। বহুরূপের আড়ালে বহুরূপী একজন মানুষ, দরিদ্র মানুষ। শ্রমজীবী লোকশিল্পী মাত্র। সমাজ জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া হাসির তাসেব দেশে বহুরূপীরা হলেন লোকজীবনের চলমান বিদূষক। শিল্পেব টানে বা জাতিগত পেশায় না হলেও নিম্নবর্গের মানুষজনই দৈন্যের দশায় পেটের টানেই হয়তো একদিন মুখে রঙ মেখে বাধ্য হয়েই বহুরূপী সেজেছিল। কিন্তু ১৫০/২০০ বছরের সমাজ সেবায় লোকশিক্ষকের ভূমিকায় ব্রতী থেকে শিল্পীর সম্মানটুকু চাওয়া, খুব কি বেশি কিছু? রাজা-জমিদার-সুলতানদের আমলে গুপ্তচর বৃত্তির কারণে যাদের উদ্ভব, সেই বহুরূপীরা আলোর পাখির ডানায় দীপ্ত-রোদ্দুরের ঘ্রাণ মাখিয়ে বিপন্ন সমাজের লোকশিক্ষক-বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের আশায় আজও মুখে রঙ মেখে পথে নামতে বাধ্য হচ্ছে প্রতিদিন। বহুরূপী শিল্পকলার চেয়ে তাতে ভিক্ষুকের আলখাল্লাটিই প্রদর্শিত হচ্ছে বেশি। অথচ সরকার বা জনসাধারণেব সামান্য প্রশ্রয়েই এই সম্পন্ন লোককলা লোকনাট্যটি হ'য়ে উঠতে পারে যথেষ্ট জনপ্রিয়। বাংলার বহুরূপীরা সেক্ষেত্রে প্রস্তুতও রয়েছেন। পোশাকের রোশনাই আর রঙের উজ্জ্বলতাব জন্য শুধুমাত্র তড়িৎ খেলে যাওয়ার সময়টুকু যা বাকী!

পরিশিষ্ট

বাংলার বহুরূপী

বীরভূম :

১. কানাইলাল চক্রবর্তী (৮২) ॥ চারকলগ্রাম ॥ নানুর
(প্রবাদ ঃ ইনিই বারাসতের শ্রীনাথ বহুরূপীর অথবা তার শিষ্যের শিষ্য)
২. ধবম চক্রবর্তী (৭০) ॥ চারকলগ্রাম ॥ নানুর
৩. আশুতোষ চৌধুরী (৮০) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪ আনন্দ চৌধুবী (৫৫) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৫ সুকুমার চৌধুরী (৫২) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৬. দিলীপ চৌধুরী (৪৪) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৭. সনাতন চৌধুরী (৪৭) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৮. বিজয় মণ্ডল (৬২) ॥ বিষয়পুব ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৯ উত্তম মণ্ডল (৩৫) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
১০. অশোক বাগ (৩০) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
১১. ক্ষুদিরাম মণ্ডল (৩৪) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
১২. কাজল চৌধুরী (১৮) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
১৩ বিষ্ণুপ্রিয়া চৌধুরী (১৭)।। বিষয়পুর।। ভালকুঠি।। লাভপুর
১৪. বাণী ব্যাধ (২২)।। বিষয়পুর।। ভালকুঠি।। লাভপুর
১৫. খোকন ব্যাধ (১৮) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
১৬. ভাদু চৌধুরী (৩৫) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
১৭. পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী (৩৭) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
১৮. ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (২০) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
১৯. নয়ন কুমার চৌধুরী (১৬) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
২০. হীরু কোনাই (৩৪) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
২১ রাম চৌধুরী (৩৫) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
২২. ফটিক চৌধুরী (২৭) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
২৩. দুলাল চৌধুরী (২২) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
২৪. মায়া চৌধুবী (১৭) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর

২৫. দলিল চৌধুরী (২৪) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
২৬. আশুতোষ রায় (৬০) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
২৭. নবকুমার চৌধুরী (২৬) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
২৮. বিবেক চৌধুরী (২১) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
২৯. সেন্টু চৌধুরী (৪৫) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৩০. অজিত চৌধুরী (৫০) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৩১. অরুণ কুমার চৌধুরী (১২) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৩২. বরুণ কুমার চৌধুরী (১০) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৩৩ কাশীনাথ চৌধুরী (৩৮) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৩৪. নিমাই চৌধুরী (৪০) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৩৫. নিত্যগোপাল চৌধুরী (১০) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৩৬. মদন চৌধুরী (১৯) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৩৭. প্রশান্ত চৌধুরী (২৭) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৩৮ জান্টু চৌধুরী (৪৭) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৩৯. সহদেব চৌধুরী (৪৫) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪০. রাজেন্দ্র চৌধুরী (২৮) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪১. নাড়ুগোপাল চৌধুরী (১৪) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪২. কার্তিক চৌধুরী (২২) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪৩. সূর্য চৌধুরী (৩২) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪৪. শ্যামলী চৌধুরী (১৭) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪৫. চায়না চৌধুরী (১৩) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪৬. গায়ত্রী চৌধুরী (২০) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪৭. রূপা চৌধুরী (৩৫) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪৮. সঞ্জয় চৌধুরী (২৩) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
৪৯. উত্তম সূত্রধর (৩২) ॥ শ্রীকান্তপুর ॥ মহম্মদবাজার
৫০. জিতেন দাস (৩৫) ॥ নাওতারা ॥ লাভপুর
৫১. অজিত দাস (৪২) ॥ ভগবানবাটি ॥ ইকড়া ॥ সাঁইথিয়া
৫২. হরিচরণ দাস বৈরাগ্য (৩৫) ॥ নানুবাজার ॥ আমোদপুর ॥ সাঁইথিয়া
৫৩. বিদ্যাসাগর আঁকুড়ে (৪৫) ॥ গয়রা ॥ সিউড়ি
৫৪. রিক্ত দাস (৫৩) ॥ ভ্রমরকোল ॥ আমোদপুর ॥ সাঁইথিয়া
৫৫. কার্তিক দাস (৩০) ॥ মালডিহা ॥ কবিলপুর ॥ মহম্মদবাজার
৫৬. শরীন দাস (৬৩) ॥ মহম্মদবাজার
৫৭. ব্রজেশ্যাম রায় (৬৭) ॥ কেন্দুয়া ॥ সিউড়ি
৫৮. ঈশ্বর মণ্ডল (২৯) ॥ হরিপুর ॥ গণেশপুর ॥ চন্দ্রপুর ॥ রাজনগর

৫৯. সাবিত্রী মণ্ডল (২০) ॥ হরিপুর ॥ গণেশপুর ॥ চন্দ্রপুর ॥ রাজনগর
৬০. অর্জুন বেদ (৪৫) ॥ রসা ॥ হজরতপুর ॥ কাঁকরতলা
৬১ লোহা বেদ (১৯) ॥ রসা ॥ হজরতপুর ॥ কাঁকরতলা
৬২. মাধব বেদ (১৭) ॥ রসা ॥ হজরতপুর ॥ কাঁকরতলা
৬৩. ক্ষ্যাপা বেদ (৮) ॥ রসা ॥ হজরতপুর ॥ কাঁকরতলা
৬৪ জীবন বেদ (৬৫) ॥ বসা ॥ হজরতপুর ॥ কাঁকরতলা
৬৫ কানাই বেদ (৬০) ॥ রসা ॥ হজরতপুর ॥ কাঁকরতলা
৬৬. হলধর বেদ (৩৫) ॥ রসা ॥ হজরতপুব ॥ কাঁকরতলা
৬৭. থাপা বেদ (২৫) ॥ রসা ॥ হজবতপুর ॥ কাঁকরতলা
৬৮. অশোক বেদ (২৩) ॥ রসা ॥ হজরতপুর ॥ কাঁকরতলা
৬৯. বিদ্যাসাগর সূত্রধব (৩৫) ॥ গড়গড়িয়া ॥ অমরপুর ॥ পাঁড়ুই
৭০. বিশ্বনাথ দাস (৩৪) ॥ ভ্রমরকোল ॥ আমোদপুর ॥ সাঁইথিয়া
৭১. তাপস দাস (১২) ॥ ভ্রমরকোল ॥ আমোদপুর ॥ সাঁইথিয়া
৭২. পূর্ণিমা দাস (১৭) ॥ ভ্রমরকোল ॥ আমোদপুর ॥ সাঁইথিয়া
৭৩. বিরিঞ্চিদাস বৈরাগ্য (৬৮) ॥ নাওতারা ॥ লাভপুর
৭৪. রবীন্দ্রনাথ সাহা (৪৬) ॥ তকিপুর ॥ হরিসাবা ॥ সাঁইথিয়া
৭৫ রতন বাগ্দী (৬৫) ॥ কান্দি বোড ॥ সাঁইথিযা
৭৬. বাঘা বেদ (৩২) ॥ রায়পাড়া ॥ আমোদপুর ॥ সাঁইথিয়া
৭৭ ভারতী বেদ (২৫) ॥ রায়পাড়া ॥ আমোদপুর ॥ সাঁইথিয়া
৭৮. ফটিক দলুই (৫৬) ॥ শুক্‌না ॥ ব্রাহ্মণবহড়া ॥ ময়ূরেশ্বর
৭৯. মলুক ভুঁইমালি (৪২) ॥ ব্রাহ্মণবহড়া ॥ ময়ূরেশ্বর
৮০. শিবু ভুঁইমালি (৬০) ॥ ব্রাহ্মণবহড়া ॥ ময়ূরেশ্বর
৮১. দুর্বল ভুঁইমালি (২৩) ॥ ব্রাহ্মণবহড়া ॥ ময়ূরেশ্বর
৮২ বীরবল ভুঁইমালি (২১) ॥ ব্রাহ্মণবহড়া ॥ ময়ূরেশ্বর
৮৩. সম্বল ভুঁইমালি (১৮) ॥ ব্রাহ্মণবহড়া ॥ ময়ূরেশ্বর
৮৪. জিতেন দাস (৭০) ॥ পানুটিয়া ॥ নলহাটি
৮৫. গোবিন্দচন্দ্র দলুই (৪৫) ॥ শিবগ্রাম ॥ ময়ূরেশ্বর
৮৬. বিশ্বনাথ দাস (৫৫) ॥ কুষ্টিকুড়ি ॥ কনুটিয়া ॥ ময়ূরেশ্বর
৮৭. তপন দাস (২৪) ॥ কুষ্টিকুড়ি ॥ কনুটিয়া ॥ ময়ূরেশ্বর
৮৮. লক্ষ্মী দাস (৩০) ॥ কুষ্টিকুড়ি ॥ কনুটিয়া ॥ ময়ূরেশ্বর
৮৯. অধরচন্দ্র দাস (৬৮) ॥ কেন্দুয়া ডাঙা ॥ সিউড়ি
৯০. সুবলদাস বৈরাগ্য (৬২) ॥ কুলিয়া ॥ বঙ্গছত্র ॥ বোলপুল-৭৩১২৪০
(বহুরূপী দেখিয়ে এসেছেন একমাত্র সুবলদাস-ই পৃথিবীর ৭/৮টি দেশে)
৯১ শশাঙ্ক বাজিকর (৮৮) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর

৯২. রূপবতী বাজিকর (৮২) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
৯৩. বৈদ্যনাথ বাজিকর (৪৮) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
৯৪. উত্তম বাজিকর (৩৫) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
৯৫. মায়া বাজিকর (৩০) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
৯৬. কাজল বাজিকর (১৮) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
৯৭. রত্নাকর বাজিকর (৫৮) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
৯৮. বিদেশ বাজিকর (৫২) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
৯৯. মালু বাজিকর (২৮) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১০০. সোমনাথ বাজিকর (১০) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১০১. তারক বাজিকর (১৬) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১০২. বাপি বাজিকর (১৫) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১০৩. কার্তিক বাজিকর (১৮) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১০৪. সত্য বাজিকর (১৪) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১০৫. নিখিল বাজিকর (১৫) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১০৬. শিশির বাজিকর (৭৮) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১০৭. নিধিরাম বাজিকর (১২) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১০৮ বাবলু বাজিকর (১০) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১০৯. ভানু বাজিকর (১৩) ॥ শীতলগ্রাম ॥ লাভপুর
১১০ টাকু চৌধুরী (২৬) ॥ বিষয়পুর ॥ ভালকুঠি ॥ লাভপুর
১১১. শুকলাল বাগ্দী (৪৬) ॥ দুরখি ॥ বীরচন্দ্রপুর ॥ ময়ূরেশ্বর
১১২. সাধন দলুই (৪৭) ॥ কুষ্টিকুড়ি ॥ কলেশ্বর ॥ ময়ূরেশ্বর

মেদিনীপুর :

১ নিরঞ্জন মাইতি (৪৮) ॥ পুতপুতিয়া ॥ পাঁশকুড়া
২. সুভাষ বাবুই (৪২) ॥ ডেবরা
৩. শিবেন বিশ্বাস (৪০) ॥ বাঁধগোড়া ॥ চিচিড়া
৪. পরমেশ বেরা (৪৩) ॥ বাঁধগোড়া ॥ চিচিড়া

বাঁকুড়া :

১. পরেশনাথ মণ্ডল (৫৩) ॥ রানিবাঁধ
২. পরম মণ্ডল (৫৪) ॥ ভেদুয়াশোল
৩. দেবেশ দাস (৫০) ॥ ভেদুয়াশোল
৪ অসিত দেবনাথ (৪৬) ॥ পাত্রসায়ের
৫. অধীর বিশ্বাস (৪০) ॥ পাত্রসায়ের

৬. নীলমাধব বিশ্বাস (৪৪) ॥ গঙ্গাজলঘাটি

৭. শুকদেব মণ্ডল (৪৫) ॥ খাতড়া

পুরুলিয়া :

১ শুকলাল মাহাতো (৪৬) ॥ বান্দোয়ান

২ সোমেন মাহাতো (৪৮) ॥ বলরামপুর

৩ পঞ্চানন বাগ্দী (৩৯) ॥ রঘুনাথপুর

নদিয়া .

১. সুখময় ঘোষ (৬৪) ॥ কৃষ্ণনগর ॥ দিগ্‌নগর

২ স্বপন হালদার (৪০) ॥ দেবগ্রাম ॥ হাটগাছা

৩ দেবব্রত রায় (৩৫) ॥ করিমপুর

৪. ভবতচন্দ্র বসাক (৩৮) ॥ করিমপুর

হাওড়া :

১. সুরেন্দ্রচন্দ্র বোস (৮৫) ॥ সালকিয়া

২ সৃষ্টিধর বসাক (৫২) ॥ আন্দুল-মৌরী

৩. নৃসিংহ দাস (৪৮) ॥ আন্দুল-মৌরী

চব্বিশ পরগণা :

১ সন্তোষ কুমার বিশ্বাস (৫৪) ॥ বসিরহাট

২ পবন দেবনাথ (৫০) ॥ নামখানা

৩ শ্রীরাম অধিকারী (৪৬) ॥ বজবজ

৪. সমীব অধিকারী (৩৬) ॥ বারাসত

৫. অনিমেষ দেবনাথ (৪২) ॥ সংগ্রামপুর ॥ মগরাহাট

৬ বিমল মালিক (৪৪) ॥ সংগ্রামপুর ॥ মগরাহাট

৭. সুবিমলদাস বৈবাগ্য (৩৯) ॥ দিঘিরপাড়া ॥ ফলতা

৮. কদমদাস বৈরাগ্য (৩৫) ॥ দিঘির পাড়া ॥ ফলতা

হুগলি :

১. নিত্যানন্দ মহান্ত (৬০) ॥ চারাবাগান ॥ বৈঁচি ॥ পাণ্ডুয়া-৭১২১৩৪ ॥
দূরভাষ ঃ (০৩২১৩) ২৭১ ২২২

২ অচিন্ত্য দাস (৪০) ॥ চারাবাগান ॥ বৈঁচি ॥ পাণ্ডুয়া-৭১২১৩৪ ॥
দূরভাষ ঃ (০৩২১৩) ২৭১ ২২২

৩. পঞ্চানন অধিকারী (৬০) ॥ নাবালগ্রাম ॥ মগরা

৪. কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী (৩০) ॥ বৈঁচি ॥ পাণ্ডুয়া
৫. শিবুদাস বৈরাগ্য (৪০) ॥ ঝাঁপানডাঙা ॥ স্টেশন সংলগ্ন
৬. কালীপদ পাল (৭৪) ॥ জ্যোৎশম্ভু ॥ তারকেশ্বর-২৩ নং রেলগেট ॥

দূরভাষ ঃ বিমল-৯৪৩৩২২৫৭৬৭

৭. হাবল ভট্টাচার্য (২৪) ॥ প্রযত্নে ঃ কালীপদ, তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
৮. তপন মণ্ডল (১৮) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
৯. লক্ষ্মীনারায়ণ মালিক (৪০) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
১০. বিশ্বনাথ দাস (৩৪) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
১১. সুকুমার পাল (৩৬) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
১২. বলরাম মণ্ডল (২৩) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
১৩. দীপঙ্কর হালদার (২১) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
১৪. শুভঙ্কর হালদার (১৮) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
১৫. অজিত পাল (৪৫) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
১৬. বাবলু রঙ (১৬) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
১৭. উদয় মোদক (১৮) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
১৮. অজিত দাস (২৪) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
১৯. বিশ্বনাথ দাস (৪৮) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
২০. উত্তম মালিক (৩৫) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
২১. পিণ্টু দাস (১৭) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
২২. বাপি দাস (১৭) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
২৩. বুড়ো মালি (১৯) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
২৪. নিতাই মালিক (২৩) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
২৫. সহদেব মণ্ডল (২৭) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
২৬. গোপাল ভট্টাচার্য (৩৩) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
২৭. রাজকুমার মাজি (১৫) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
২৮. স্বপন কাণ্ডার (২০) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
২৯. পরমেশ্বর চক্রবর্তী (৪৫) ॥ তারকেশ্বর ॥ ২৩নং রেলগেট
৩০. তপন হাড়ি (৩৮) ॥ খানপুর ॥ হুগলি

বর্ধমান :

১. কৃষ্ণচন্দ্র খাঁড়া (৫৫) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান
২. বুধদেব অধিকারী (৫৬) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান
৩. নাড় চৌধুরী (৬২) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান
৪. জীবন চৌধুরী (১৮) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান
৫. অশোক ধারা (৪৫) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান

৬. মতি মণ্ডল (৩০) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান
৭. ফটিক চৌধুরী (৩৫) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান
৮. কাঞ্চন মালিক (৩৫) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান
৯. পিন্টু মণ্ডল (১১) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান
১০. আশিস কর্মকার (১৩) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান
১১. রাজু চৌধুরী (৩৫) ॥ চোতখণ্ড ॥ বর্ধমান
১২. অশোক চৌধুরী (৩৫) ॥ ববুই ॥ বর্ধমান
১৩. ক্ষুদিরাম মণ্ডল (৩৭) ॥ নিউমধুপুর ॥ কালনা ॥ ২নং ফটকদ্বার
১৪. মিঠুন রায় (১২) ॥ নিউমধুপুর ॥ কালনা ॥ ২নং ফটকদ্বার
১৫ মঙ্গল ধারা (১৪) ॥ নিউমধুপুর ॥ কালনা ॥ ২নং ফটকদ্বার
১৬. কাঞ্চন দে (১৩) ॥ নিউমধুপুর ॥ কালনা ॥ ২নং ফটকদ্বার
১৭. ভাদু চৌধুরী (৩৫) ॥ নিউমধুপুর ॥ কালনা ॥ ২নং ফটকদ্বার
১৮. রাখাল ধারা (২২) ॥ নিউমধুপুর ॥ কালনা ॥ ২নং ফটকদ্বার
১৯. বাজু চৌধুরী (১৯) ॥ কোরলা
২০. তমাল মণ্ডল (৪৪) ॥ বর্ধমান
২১ শচীন রায় (৫২) ॥ উত্তরপাড়া ॥ আখড়া ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
২২. সন্ধ্যা রায় (৪২) ॥ উত্তরপাড়া ॥ আখড়া ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
২৩. মিঠুন রায় (৩৪) ॥ উত্তরপাড়া ॥ আখড়া ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
২৪. টোটন রায় (৩২) ॥ উত্তরপাড়া ॥ আখড়া ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
২৫. ছোটন রায় (২৮) ॥ উত্তরপাড়া ॥ আখড়া ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
২৬. হরি রায় (৩২) ॥ উত্তরপাড়া ॥ আখড়া ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
২৭. সীমা রায় (২৪) ॥ উত্তরপাড়া ॥ আখড়া ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
২৮ উচিং বেদ (৬২) ॥ ফরিদপুর ॥ বরাবনি ॥ দোমহানী ॥ আসানসোল
২৯. ধনজিৎ বেদ (৫৮) ॥ ফরিদপুর ॥ বরাবনি ॥ দোমহানী ॥ আসানসোল
৩০. অমরজিৎ বেদ (২৭) ॥ ফরিদপুর ॥ বরাবনি ॥ দোমহানী ॥ আসানসোল
৩১. রামরতন বেদ (৩৯) ॥ ফরিদপুর ॥ বরাবনি ॥ দোমহানী ॥ আসানসোল
৩২. নিখিল বেদ (২০) ॥ ফরিদপুর ॥ বরাবনি ॥ দোমহানী ॥ আসানসোল
৩৩ জানালা বেদ (১৫) ॥ ফরিদপুর ॥ বরাবনি ॥ দোমহানী ॥ আসানসোল
৩৪ নব বেদ (৪৭) ॥ পানাগড় ॥ বর্ধমান
৩৫ বাপ্পা বেদ (৫২) ॥ বোবিংডাঙা ॥ জামুড়িয়া
৩৬. দেবানন্দ বেদ (৫০) ॥ বোরিংডাঙা ॥ জামুড়িয়া
৩৭. ভূষণ বেদ (৩৭) ॥ সোমরাবাজার
৩৮. গোপাল বেদ (৬৮) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
(অন্ধ গোপালের মূলবাড়ি উখরা। থাকে এখানে শ্বশুরবাড়িতে)
৩৯ সত্যবতী বেদ (৫৩) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া

৪০. মৃত্যুঞ্জয় বেদ (৩৫) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৪১. কোকিল বেদ (৩০) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৪২. লাখপতি বেদ (৬০) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৪৩. রাজেন বেদ (২৮) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৪৪. তপন বেদ (৩০) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৪৫. জয়ন্ত বেদ (১৬) ॥ দামোদবপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৪৬. রঞ্জিত বেদ (৪৬) ॥ দামোদবপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৪৭. পটল বেদ (৪৫) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৪৮. বেঙুলা ডোম (৬৫) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৪৯. সুবীর ব্যাধ (২৯) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৫০. শৈলেন ব্যাধ (২৫) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৫১. কার্তিক রায় (৩২) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৫২. গণেশ রায় (১৮) ॥ দামোদরপুর ॥ নণ্ডী ॥ জামুড়িয়া
৫৩. ধানু রায় (৫০) ॥ আখড়া ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৫৪. হেতম বহুরূপী (৫৮) ॥ বীরহাটা ॥ বর্ধমান
৫৫. জহর বহুরূপী (৩৫) ॥ বীরহাটা ॥ বর্ধমান
৫৬ লাল্টু চৌধুরী (৪৪) ॥ কৃষ্মপুর ॥ বর্ধমান
৫৭. ঘেণ্টু চৌধুরী (৩৫) ॥ কৃষ্মপুর ॥ বর্ধমান
৫৮. বাবলু চৌধুরী (১৯) ॥ কৃষ্মপুর ॥ বর্ধমান
৫৯. ক্ষুদিরাম মণ্ডল (৩২) ॥ কৃষ্মপুর ॥ বর্ধমান
৬০. জয়ন্ত ভূমিজ (২৭) ॥ তিলকুল ॥ মোসগোড় ॥ জামালপুর
৬১. নরেশচন্দ্র রায় (৫৮) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট
৬২. দশরথ ভূমিজ (০৭) ॥ তিলকুল ॥ মোসগোড় ॥ জামালপুর
৬৩. হারাধন রায় (৫৫) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৬৪. অশোক রায় (২৮) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৬৫. সাধন রায় (২৬) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৬৬. নাদন রায় (২৩) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৬৭. দুলাল রায় (৩৫) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৬৮. কানাই রায় (৪৫) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৬৯. পরেশ রায় (৪৫) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৭০. নিরঞ্জন রায় (৫৫) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৭১. বলরাম রায় (৬০) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৭২. অর্জুন রায় (২৫) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৭৩. তারক রায় (২৬) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৭৪ বাপী রায় (২২) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া

৭৫. সুজিত রায় (২৮) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া
৭৬. ভরত রায় (৪০) ॥ আখড়া ॥ বিষ্টুপুর ॥ দাঁইহাট ॥ কাটোয়া

মুর্শিদাবাদ ·

১. কমল বিশ্বাস রায় (৫২) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
২ মাধবী বিশ্বাস (৪৪) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজাবপাড়া ॥ বহরমপুর
৩. বচন রায় (১৮) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
৪. জয়দেব রায় (১৪) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
৫. সুজিত রায় (১৮) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
৬ সঞ্জয় রায় (৩০) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজাবপাড়া ॥ বহরমপুর
৭. ডোমন রায় (৫৬) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
৮. বিশ্বনাথ রায়, মধুবালা (৬৫) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
৯. সুব্রত রায় (৩৭) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
১০. বাবলু রায় (৫২) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
১১. মনসা রায় (৩৫) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাডা ॥ বহরমপুর
১২. লক্ষ্মণ রায় (৩২) ॥ বাসুদেবখালি ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
১৩ চায়না ঘোষ (১৬) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজাবপাড়া ॥ বহরমপুর
১৪. চন্দনা রায় (১০) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
১৫. অজিত চৌধুরী (২৮) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
১৬. ঝুলন রায় (২৪) ॥ বসন্ততলা ॥ বাজারপাড়া ॥ বহরমপুর
১৭. সূর্য মণ্ডল (১৮) ॥ মিঠিপুর ॥ রঘুনাথগঞ্জ
১৮. অপূর্ব মণ্ডল (২৭) ॥ মিঠিপুর ॥ রঘুনাথগঞ্জ
১৯. রাসু ব্যাধ (২৮) ॥ মিঠিপুর ॥ রঘুনাথগঞ্জ
২০. নবীন ব্যাধ (৪৯) ॥ মিঠিপুব ॥ রঘুনাথগঞ্জ
২১. মৃত্যুঞ্জয় দলুই (৫৬) ॥ ঝিকরহাটি ॥ মুর্শিদাবাদ

২৬৯ জনের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই সারণী প্রস্তুত। একজনও মুসলমান বহুরূপী পাওয়া যায়নি।

জেলা	বহুরূপীর সংখ্যা	স্বাক্ষর	নিবক্ষর	ব্যাধ পাখমারা	সদ্‌গোপ বৈষ্ণব	নমশূদ্র	ব্রাহ্মণ	গড় মাসিক আয়	ভিটে আছে অল্প জমিও
বীরভূম	১১২	৮৬	২৬	৭২	০৭/১৬	১৪	০৩	৩০০-১৫০০	১০২
বর্ধমান	৭৬	২৯	৪৭	৫০	২২/০০	০৪	×	২০০-৬০০	৭০
মুর্শিদাবাদ	২১	১৩	০৮	১৭	০৩/০০	০১	×	৩০০-৫০০	১৮
হুগলি	৩০	২৭	০৩	×	০৯/০৭	১১	০৩	৫০০-৩০০০	৩০
মেদিনীপুর	০৪	০৪	×	×	০২/০০	০২	×	৪০০-৬০০	০৪
নদিয়া	০৪	০৪	×	×	০৩/০০	০১	×	ঐ	০৪
বাঁকুড়া	০৮	০৫	০৩	×	০৪/০২	০২	×	ঐ	০৬
পুরুলিয়া	০৩	০১	০২	×	×	০৩	×	৩০০-৫০০	০৩
২৪পরগণা	০৮	০৫	০৩	×	০২/০২	০৪	×	৩০০-৬০০	০৮
হাওড়া	০৩	০৩	×	×	০২/০১	×	×	৫০০-২০০০	০৩
মোট	২৬৯	১৭৭	৯২	১৩৯	৫৪/২৮	৪২	০৬	২০০-৩০০০	২৪৮

জেলা	মোটামুটি ভালো সাজ-পোশাক আছে	নষ্ট বা ছেঁড়াখোড়া সাজ-পোশাক	কৃষি-মজুর বা অন্য কাজে যুক্ত	বাড়িতে ঠাকুরের ছবি, মন্দির আছে	হিন্দুধর্মে আস্থা আছে	কোনো ধর্মেই আস্থা নেই
বীরভূম	০৬	১০৬	৫৬	১১২	১১২	×
বর্ধমান	০৫	৭১	৫৫	১৫	৩২	৩০
মুর্শিদাবাদ	০২	১৯	১৯	১৮	২১	×
হুগলি	১২	১৮	৩০	৩০	৩০	×
মেদিনীপুর	০১	০৩	০৪	০৪	০৪	×
নদিয়া	০১	০৩	০৪	০৪	০৪	×
বাঁকুড়া	০২	০৬	০৬	০৮	০৮	×
পুরুলিয়া	০০	০৩	০২	০২	০৩	×
২৪ পরগণা	০১	০৭	০৮	০৮	০৮	×
হাওড়া	০১	০২	০২	০৩	০৩	×
মোট	৩১	২৩৮	১৮৬	২০৪	২২৫	৩০

॥ বাংলার লোকসংস্কৃতি ॥

ভৌগোলিক এলাকা	জেলা/অঞ্চল	সীমানা পরিচয়	ভাষা/জনগোষ্ঠী	জীবিকা	লোকসংস্কৃতি
১. পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি তরঙ্গায়িত উচ্চ-ভূমি অঞ্চল।	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও বর্ধমানের পশ্চিমাংশ।	ঝাড়খণ্ড ও বিহারের মালভূমি তরঙ্গায়িতভাবে নেমে এসেছে এইসব অঞ্চলে। এখানকার বেশিরভাগ নদীতেই সারা বছর জল থাকে না, শুধু বর্ষায় তারা খরস্রোতা।	এখানের প্রধান ভাষা বাংলা। হিন্দু-মুসলমান ছাড়াও এইসব অঞ্চলে সাঁওতাল-শবর-ওঁরাও-মুণ্ডা-লোধা-বীরহড় প্রভৃতি জনজাতির বাস।	আয়ের প্রধান উৎস কৃষিকাজ, ঝুম চাষ, পশুপালন, খনি ও কলকারখানায় কাজ ইত্যাদি।	ছৌ, ঝুমুর, টুসু, ভাদু, নাটুয়া, ভাজো, নাচনি, বাউল, বহুরূপী, রায়-বেঁশে, করম, ঘোড়ানাচ, বাঁধনা ইত্যাদি।
২. পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি এবং গাঙ্গেয় অঞ্চল।	মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বর্ধমানের পূর্বাংশ, বীরভূমের পূর্বাংশ, পূর্ব মেদিনীপুর।	সুন্দরবনের বৈচিত্রময় খাড়ি এলাকা পেরিয়ে উত্তরে এগোতে থাকলেই বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল। তাছাড়া পদ্মা-ভাগীরথী-গঙ্গার পলি-গঠিত উপকূল এলাকা।	প্রধান ভাষা বাংলা। বাঙালি ছাড়া উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গেই পাহাড়ি মাল-কলেন্দর-কোড়া-বাগ্‌দি-ভল্লারা এইসব অঞ্চলে বসবাস করে।	কৃষিই প্রধান জীবিকা তবে মাছ চাষ, মধু সংগ্রহও রয়েছে। নগরায়নের সমস্ত দরজাও খোলা রয়েছে শ্রমিক-মজুর-কৃষকদের জন্য। পাটও রেশম চাষ আছে।	আলকাপ, ফকিরি, গাজন, কর্তাভজা, বোলান, বাউল, বহুরূপী, ঝাপান, রায়বেঁশে, সঙ, বনবিবির পালা, টুসু, ভাদু, বিয়ের গান, পুতুলনাচ, বাঁধনা, কারাম, সহরায় ইত্যাদি।
৩. উত্তরের সমভূমি অঞ্চল।	মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুরের দক্ষিণাংশ, কোচবিহার।	আন্দোলিত সমভূমি এবং নদী-ভাঙনের এলাকা, সামান্য প্রভাব রয়েছে পলি অঞ্চলের।	প্রধান ভাষা বাংলা। প্রাচীন গৌড়ের প্রভাব থাকলেও বাঙালি-সাঁওতাল-ওঁরাও-মুণ্ডা-মাল-বাগ্‌দি-পাহাড়িরাই প্রধান।	উত্তরবঙ্গের, মানুষেরও প্রধান জীবিকা কৃষি। তবে আম-পাট-তামাক ও রেশম চাষ রয়েছে।	গম্ভীরা, চোরচুরনি, ভাওয়াইয়া, আলকাপ, বিষহরা, কুষাণ, হালুয়া-হাওলাজীর গান, খন গান ইত্যাদি।

॥ বাংলার লোকসংস্কৃতি ॥

ভৌগোলিক এলাকা	জেলা/অঞ্চল	সীমানা পরিচয়	ভাষা/জনগোষ্ঠী	জীবিকা	লোকসংস্কৃতি
৪. তরাই অঞ্চলের তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি।	জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুরের উত্তরাংশ, দার্জিলিং জেলার দক্ষিণাংশ।	নদী খরস্রোতা। জলবায়ু আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে। চা-বাগিচা ও অরণ্যভূমির প্রভাব।	প্রধান ভাষা বাংলা। দ্বিতীয় ভাষা মাদ্‌রি। নেপালিরও প্রভাব রয়েছে। উল্লিখিত জনজাতি ছাড়াও অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে' রয়েছে বহু নেপালিও।	ঝুম চাষ, চা-বাগান, বন-ভূমি নির্ভর জীবন ও জীবিকা। কৃষিকাজও যথেষ্ট।	মৈশাল, মাহুত বন্ধু, চোর-চুরণি, মাদারী, বিষহর, গম্ভীরা, পীর-ফকির, ভাওয়াইয়া, সহরায়, কারাম, ঝুমুর, বাগরম্বা, তিস্তাবুড়ি নাচ ইত্যাদি।
৫. উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল।	দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চল।	পাহাড়ি, অরণ্যঘেরা শীত প্রধান এলাকা। বক্সা-জয়ন্তী পাহাড়ি অঞ্চল।	নেপালি প্রধান ভাষা হলেও বাংলা পিছিয়ে নেই। নেপালি, তিব্বতি, ভুটিয়া, টোটো, লেপ্‌চা প্রভৃতি জনজাতির বাস। ডুক্‌পা জাতিরও সন্ধান মেলে। আছে বহু বাঙালি জনজাতিও।	চা-শ্রমিক, কৃষিকাজ, ভারবহন এবং অরণ্য-কেন্দ্রিক নানান কাজ।	ডম্ফু, কুক্‌রি, ঝুমারা, মুখোশ নাচ, টোটোদের নাচ, ঝাউরে, ঝংকারী, বাক্‌পা, জুংরা, চৈ, বরফসিং ইত্যাদি।

বহুরূপীর নিজের লেখা জীবনী

নাম—বিশ্বনাথ দাস

গ্রাম-পোঃ—ভ্রমরকোল

থানা—সাঁইথিয়া

মহকুমা—সিউড়ি

জেলা—বীরভূম

বয়স—৩৪ বছর

স্ত্রীব নাম—মালতী দাস

বয়স—২৮ বছর

সন্তান ২টি, ১টি মেয়ে ১টি ছেলে

মেয়ের নাম—পূর্ণিমা দাস

বয়স—১৮ বছর

ছেলের নাম—তাপস দাস

বয়স—১১ বছর

আমি **বিশ্বনাথ দাস** পেশায় বহুরূপী। আমার মায়ের নাম ফেনুদাস, বয়স ৪৯ বছর। বাবার নাম ভগীরথ দাস, বয়স ৫৫ বছর। আমি প্রাইমাবী স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে আর্থিক অভাবের জন্য আর লেখাপড়া করতে পারিনি এবং লেখাপড়া ছেড়েদিয়ে পরের বাড়িতে জন খাটার কাজে লাগি। এবং এইভাবেই আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে আমাব জীবন চলতে থাকে। পবে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে হেলপারের কাজ করতাম। দুই চারদিন এই কাজ করার পর আমি অসুখে পড়ি। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। হাসপাতালে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিবে কিছুদিন বাড়িতে বসে থাকি এবং কী করব কিছুই ভেবে পাই না। তারপর হঠাৎ আমার ঝোঁক পড়ল আমি বহুরূপী শিখবো। তাই আমি বহুরূপী শেখার বই কেনার জন্য খোঁজ করি, কিন্তু আমাদের নিকটবর্তী বাজারে এই বই পাওয়া যায় না। ভাগ্যচক্রে বীরভূম জেলার নাওতাবা গ্রাম নিবাসী বিরিঞ্চি দাস বৈরাগ্য মহাশয়েব সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি সেই সময় হরিরামপুর গ্রামে থাকতেন। আমি বিরিঞ্চি দাস বৈরাগ্য মহাশয়কে বহুরূপী শেখানোর জন্য অনুরোধ করি এবং তিনি আমাকে বহুরূপী শেখাতে রাজি হন। আমি বিরিঞ্চি দাস বৈরাগ্য মহাশয়ের কাছে বহুরূপী শিক্ষা গ্রহণ করে ডি.এম. এর পার্মিশন নিয়ে বহুরূপী দেখানো শুরু করি। আমার এই কাজ করতে খুব ভালো লাগে এবং আমি বর্তমানে এই কাজের সঙ্গেই যুক্ত আছি। আমি ভ্রমরকোল গ্রাম পঞ্চায়েত, সাঁইথিয়া ব্লক, সিউড়ি সিধো-কানু মঞ্চ, শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা, প্রভৃতি সরকারী অনুষ্ঠানে বহুরূপী দেখিয়েছি। আমরা চার ভাই। তিন ভাই একসঙ্গে থাকে এবং আমি পৃথক আছি। আমি গ্রামে গ্রামে বহুরূপী দেখাই। এক এক গ্রামে পাঁচদিন করে বহুরূপী দেখাই। বেহুলা, বসুদেব, তারাক্ষেপি, মা কালী প্রভৃতি রূপ দেখিয়ে থাকি। আমি জেলার বাইরে যেমন হুগলি, বর্ধমান, বাণীশ্বর প্রভৃতি জায়গায় বহুরূপী দেখিয়েছি।



BANKIM GHOSH
Member
West Bengal Legislative Assembly

Vill - Digha
P.O. - Bargaruli
P.S. - Haringhata
D. - Nadia
Phone 953473 222488 (R)
953473 278100 (O)
98303-87397 (M)
22294836 (MLA Hostel)

Date 20.12.2005

To Whom it May Concern

This is certify that Sri Dilip Chowdhury (Byadh), S/o Sri Ashtosh Chowdhury (Byadh) of vill-Bishoypur P.O. Bhlkuti under Lorpur Devlopment Block in the District of Birbhum is a traditional "Bohurupi" (a Flok art). He deserves all sorts of help and Co-operation from Common People to promote flourish the art in the Society.

I wish him every Sauss in life.

BANKIM GHOSH 20/12
Member
...ive Assembly



MANJUSHA

WEST BENGAL HANDICRAFTS DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A GOVT. OF WEST BENGAL UNDERTAKING)

Ref No

Date 16 01-2001

To Whom it may concern

This is to confirm that Sri Subal Das Bumaya and Sri Nityananda Mohonta has performed varities Programme (Bahurupee) on 16/01/2001 at W.B. Handicrafts Expo 2000-2001 Calcutta Maidan

A large number of spectator witnessed their Programme. Their show was very satisfactory. They have been ...

(A. Sengupta)
for W.B. Handicrafts ...



১। Seal

Government of West Bengal.
Office of the district Magistrate, Birbhum
Judical Department.
Memo No.-2309 (3) J Dated, Suri-9.11.2001

To : 1. Sri Hiru Chowdhury (Byadh)
2. Kumari Lskshmi Chowdhury (Byadh)
3. Sri Kajal Chowdhury (Byadh)
Vill.-Bishaypur. P.O.-Bhalkuti
P.S.-Labpur. Dist.-Birbhum.

Sub · His petition dated 15.10.2001 for, showing "chameleon" (Bahurupi)
He is informed that there is no objection
to allow him to show "chameleon"

Sig. 6.11.01
D. M. Birbhum



২। Seal

Government of West Bengal.
Office of the district Magistrate, Birbhum
Judical Department.
Memo No.-2328 Dated, Suri. 13.10.76

From : The Sub-Divisional officer, Sadar, Suri, Birbhum.
Sub : Prayer for exhibiting 'Bahurupi show'.

· You are permitted to exhibit 'Bahurupi' shows under intimation to the nearest Police Station provided it does not endanger public safety.

Sig. 13.10.76
Sub-Divisional Officer
Sadar, Suri, Birbhum.



সিধো-কানহু লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সিধো-কানহু ভবন, লালকুঠিপাড়া
সিউড়ী, বীরভূম

শ্রী দিলীপ চৌধুরী আপনি বীরভূমের কুশলী লোকশিল্পী হিসাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বহুরূপী আঙ্গিকে নান্দনিক শিল্প রচনার বিশেষ গুণী শিল্পী হিসাবে আপনাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো।

সিউড়ী
১লা জুলাই ২০০৩

সদস্য সচিব
এবং
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক বীরভূম

সহ সভাপতি
ও
জেলা শাসক

সভাপতি
ও
সভাধিপতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
রবীন্দ্র ভবন চুঁচুড়া হুগলী

পত্রাঙ্ক ২২৮ এইচ ডি আই সি এ

প্রেরক : জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক হুগলী।

দূরভাষ : চুঁচুড়া ......

সংকেত : ৭১২১০১

প্রাপক :

তারিখ ২২/৪/৯৫

মহাশয়,

আপনাকে অবগতির জন্য জানাই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং হুগলী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে ও বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় হুগলী জেলা লোক সংস্কৃতি উৎসব আগামী ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯৫ বলাগড়, সোমড়া নবজীবী কাষ্ঠিবাটি হলে অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে আপনি। আপনার সম্প্রদায়কে ...... পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ জানাই।

সুতরাং আপনি। আপনার সম্প্রদায়ের মোট ...২... জন সদস্য নিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে আগামী ২৯/৪/৯৫ তারিখে দুপুর ২ টায় সোমড়া বাজার সোমড়া নবজীবী কাষ্ঠিবাটি হলে অবশ্যই এই পত্রটি সঙ্গে নিয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য রিপোর্ট করতে হবে।

বি: দ্র:---প্রকৃত যাতায়াত ভাড়া ও সম্মান দক্ষিণা প্রতিটি শিল্পীকে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সঙ্গে রাত্রিবাসের জন্য হালকা বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

পথ নির্দেশ : ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে কাটোয়া লাইনে সোমড়া বাজার রেল স্টেশন থেকে ও ত্রিবেণী থেকে বাস পথ সোমড়া বাজার কাষ্ঠিবাটি হল।

ভবদীয়

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
হুগলী

বহুরূপী সুবলদাসের চিঠি

ঁ শ্রীশ্রী দুর্গা সহায় —

মান্য বরেষু ১৫ ই মে ৯৫

পরে নমস্কার নিবেশ, ঁ কৃপায় কুশল
আমি ২ জন বহুরূপী সংগ্রহ করে সমস্ত
নাম ঠিকানা ও ছবি সহ আপনার কাছে
বিশ্বনাথ মারফত পাঠানো হলো, আশা
করি কার্য্যকরী হবে, তবে সব কিছু ঁ ইচ্ছা
মাননীয় ডঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়
তার সাথে সাক্ষাৎ হলে মনটা সম্পূর্ণ
রূপে আনন্দে ভরে উঠবে, তবে
দায়িত্ব আপনার, কতদূর কার্য্য করি
ঠিক হচ্ছে পত্র দ্বারা জানালে বাধিত
হবো, যে এই ২ জন যেন হয়,
এটা আমার ও সংকল্প,

ইতি
আপনার অনুগত বহুরূপী শিল্পী
সুবলদাস বৈরাগ্য

পুনঃ ২ জন বহুরূপীর কাছে যাওয়া
আসা রিকেটার গেলে খুশি হবে.